হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

ধর্ম্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।

সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্

সহকারি-সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইং—১১ই মে ১৯২০।

বাং—২৮শে বৈশাখ ১৩২৭।

শকাব্দাঃ ১৮৪২।

অগ্রিম ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা

সূচী।

বর্ত্তমানসংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রী—, শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রী—, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্য বেদান্তরত্ন, শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, স্যানিটারি-কমিশনার, শ্রীহৃষীকেশ দ .শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ইত্যাদি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টারীকৃত)

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড
১ম সংখ্যা।

বৈশাখ।

১৩২৭ সাল।
১৮৪২ শকাব্দ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা।
ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ,
বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ।
ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে,
দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তয়ে নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ।
ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি,
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি।
ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব,
পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি।
ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাং
অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশোনাবমিবারুহেম।
ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং
প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ,
স্বস্তি নস্তার্ক্ষো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু।
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাদিগের কল্যাণ করুন। ভগদেব আমাদিগের মঙ্গল করুন। দেবী অদিতি আমাদিগের কুশল করুন। অপ্রতিকূলজনগণের পালক অরিনাশক পূষা আমাদিগের ক্ষেম বিধান করুন। শোভনপ্রজ্ঞাশীল দ্যাবা-পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয় আমাদিগের স্বস্তি করুন।

মঙ্গলকামনায় আমরা বায়ুদেবতার স্তব করিতেছি। যে সোমদেব ভুবন-পালক, সেই সোমদেবকে আমরা কল্যাণাশায় স্তব করিতেছি। দেবগণ-সহিত বৃহস্পতিকে ক্ষেম-প্রত্যাশায় আমরা স্তব করিতেছি। আদিত্যগণ আমাদিগের ক্ষেমজনক হউন।

অদ্য সমস্ত দেবগণ, মঙ্গলার্থে আমাদিগকে রক্ষা করুন। বৈশ্বানর বায়ু অগ্নি অদ্য কল্যাণার্থে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ঋভুদেবগণ অদ্য শুভার্থে আমাদিগকে রক্ষা করুন। রুদ্রদেব হিতার্থে অদ্য আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। হে মিত্র, হে বরুণ! আপনারা আমাদিগের মঙ্গল করুন। হে অন্তরীক্ষদেবতা রেবতি! আপনি আমাদিগের মঙ্গল করুন। ইন্দ্র ও অগ্নি প্রত্যেকে আমাদিগের কল্যাণ করুন। হে অদিতিদেবি! আপনি আমা-দিগের কুশলসাধন করুন। আমরা যেন সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় নিরাপদে পথে বিচরণ করিতে পারি। আর, আমরা যেন দানশীল, অহিংসক ও স্মৃতিমান্ স্বজনগণের সহিত পুনরায় মিলিত হইতে পারি। আমরা মঙ্গল-কারক অপ্রতিহতমর্য্যাদ, মহদ্রূপ, দেবগণের মধ্যে পক্ষিরূপে বিরাজমান, সংগ্রামে অসুরনাশক, ইন্দ্রের সখা, প্রভূতবলা তার্ক্ষ্যদেবের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি, যেমন পারার্থী নৌকায় আশ্রয় লয় তদ্রূপ। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে কল্যাণার্থে পাপমোচক আঙ্গিরস, গয়দেব, সোমদেব ও তার্ক্ষ্যদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি। (বর্ত্তমানে) স্বস্তি হউক, আর (ভবিষ্যৎ) সঙ্কটে আমাদিগের অভয় হউক।

প্রভূতবলা ইন্দ্র আমাদিগের কল্যাণ করুন। সর্ব্বজ্ঞ পূষা আমাদের মঙ্গল করুন। অপ্রতিহতপ্রভাব তার্ক্ষ্যদেব আমাদিগের মঙ্গল করুন। বৃহ-স্পতিদেব আমাদিগের ক্ষেমবিধান করুন। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

নববর্ষে নিবেদন।

শুভ নববর্ষে প্রথম দিবসে সর্ব্বাগ্রে আমরা সর্ব্বমঙ্গলাগার নিখিল প্রেম-পারাবার পরাৎপর পরমেশ্বরের পাদারবিন্দ স্মরণ করিয়া সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায় নবীন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। অদ্য এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের অনুগ্রাহক গ্রাহক, লেখক, পৃষ্ঠপোষক, সদুপদেশক, সহায়ক প্রভৃতি সহৃদয়গণের প্রতি সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগের সদয় ব্যবহার প্রার্থনা করিতেছি। জানিনা, আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা; তবে আশা করি, হিন্দু-পত্রিকা জীবন-ব্রতের সম্পাদনে তাঁহাদের সাহায্যে বঞ্চিত হইবে না।

হিন্দু-পত্রিকা এই শুভ বৈশাখে সপ্তবিংশতিবর্ষে উপনীত হইল। এই দীর্ঘকাল আমরা ইহার দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের ও আমশাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজের যথাসাধ্য সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দু-পত্রিকাকে কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয় নাই। হিন্দু-পত্রিকা সম্প্রদায়-বিশেষের সামগ্রী নহে। শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব—যিনি যে ভাবের উপাসকই হউন্ না কেন, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত—যিনি যে মার্গের সাধকই হউন্ না কেন, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যিনি যে বাদই আশ্রয় করুন্ না কেন, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ উপপুরাণ, তন্ত্র উপতন্ত্র যিনি যাহাই সাধন-সহায় বলিয়া গ্রহণ করুন্ না কেন, হিন্দু-পত্রিকা ইঁহাদের সকলকেই সাদরে গ্রহণ করে ও সদুপদেশ প্রদান করে। হিন্দু-পত্রিকা সঙ্কীর্ণতার সমর্থন করে না, উদার আর্য্যসিদ্ধান্ত প্রচার করে। যদিও হিন্দু-পত্রিকা ক্ষুদ্রশক্তিতে এই মহৎকার্য্যের অতি অল্পমাত্র অংশই সম্পাদন করিতে পারে, তথাপি সেতুবন্ধনে কাষ্ঠমার্জ্জারীর উপযোগিতার ন্যায় এ মহৎ-কার্য্যে হিন্দু-পত্রিকারও কথঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে—এই বিশ্বাসে নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াও আজ হিন্দু-পত্রিকা আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে সাবধানা।

হিন্দু-পত্রিকা আর্থিকলাভের প্রত্যাশায় প্রকাশিত হয় না। গ্রাহকগণের নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা হিন্দু-পত্রিকারই কল্যাণকল্পে ব্যয়িত হয়। আয়ও আয়-বৃদ্ধি হইলে পত্রিকার আকার-বৃদ্ধি, মুদ্রণপরিপাটী প্রভৃতি সৌষ্ঠবসাধনের চেষ্টা করিতে পারা যায়। বিশ্ববিপ্লাবক মহাসমরের ফলে কাগজের ও কালীর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তম কাগজ কালী পাওয়া যায় না—বলিলেও চলে। অনেকস্থানের অনেক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ

হইয়াছে, অনেক পত্রিকার মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দু-পত্রিকা এই ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া আছে ও কোনও রূপে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অনেক গ্রাহক এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে পত্রিকা লইয়া মূল্য প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন। কেহ কেহ ২।৩ বৎসর পরে এক বৎসরের মূল্য দেন, কেহ কেহ তাহাতেও কুণ্ঠিত, অথচ পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে তাগাদার মাত্রা চরমে চড়াইয়া দেন। কেহ ২ ভিঃ পিঃ তে পত্রিকা পাঠাইলে অনায়াসে ফেরত দেন, এবং কিছুকাল পরে সেই মাসের পত্রিকার জন্য তাগাদা আরম্ভ করেন। কেহ বা একাধিকবার ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া বর্ষ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া শেষে "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্" নীতির অনুসরণ করিয়া অপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলির তালিকা প্রেরণ করেন এবং বিনামূল্যে সেগুলি পাইবার দাবী জ্ঞাপন করেন। কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, যে সমস্ত সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠান হইয়াছিল, কেবল তাহাই পূর্ব্বোক্ত মহাশয় পান নাই। এই শ্রেণীর ঘটনা প্রীতিকরী না হইলেও আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি যে, হিন্দুশাস্ত্র-সমালোচনায় হিন্দু-পত্রিকাকে সাহায্য করিতে যিনি অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, তিনি কৃপাপূর্ব্বক প্রাপ্য মূল্য পাঠাইয়া দিয়া পত্রিকাগ্রহণে অসম্মতি জানাইলে অনুগৃহীত হইব। দীর্ঘকাল পত্রিকা লইয়া শেষে মূল্য না দিয়া কেহ কেহ "মহাশয়! আর পত্রিকা লইব না" লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা গৃহীত পত্রিকার মূল্য-প্রদান সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকেন—এমন কি, রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র দিলেও উত্তর দেন না, সংস্পৃষ্ট পোষ্টকার্ডখানি অন্য কার্য্যে ব্যয় করেন। আমরা এই সকল মহাত্মার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের প্রাপ্য মূল্য প্রদান করিলে আনন্দিত ও উপকৃত হইব। কাহারও অনভিমতে তাঁহাকে পত্রিকা-গ্রহণে বাধ্য করিবার সাধ্য আমাদের নাই। পত্রিকাগ্রহণে অনিচ্ছুক মহাশয়গণকে পত্রিকা পাঠাইয়া আমাদের কোনও লাভ নাই। তবে দেশের শাস্ত্র-শিক্ষাদারিদ্র্য ও অবস্থাবিপর্য্যয় লক্ষ্য করিলে, পত্রিকা-পাঠে অনিচ্ছুক মহাত্মাও পত্রিকাগ্রহণে ইচ্ছুক হইতে পারেন—এ আশা আমরা সতত্‌ই পোষণ করি। গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টি পত্রিকার জীবনরক্ষার ঔষধ—এ জন্য নববর্ষে আমরা সকলেরই কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, "হিন্দু-পত্রিকা" যেন তাহার লক্ষ্য হইতে দূরে চলিয়া না যায়—কর্ত্তব্যের গণ্ডীতেই যেন তাহার জীবন নিবদ্ধ থাকে। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। সনাতনঃ (পুরাতনঃ) জীবভূতঃ (জীবস্বরূপঃ জীবঃ ইতি) মম এব অংশঃ (স জীবঃ মদংশত্বেন কল্পিতঃ) (স জীবঃ) জীবলোকে (জীবানাং লোকে) মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদি শ্রোত্রেন্দ্রিয়াণি মনঃ ইতি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতৌ স্থিতানি) (সংসার-ভোগার্থং জন্মান্তরেঽপি) কর্ষতি (আকর্ষতি)। ৭

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। এই জীব প্রকৃতি-স্থিত পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনকে সংসারভোগের জন্য পরজন্মেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ৭

আলোচনা। এই শ্লোকে বলা হইল যে, জীব ভগবানের অংশ এবং সেই জীব জন্মান্তরে মনুষ্যলোকে বা অন্যলোকে গমন করিলেও স্বকৃত-ফলভোগার্থ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়। এই দেহ বিদ্যমানে যেমন সুষুপ্ত্যাবস্থা হইতে ইন্দ্রিয় ও মনের পুনরাবৃত্তি হয় তদ্রূপ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব সংসার হইতে জন্মান্তরে মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে কোন স্থানে গমন করিলে তাহার পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্মপদ লাভ করিলে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মপদ জীবের স্বস্থান। জীবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আত্মমায়াপাশে বদ্ধ হইয়া জীবরূপে লীলা করেন। তন্ত্র উপনিষৎ সর্ব্বত্রই জীব ও ব্রহ্মের এই সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে ২য় পটলে উক্ত হইয়াছে—

জীবঃ শিবঃ শিবোদেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥

কঠোপনিষদে ৩। ২৯ উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"

ভগবান্ বলিলেন—"জীব আমার অংশ" এই অংশ-অংশীভাব মায়া-প্রভাবে ঘটে। অর্জ্জুনকে দৃষ্টান্ত বুঝাইবার জন্য এরূপ বলা হইল। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন। ২য় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগে ২৩শ শ্লোকে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মপদই জীবের স্বস্থান। স্বস্থানই চিরবাসের স্থান, অন্যত্র প্রয়োজন বশতঃ অবস্থান মাত্র। আমরা দেখিতে পাই—এই সংসারে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে অবস্থিতি করে। তথায়ও তাহার দণ্ড-পুরস্কার আছে। কারামুক্ত হইলে সে নিজ বাসস্থানে চলিয়া যায়। যেমন কুম্ভমধ্যবর্ত্তী আকাশ, সর্ববব্যাপী আকাশের অংশ মাত্র, কুম্ভের ভগ্নতায় সেই আকাশ বৃহৎ আকাশের সহিত মিশিয়া যায়, তদ্রূপ দেহাবসানে সেই উপাধিধারী জীব পরমাত্মায় লীন হয়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন কর্ম্মফল-ভোগ অতীত হইলে মুক্ত হয়, তদ্রূপ জীবও কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলে পরমাত্মায় লীন হয়। যতদিন মুক্ত না হয়, ততদিন দৃশ্যত দেহধারী জীব ভগবানের কল্পিত অংশ মাত্র। জীবের আত্মজ্ঞান না জন্মা পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কুম্ভ-মধ্যবর্ত্তী আকাশের ন্যায় ব্রহ্মের অংশরূপে কথিত হইতে হয়। ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। (মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি আকৃষ্য কস্মিন্‌কালে কিং করোতীতি আহ) যৎ (যদা) ঈশ্বরঃ (জীবঃ দেহাদিনাং স্বামী) শরীরং (কর্ম্ম-বশাৎ প্রাপ্তং শরীরান্তরং) অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) যৎ (যদা) উৎক্রামতি (তচ্ছরীরান্তরং সমাগ্যাতি) (তদা পূর্ব্বস্মাৎ দেহাৎ) এতানি (মনঃষষ্ঠানী-ন্দ্রিয়াণি) বায়ুঃ (ইব) আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ) গন্ধান্‌ গৃহীত্বা (তচ্ছরীরান্তরং) সংযাতি। ৮

অনুবাদ। যেমন বায়ু গমনকালে পুষ্প হইতে গন্ধগ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ দেহাধিপতি জীব, অন্যদেহে গমনকালে পূর্ব্বদেহ হইতে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনকে লইয়া দেহান্তর অবলম্বন করে। ৮

আলোচনা। আমরা জীবের যে দেহ দেখি, ইহা স্থূল দেহ। শাস্ত্র বলেন, ইহার অভ্যন্তরে চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মদেহ আছে। জীবের দেহান্তর-গ্রহণের নামই মৃত্যু। মৃত্যু হইলে জীবের স্থূলশরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ বায়ুর সহিত গন্ধের ন্যায় জীবাত্মার অনুগমন করিয়া দেহান্তরে আশ্রয় লয়। ইহার নাম পুনর্জ্জন্ম। পূর্ব্ব-দেহে থাকার সময় শুভাশুভ কর্ম্ম বা অন্যরূপ সাধনা দ্বারা মনের যে ক্ষীণতা বা পুষ্টি বা যাদৃশ গঠন হইয়া থাকে—যে বাসনা লইয়া জীব ইহলোক ত্যাগ করে, তদুপযোগী বিষয়ভোগ করিবার জন্য অন্য দেহ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং সেই দেহে প্রবেশকালে

জীব পূর্ব্বদেহের মন প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয় ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং (কর্ণং) চক্ষুঃ স্পর্শনং (ত্বচং) রসনং (জিহ্বাং) ঘ্রাণং (নাসিকাং) এবচ মনশ্চ (এতানি ইন্দ্রিয়াণি) অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদীন্) উপসেবতে (উপভুঙ্‌ক্তে) ৯

বঙ্গানুবাদ। জীবাত্মা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মনকে আশ্রয় করিয়া তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ প্রভৃতি উপভোগ করিয়া থাকে। ৯

আলোচনা। জীবাত্মা নিত্য ও চৈতন্য-স্বরূপ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, দেহাশ্রিত হইয়া দেহস্থিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা তত্তদ্ বিষয় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি অনুভব করিয়া থাকে মাত্র। ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

সান্বয়ব্যাখ্যা। উৎক্রামন্তং (দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং) বা স্থিতং (তস্মিন্নেব দেহে তিষ্ঠন্তং) অপি ভুঞ্জানং বা (শব্দাদীন্ বিষয়ান্ উপলভমানং) গুণান্বিতং (সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তং) (জীবং) বিমূঢ়াঃ (জ্ঞানহীনাঃ) ন অনুপশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ) পশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তীতি)। ১০

বঙ্গানুবাদ। দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী, দেহে স্থিত কিম্বা দেহে থাকিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-ভোগকারী সত্ত্বাদিগুণযুক্ত আত্মাকে আত্মজ্ঞান-রহিত মূঢ়গণ দেখিতে পায় না, তত্ত্বজ্ঞগণই দেখিতে পান। ১০

আলোচনা। বিবেকবুদ্ধিবিচারবলে শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞগণই আত্মার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। তাঁহারাই দেহত্যাগকালে, দেহে স্থিতিকালে, সুখ-দুঃখ-ভোগ-কালে, সত্ত্বাদিগুণসঙ্গকালে আত্মার স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। পুত্র-দারা-বিষয়ভোগ-বাসনায় উন্মত্ত মূঢ়গণ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হয়না। ১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

সান্বয়ব্যাখ্যা। (মূর্খেষ্বপশ্যৎসু কেচিৎ পশ্যন্তি কেচিন্নপশ্যন্তীতি অত আহ) যতন্তঃ (ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ সমাহিতচিত্তাঃ) যোগিনঃ এনং (আত্মানং)

আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং পশ্যন্তি যতন্তঃ (শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্ব্বাণাঃ) অপি অকৃতাত্মানঃ (অবিশুদ্ধচিত্তাঃ) (অতএব) অচেতসঃ (মন্দমতয়ঃ) এনং (আত্মানং) ন পশ্যন্তি। ১১

বঙ্গানুবাদ। সংযতচিত্ত যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিনচিত্ত আত্মজ্ঞানবিবেকহীন পুরুষগণ যত্ন করিলেও আত্মার স্বরূপ-দর্শন করিতে পারে না। ১১

আলোচনা। চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শন বা জীবাত্মার স্বরূপদর্শনের যন্ত্র স্বরূপ। নিষ্কামকর্ম্মী কামনাত্যাগী যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম্মাদি দ্বারা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, যাঁহাদের অন্তর হইতে বাসনা দূর হয় নাই, তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মদর্শনে সমর্থ হন না। ১১

যদাদিত্যগতং তেজোজগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

সান্বয়ব্যাখ্যা। (পারমেশ্বরং পরং ধাম উক্তং, তৎ প্রাপ্তানাঞ্চ অপুনরাবৃত্তিঃ উক্তা, ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি) যৎ তেজঃ (দীপ্তিঃ) আদিত্যগতং (আদিত্যাশ্রয়ং) চন্দ্রমসি চ যৎ (তেজঃ) অগ্নৌ চ (যৎ তেজঃ) অখিলং জগৎ (বিশ্বং) ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তৎ (সর্ব্বং) মামকং (মদীয়মেব) বিদ্ধি (জানীহি।) ১২

বঙ্গানুবাদ। সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ, যে তেজ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, সেই তেজ আমারই স্বরূপ—জানিবে। ১২

আলোচনা। জ্যোতিঃ মাত্রেই ভগবদ্বিভূতি। তিনি নিজ মায়ায় জগৎ বিস্তারিত রাখিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মতেজেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্। মহানারায়ণ উপনিষদে ১।৬ উক্ত হইয়াছে—"যেন সূর্য্যস্তপতি—" ভগবান্ দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ২১ শ্লোকেও এই কথা বলিয়াছেন—যথাস্থানে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃসোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। অহং চ ওজসা (মায়াশক্তিবলেন) গাং (পৃথিবীং) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গমাত্মকচরাচরাণি) ধারয়ামি, রসাত্মকঃ (রসময়ঃ) সোমঃ (সর্ব্বরসানামাধারঃ সোমঃ) ভূত্বা সর্ব্বা ওষধীঃ (ব্রীহিযবাদ্যাঃ) পুষ্ণামি (সংবর্দ্ধয়ামি) ১৩

বঙ্গানুবাদ। আমি নিজ তেজে পঞ্চভূতাত্মক এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সমস্তরসাত্মক সোমরূপ হইয়া ওষধিসকলকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি। ১৩

আলোচনা। ঐশ্বরিক শক্তিতেই পৃথিবী নিয়মিত ভাবে আপন পথে গতি করিতেছে। একটী ভৌতিক পরমাণুও ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত স্থানচ্যুত হইতে বা অবিচলিত থাকিতে পারে না। ভগবানই বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সকলের পরিপোষণের মূল স্বরূপ সোমস্থিত সোমরস। ভগবান্ সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বাত্মক। ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নিঃ) (ভূত্বা) প্রাণিনাং দেহং-আশ্রিতঃ (প্রবিষ্টঃ) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণাপানাভ্যাং উদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ) চতুর্ব্বিধং অন্নং পচামি (চতুর্ব্বিধং অন্নং চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয়মিতি। ১৪

বঙ্গানুবাদ। আমিই জঠরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণাপান বায়ুদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি। ১৪

আলোচনা। জগতে ভগবান্ ব্যতীত কিছুই নাই। সেইজন্য পাচক অগ্নি ও ভগবানের বিভূতি। ভগবানই বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করিয়া প্রাণ অপান বায়ু-যোগে উদ্দীপিত হইয়া চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করেন। ভোক্তা ভোজনকালে এবম্বিধ চিন্তা করিয়া ভোজন করিলে ভোক্তার অন্নজনিত দোষ হয় না। ঈদৃশ চিন্তা ঈশ্বরের সর্ব্বকর্তৃত্বে বিশ্বাসী ঈশ্বর-নির্ভরশীল ব্যতীত অন্যের সম্ভবে না। ১৪

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

সপ্তগ্রাম। ‡

"And may a shattered step and stone,
Where lights the foot with faltering tread,
But sadly speak of what is gone,
Are relics whisper of the dead"

Dirozio.

ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি। এদেশের প্রতি পুষ্পে, প্রতি জলবিন্দুতে এবং প্রতি ধূলিকণায় আজিও অতীতের কত গৌরবস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আভিধানিক যেমন বর্ণমালার যাবতীয় দুরূহ শব্দ-সম্ভার লইয়া বিরাট্‌কলেবর অভিধান রচনা করেন, ভগবান্ তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নৈসর্গিক শোভা-সম্পদ্‌রাজি, শিল্প, কারুকার্য্য, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান লইয়া ভারতের কমনীয়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যখন ভাবিয়া দেখি, শীতে শৈত্য, নিদাঘে গ্রীষ্ম, বসন্তে মলয়হিল্লোল, প্রাবৃটে অজস্র বারিবর্ষণ কিছুরই এদেশে অপ্রতুল নাই, তখন স্বতঃই মন হইতে কবির এই কথা নিঃসৃত হয়:—

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে এক দেশ সকল দেশের সেরা,
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

পৃথিবীর কোন্ দেশে মধুমাসে এমন পিককুল "কুহু" "কুহু" রবে শ্রবণ-বিবরে সুধার সুধারা বর্ষণ করে? কোন্ দেশে শারদীয়-পৌর্ণমাসী-সুধাংশু উদিত হইয়া ধরাতল রজতকিরণজালে আবৃত করিয়া, তৃষিত চকোর-দম্পতীর সুধাপানেচ্ছার পরিতৃপ্তি করে? কোন্ দেশে প্রাবৃটকালে জলদ-মালা হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া শুষ্কভূমিকে সিক্ত করিয়া কৃষককুলের নয়নে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করায়—আবার কোন দেশেই বা মল্লিকা-মালতী-যূথী-জাতির মধুর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শিলীমুখগণ গুন্ গুন্ রবে প্রধাবিত হয়? সে দেশ কি এই দেবগণ-বাঞ্ছিত, নন্দনতুল্য ভারতবর্ষ নহে?

‡ Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত "The old port of Bengal" নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত— লেখক—

যদি তুমি এদেশে মহাকবি চাও, তাহা হইলে ঐ যে উজ্জয়িনী রাজসভায় বসিয়া নবরত্ন-পরিবেষ্টিত কালিদাস উপমার উপর উপমা গাঁথিয়া অপূর্ব্ব কাব্য-মাল্যে বাণীর চরণ-সেবা করিতেছেন, একবার তাঁহার দিকে তাকাও। যদি তুমি জ্যোতিষী চাও, তাহা হইলে ঐ যে বরাহমিহির অশ্রুতপূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্যায় রাজসভা চমৎকৃত, স্তম্ভিত ও বিস্ময়ান্বিত করিতেছেন, একবার তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত কর। বস্তুতঃ লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, কর্ণের দান, পবনতনয় অনার্য্য হনুমানের প্রভুভক্তি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পাতিব্রত্য, বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, প্রহ্লাদের হরিভক্তি, রামচন্দ্রের প্রকৃতিরঞ্জন—এ সমস্ত অলৌকিক গুণের উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথায়ও সুলভ কি? আবার এই যে সেদিন দ্বাদশবর্ষীয় বীর বাদল যে অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছে, প্রতাপ যে দেশভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, জয়দেব, মুকুন্দরায়, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র যে সুমধুর কবিতা-রসে দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ সুলভ মনে করা যায় কি? কিন্তু যাউক্ এসব কথা, যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিবেন না। আসিবেন না সে জয়দেব, যিনি কুল-কুল-নাদী অজয়ের কূলে বসিয়া "স্মরগরলখণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লবমুদারম্" বলিয়া ভাব-বন্যায় দেশবাসীকে ভাসাইয়াছিলেন—আসিবেন না সে নিতাই যিনি—

"মার্‌লি মার্‌লি কল্‌সি ভাঙ্গ
একবার হরিনাম বলরে"

বলিয়া প্রেম-তরঙ্গে দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। ভারতের সকলই গিয়াছে, আছে কেবল ভগ্ন-ইষ্টক-স্তূপে—পর্ব্বতগাত্রে খোদিত লিপিতে অতীত—গৌরবের কত পুরাতন স্মৃতি।

কতকাল হইল বঙ্গের প্রাচীন বন্দর "সপ্তগ্রামের" গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও সেকথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে জানিনা কি কারণে যেন চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়। সপ্তগ্রাম, সাতগাও, সাতগাঁ, সাতিগাঁ—এ কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিবামাত্র প্রাচীনভারতের কত লুপ্তস্মৃতি মনে জাগরিত হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, কনৌজের রাজা প্রিয়ব্রতের সাতটী পুত্র ছিল। তাহাদের নাম অগ্নিধ্র, মদনক, ভূপিশান্ত, শৌরবান, বর, শবণ এবং ধৃতিমন্ত। এই সাতটী রাজকুমারের ধর্ম্মের দিকে মন ছিল এবং তাঁহারা সাতটী গ্রামে বাস করিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের নামানুসারেই

সপ্তগ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এই সপ্তগ্রাম পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং একসময়ে ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর ছিল। আমদানী ও রপ্তানীর যত বাণিজ্য দ্রব্য—তাহা এখানে সংগৃহীত হইত এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এখানে বাস করিতেন। নানা-দিগ্দেশাগত অসংখ্য বাণিজ্যজীবী ও ব্যবসায়ীর গমনাগমনে একদা সপ্তগ্রাম মুখরিত ছিল এবং ইহার পাদমূলবাহিনী সরস্বতীও লক্ষ লক্ষ অর্ণবপোত, বাণিজ্য-জন্য বক্ষে ধারণ করিয়া বীচিমালার সহিত তালে তালে নৃত্য করিত। খ্রীষ্টীয় সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৩০ অব্দে পর্তুগীজদের আগমন সময় পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম বঙ্গের রাজকীয় বাণিজ্যবন্দর ছিল। পর্তুগীজেরাই—প্রথমে সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক ব্যবসায়ী এবং তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম সপ্তগ্রামে কারখানা স্থাপন করেন। পর্তুগীজেরা ইহাকে "ক্ষুদ্র স্বর্গ" এবং চট্টগ্রামকে "বৃহৎ স্বর্গ" বলিত, কারণ সপ্তগ্রাম অপেক্ষা চট্টগ্রামেই জাহাজ গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ছিল। Caesar Fredericke ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে আগমন করেন, তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The merchants gather themselves together for trade...... In the port.. ...every year they lade 30 or 35 ships, great and small, with rice cloth of bombast of diverse sort, lac, great abundance of sugar, paper, oil of Zerzeline and other sorts of merchandise." ইনি আরও বলেন যে, গৌড় ও সপ্তগ্রামের সহিত রজত-বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। ইঁহার সমসাময়িক কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে সিজার ফ্রেডেরিকের মত সমর্থন করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক রেনেল তাঁহার Memoir of a map of Hindusthan নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সপ্তগ্রামে ইউরোপীয় বণিক দেখিয়াছিলেন। Van Liuschoten লিখিয়াছেন যে :—The portingalles deale and traffic thither and some places are inhabited by them······Besides their ryce, much cotton linen is made there which is much esteemed in India" M. Thevenot বলেন—"Bengal is full of castles and towns of which Satigan, Patane, Casanbazar and Chatigan are very rich"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পৃথিবীর নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র বণিক সপ্তগ্রামে ব্যবসায় উদ্দেশ্যে আগমন করিত। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন হোসেন

সাহ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বিপ্রদাস নামক একজন বাঙ্গালী লেখকের আবির্ভাব হয়। বিপ্রদাস চাঁদসওদাগরের সমুদ্রযাত্রার একটি বিশেষ বিবরণ কবিতাকারে বর্ণন করিয়াছেন। ডাক্তার উইল্‌সন্ এই কবিতাটীকে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সর্ব্বপ্রধান বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলেন। চাঁদসওদাগরের সপ্তডিঙ্গা রাজঘাট, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া ও আম্বুয়া অতিক্রম করিয়া অবশেষে ত্রিবেণী আসিয়া উপনীত হইল। এখানে সপ্তগ্রাম দর্শন-মানসে চাঁদ নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি এখানকার শোভা সম্পদরাজি অবলোকন করিয়া পুলকিতচিত্তে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী-নীরে অবগাহন করিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তত্রত্য উমামহেশ্বরের পূজা করিলেন। সেইখানে তিনি দুইদিন অবস্থান করিয়া ডিঙ্গায় আরোহণ করেন।

এইবার ত্রিবেণী সম্বন্ধে কিছু বলিব। ত্রিবেণী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তীরে অবস্থিত। ত্রিবেণী—সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। ত্রিবেণী হিন্দুদিগের পরমতীর্থক্ষেত্র। এখানে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী সমাগত হইয়া থাকে। সংস্কৃতশিক্ষার পীঠস্থান বলিয়া ত্রিবেণী বিখ্যাত। এইখানেই ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরাকসাহের ব্যাধি আরোগ্য করিয়া ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিল্টন্, ইংরাজজাতির জন্য বঙ্গদেশে স্বাধীন ও নিষ্কর বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। এইখানেই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা তেলিঙ্গ মুকুন্দদেবের ঘাট ও মন্দির ছিল। স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের সংস্কৃতশিক্ষক ও হিন্দু আইন্ সংগ্রাহক পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এইখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পণ্ডিত জগন্নাথের অতি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল। একদিন তিনি গঙ্গা হইতে ফিরিবার সময় একজন "কাফের" ও একজন "চীনবাসী" পরস্পরকে গালাগালি দিতেছে শুনেন। আদালতে যখন তাঁহাকে সাক্ষী দিবার শমন দেওয়া হইল, তখন তিনি বলিলেন যে, আসামীদ্বয় যে ভাষায় পরস্পর গালাগালি করিয়াছে তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই, তবে তিনি তাহাদের বচনগুলি অবিকল বলিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি উভয়ের কথাগুলি অবিকল বিবৃত করিলেন, শুনিয়া সকলে বিস্মিত স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। Stavorinas ওলন্দাজ-সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি ত্রিবেণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The waeters of the Ganges are esteemed holy and the

river sacred by all the Indians. The Gentoos worship the Ganges as a divinity and an annual festival is held in its honour.

The number of people whom I saw arrive in the latter end of march, at Hugli and Terbonee, for the above purpose was incredible" × ×

অতুল ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য সপ্তগ্রাম কখনও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয় নাই। রাজধানী অতি দূর বলিয়া সপ্তগ্রামের উপর দিয়া এইরূপ অত্যাচারের বাত্যা বহিত। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ফকরুদ্দীনের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তিনি লাখনৌতীর শাসনকর্ত্তা কোয়াদের খাঁকে হত্যা করিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন এবং সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা হইতে আফ্‌গানেরা আসিয়া সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করেন। এমন কি সম্রাট্‌ আকবরের সময়েও ইহা "বিদ্রোহালয়" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্ত্তমানে সপ্তগ্রামের প্রাচীন গৌরবব্যঞ্জক কিছুই নাই। কেবলমাত্র গ্রাণ্ড্‌ট্রঙ্ক রোডের দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটি মস্‌জিদ আছে। বলাবাহুল্য, এই মস্‌জিদই এক্ষণে কৌতুহলী দর্শকের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকে। এই মস্‌জিদটী সৈয়দ ফকরুদ্দীনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সপ্তগ্রাম এক্ষণে একটি নগণ্য গ্রাম মাত্র, কিন্তু এখনও সাতখানি গ্রামের সমবায়ে এই সাঁতগা গঠিত। বাসুদেবপুর, বংশবাটী, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বানগর এবং সাঁতগাও এই সাতটী গ্রাম লইয়া সপ্তগ্রাম গঠিত। সাঁতগাওয়ের পাদমূলবাহিনী সরস্বতী এখন আর দুকুলপ্লাবিনী, বীচিমালা-বিক্ষোভিতা স্রোতস্বিনী নহে, এক্ষণে উহা বারিবিহীনা ক্ষুদ্র তটিনী মাত্র। সমগ্র বৎসরের মধ্যে কেবল প্রাবৃট্‌কালেই সরস্বতীতে জলরাশি দেখা যায়। সপ্তগ্রাম যে বঙ্গের একটি প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দর একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মস্থান বলিয়াও সাঁতগাও কম প্রসিদ্ধ ছিল না। এখানে বহু দেব-মন্দির ছিল। সেই সমস্ত মন্দিরে নানাদিগ্দেশ হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী আগমন করিতেন। এখন সেই সমস্ত মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকিলেও একটি মন্দিরের যাহা কিছু সামান্য ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে সুবর্ণবণিকেরা অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ের Rothcheilds ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং অনেকবার

তাঁহারা স্বয়ং রাজাকে পর্য্যন্ত ঋণ দান করিতেন। এই বণিক্‌সম্প্রদায়ের মধ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন ছিলেন। তিনি রাজাকে পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য ঋণ দিতে অস্বীকার করায় রাজা তাঁহাকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত বণিক্ ও তাঁহার সম্প্রদায়িগণ সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির কথা শুনিতে পাইয়া তথায় আগমন করেন এবং বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই বণিক্‌গণের মধ্যে নীলাম্বর দত্ত নামে একজন ছিলেন। তাঁহার বংশধর উদ্ধারণ দত্ত, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচার করেন, তখন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। উপরে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মন্দিরটীর বিষয় বলা হইল, সেই মন্দিরটী এই সাধু উদ্ধারণ দত্তের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরটী ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট অতি পূজ্য ও শ্রদ্ধার স্থান। এই মন্দিরে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া উদ্ধারণ দত্তের দেহাবশেষ ও অতি পুরাতন একটি মাধবী-বৃক্ষ আছে। কথিত আছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ যখন সাতগাঁও দর্শন করেন, তখন উদ্ধারণ তাঁহার পাচকের কার্য্য করিতেন। যে বৃক্ষশাখা দ্বারা তাঁহার জন্য রন্ধন হইত, সেই বৃক্ষশাখার একটি নিতাই স্বয়ং রোপণ করেন। সেই বৃক্ষশাখাই কালক্রমে মাধবী-মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। এই মাধবীবৃক্ষটীর বর্ত্তমান বেড় ৬ ফিট্। প্রতিবৎসর ডিসেম্বরমাসে সপ্তগ্রামে, ত্রিবেণীতে ও কৃষ্ণপুরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; তখন বহুস্থান হইতে অসংখ্য লোক এখানে উপস্থিত হয়।

সপ্তগ্রামের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নহে। সাঁতগাঁওয়ের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে বান্দেল। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বান্দেল নির্ম্মিত হয়।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের উপর এখন হুগলী সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সাতগাঁও বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর ছিল। এই হুগলীতেই সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই-খানেই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হল্‌হেড সাহেবের বাঙ্গালাব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

কালচক্রের আবর্ত্তনে এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বঙ্গের গৌরবকাহিনী বলিতে গেলে, কবিবর মাইকেলের কথায় বলিতে হয় "একে একে নিবেছে দেউটী।" যাহা ছিল তাহা নাই, আবার এখনো যাহা আছে, কিছুকাল পরে তাহাও থাকিবে না। জনৈক কবি সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া সন্দর্ভের উপসংহার করিলাম :—

এই সপ্তগ্রামে,—
অতীতের সে কোন নিশায়
সৌভাগ্য-চন্দ্রিকা রাশি
উঠিল সগর্ব্বে হাসি !
যাদুকর কর-স্পর্শে বনভূমি মাঝে
আচম্বিতে দিল দেখা পুরী রম্য সাজে !

এই সপ্তগ্রামে,—
অতীতের এক নিশাশেষে
সাধের জীবন খেলা
ভেঙ্গে গেল ভোরবেলা !
মোগলের 'অর্দ্ধচন্দ্র' হেলিল নিরাশে ;
উঠিল নবীন রবি পূরব আকাশে।

এই সপ্তগ্রামে,—
অতীতের সেই নিদর্শন
দেখাতে, ক্ষীণাঙ্গী নদী
চলিয়াছে মন্দগতি !
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি, যেন ভয়ভীতা,
দুর্গভিত্তি প্রতি কহে 'বল দর্প বৃথা !'

এই সপ্তগ্রামে,—
মোগল-ফিরিঙ্গী রণাঙ্গনে
কত অস্ত্র ঝনৎকার
উঠেছিল হাহাকার !
কত রণদুন্দুভির দামামার রোল
করেছিল আলোড়িত ধরণীর কোল !

এই সপ্তগ্রামে,—
গর্ব্বস্ফীতা এই সরস্বতী
কত পোত যার জলে
ভেসে যেত দলে দলে !
বাণিজ্য-কুশলী তাই পর্ত্তুগীজগণ
'গঙ্গার সাম্রাজ্ঞী' আখ্যা করিল অর্পণ !

এই সপ্তগ্রামে,—
সুবর্ণবণিক্‌কুলরবি
ভাগ্যবন্ত উদ্ধারণ
করিলেন আনয়ন
শুষ্ক হৃদি মরুভূমে স্বজাতির যত
প্রেমের জাহ্নবী-ধারা; ভগীরথ মত !

এই সপ্তগ্রামে,—
অতীতের সাক্ষ্য দিতে আজ,
শ্রীপাটে মন্দির রাজে
উজলি কানন মাঝে,
জনহীন সারাবর্ষ করে অধিষ্ঠান ;
শ্রীকৃদেবী "নিওবী"র মত ভগ্নপ্রাণ !

এই সপ্তগ্রামে,—
স্বজাতির মহাতীর্থধামে,
অতীতের পদে যাচি
অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি !
শ্মশানে ফুটেনা ভাষা ! নয়নের জল
মানেনা বারণ তাই ঝরে অবিরল।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বৈদিকসাহিত্যের কাল-নিরূপণ

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(মহামতি তিলকের Orion নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে "শেষঋতু"-বিষয়ক আপত্তির উল্লেখ নাই এমন নহে, অধিকন্তু ঐ ঋতুতে শীতলজলে স্নান করা অপ্রীতিকর—এই মন্তব্য প্রকাশ করায় পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সম্বন্ধীয় অভিমতটীর আরও সম্প্রসারণ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহাকে আর নূতন আপত্তি বলা চলে না। একাষ্টকাদিনে যজ্ঞারম্ভ বৎসরের "ব্যস্ত" অংশে অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়, ইহাই তৃতীয় আপত্তি। "ব্যস্ত" শব্দটীর দ্বারা অয়নপরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে—শবরস্বামী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যও ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমদিবসে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁহারা যদিও একাষ্টকার স্বামী বৎসরের প্রারম্ভেই ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ঐ কার্য্য শীতঋতুতে—শেষ ঋতুতে, (যখন জলের স্পর্শ অপ্রীতিজনক) এবং বৎসরের ব্যস্ত অংশে অনুষ্ঠিত হয়—বলিয়া ত্রিবিধ-প্রকারে দোষাত্মক।

এই সকল আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে না পারে—এজন্য আর একটী অন্যপ্রকার পদ্ধতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ফাল্গুনীপূর্ণিমাই বৎসরের প্রথমদিন বলিয়া খ্যাত ছিল। যদি সেইদিনে যজ্ঞারম্ভ করা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ-দোষ-বর্জ্জিত অবস্থায় বৎসরের প্রথমেই যজ্ঞারম্ভ করা যায়। কিন্তু এই প্রথাও একেবারে দোষশূন্য নহে, কেননা যদি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিন যজ্ঞারম্ভ করা যায়, তাহা হইলে সত্রের মধ্যদিবস অনভিপ্রেত বর্ষাকালের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সত্রের প্রথম দ্বাদশদিবস দীক্ষা—কার্য্যে অতিবাহিত হয়, আরও দ্বাদশদিবস "উপসদের" (১) অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয় এবং তৎপরে সত্রের বলি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং সত্রের মধ্য-দিবস ফাল্গুনীপূর্ণিমা হইতে গণনায় ছয়মাস চতুর্ব্বিংশতি দিবস পরে অর্থাৎ আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের নবমীতিথিতে সংঘটিত হইবে। আমরা যদি মনে করি যে, মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণবিন্দু অর্থাৎ শীতঋতুর প্রারম্ভ হয়, তবে

(১) "উপসদ্" হোমবিশেষ।

শ্রাবণমাসের পূর্ণিমার কিছু পরেই দক্ষিণায়নবিন্দু অর্থাৎ গ্রীষ্মাবসান অথবা বর্ষার প্রারম্ভ সূচিত হইবে। সুতরাং ঐ সময়ে ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস বর্ষাকাল বলিয়া গণ্য ছিল এবং আশ্বিনে অর্থাৎ বর্ষাকালে বিষুবান্ সংঘটিত হওয়ায় শুভদায়ক বলিয়া গণ্য হইত না। ভিন্নপ্রকার প্রথানুসারে সর্ব্বদোষবর্জ্জিত চৈত্রপূর্ণিমায় শৌচ কার্য্য আরম্ভ করিতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু আরও শুভসময়ের প্রত্যাশায় এই সময় ত্যাগ করিয়া ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যাঁহারা সত্রের অনুষ্ঠানের জন্য পূত হইতে চাহেন, তাঁহারা "পূর্ণিমার চারিদিবস পূর্ব্বে দীক্ষা-সম্পাদন করিবেন।" ("চতুরহে পুরস্তাৎ পৌর্ণমাস্যা দীক্ষেরণ্") এই পূর্ণিমার কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকায় ইহা জৈমিনির একটী অধিকরণের—বিষয়ীভূত হইয়াছে। * কোন নির্দ্দিষ্ট পূর্ণিমার উল্লেখ না থাকায় ইহা যে কোনও পূর্ণিমা অথবা চৈত্রপূর্ণিমা বা মাঘী-পূর্ণিমাকে বুঝাইতে পারে। জৈমিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মাঘীপূর্ণিমাকে বুঝিতে হইবে, কেনন্য উদ্ধৃত অংশে এই পূর্ণিমা-শব্দের পরে একাষ্টকার উল্লেখ করা হইয়াছে। (তেষামেকাষ্টকায়াং ক্রয়ঃ সম্পদ্যতে।) এই "একাষ্টকা" উদ্ধৃত অংশের প্রারম্ভে উল্লিখিত একাষ্টকা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং পূর্ব্বে ঐ শুভ (একাষ্টকা-) দিনে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উপদেশ দিয়া পরে ত্রিবিধ কারণে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া কোনও প্রকারে তবুও যদি ঐ দিনে কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে শেষের প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং "পূর্ণিমা"শব্দে এই একাষ্টকার অব্যবহিত পূর্ব্বের পূর্ণিমাকে বুঝাইতেছে। এই পূর্ণিমা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, যখন যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, তখন ওষধিসকল উদগত হইবে। (ওষধয়োনুত্তিষ্ঠন্তি) শবরের মতে ইহা বসন্তকাল ভিন্ন হইতে পারে না।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণিমার কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকিলেও উহা বসন্তকালের পূর্ব্বের বৎসরের পত্নী, বৎসরের শেষ ঋতু এবং শীতঋতুর মধ্যস্থ একাষ্টকার পূর্ব্বের পূর্ণিমাকে বুঝাইতেছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ফাল্গুনী ও চৈত্রপূর্ণিমাকেও বাদ দিতে হইবে এবং তখন সূর্য্য উত্তরায়ণবিন্দু অতিক্রম করিয়াছেন। সুতরাং জৈমিনি স্থির করিয়াছেন

* মীমাংসাদর্শন ৬—৫, ৩০—৩৭
"পৌর্ণমাস্যামনিয়মো + + +
+ + + অন্যাং চ সর্ব্বলিঙ্গানি।

যে, পূর্ব্বোক্ত পূর্ণিমা শব্দ অন্য কোন পূর্ণিমাকে না বুঝাইয়া মাঘীপূর্ণিমাকে বুঝাইতেছে। অন্যান্য মীমাংসকগণ জৈমিনির মতের পোষকতা করিয়াছেন। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, লৌগাক্ষি কেন লিখিয়াছেন যে মাঘী-পূর্ণিমার চারিদিন পূর্ব্বে বৎসরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করা হইত।

যদি জৈমিনির মীমাংসা অভ্রান্ত হয়, তবে আমরা আমাদের আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

১। যখন তৈত্তিরীয়সংহিতা প্রণীত হইয়াছিল, তখন উত্তরায়ণ শীত-ঋতুর অন্তর্গত মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির পূর্ব্বে আরব্ধ হইত। মাঘীপূর্ণিমায় আরম্ভ হইত কিনা, ঠিক জানা না গেলে, সেইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ব্যস্ত অংশে—সংঘটিত হওয়ায় একাষ্টকা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিতীয় দিন নির্ব্বাচন করিতে গেলে, একাষ্টকা-সম্বন্ধীয় দোষ যতদূর সম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—অর্থাৎ শেষঋতুতে অথবা বৎসরের ব্যস্ত অংশে ঐ শুভদিন নির্ব্বাচিত না হইবারই কথা। সম্ভবতঃ মাঘীপূর্ণিমার পূর্ব্বের একটী দিন নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, মাঘীপূর্ণিমায়ই উত্তরায়ণ আরব্ধ হইত। একাষ্টকাদিনে শুভকার্য্যের কোন না কোন অনুষ্ঠান করিবার জন্য বৈদিকঋষিগণের যেরূপ আগ্রহ দেখা যায়, তাহাতে "চতুরহে পুরস্তাৎ" বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে কোন কষ্ট করিতে হইবে না। সমস্ত উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বৎসরের প্রারম্ভে যজ্ঞারম্ভ করার অভিপ্রায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এবং মাঘীপূর্ণিমাই বৎসরের প্রারম্ভ বলিয়া অনুমিত হয়।

২। তখন উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বৎসর-প্রবর্ত্তন হইত।

৩। যখন একমাসের মধ্যে বৎসরের তিনটী প্রারম্ভকাল সূচিত হইতে পারে না, তখন উদ্ধৃত অংশে চৈত্রপূর্ণিমা ও ফাল্গুনীপূর্ণিমার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে পারা যায় যে, তত্তৎসময়ের পূর্ব্বে কোনকালে বর্ষারম্ভ হইত।

৪। "বিষুবান্" শব্দটীর প্রাথমিক অর্থের লাঘব হইয়াছে এবং যদি ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় যজ্ঞ আরম্ভ করা যায়, তবে বিষুবান্দিবস বর্ষাকালের মধ্যে সংঘটিত হয়।

উপর্য্যুক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৈত্তিরীয়সংহিতা-প্রণয়ন-কালে কৃত্তিকানক্ষত্র বাসন্তবিষুববিন্দুতে অবস্থিত ছিল। কেননা, যদি মাঘী-পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরব্ধ হয়—তবে সেদিন দক্ষিণায়নবিন্দুতে মঘানক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত থাকিবে এবং বিপরীতদিকে ৭টী নক্ষত্র গণনা করিলে বাসন্তবিষুববিন্দু

কৃত্তিকানক্ষত্রের সহিত একত্র অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং বেদাঙ্গজ্যোতিষ ব্যতীত আমরা তৈত্তিরীয়সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে এই একত্রাবস্থান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চারিবার উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতেছি। প্রথমতঃ তৈত্তিরীয়সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে কৃত্তিকাপ্রমুখ নক্ষত্র ও তাহাদিগের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে যে, কৃত্তিকা নক্ষত্রগণের মুখ। তৃতীয়তঃ কৃত্তিকা উত্তরগোলার্দ্ধের অর্থাৎ দেবনক্ষত্রগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মাঘমাসে উত্তরায়ণ আরব্ধ হইত। এই সকল স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃত্তিকা ও বাসন্ত-বিষুববিন্দুর সমাবস্থানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সুতরাং যখন তৈত্তিরীয়-সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন কৃত্তিকা ও বাসন্তবিষুববিন্দু একত্র অবস্থিত ছিল—সে সম্বন্ধে বৈদিকসাহিত্য হইতে আর অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। তবুও অতিরিক্ত প্রমাণরূপে দেখান যাইতে পারে—যে তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৪—৪—১০—১) পিতৃগণ মঘার অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃত্তিকা যদি বাসন্তবিষুববিন্দুতে অবস্থিত হয়, দক্ষিণায়ন-বিন্দু মঘানক্ষত্রে অবস্থিত হইবে—এবং এই সময় দক্ষিণায়ন অর্থাৎ পিতৃ-অয়ন আরব্ধ হয় বলিয়া তৎস্থানবর্ত্তী নক্ষত্রকে পিতৃগণের আশ্রিত বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। এইরূপে কৃত্তিকা ও বাসন্তবিষুববিন্দুর একত্রাবস্থানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রবিমার্গের অন্যান্য প্রধান প্রধান বিন্দুর অবস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কৃত্তিকাকে ঐনামীয় নক্ষত্র বলিয়া ধরিয়া লইলে, অধ্যাপক হুইট্নীর গণনা-মতে খৃঃ পূঃ ২৩৫০ অব্দে তৈত্তিরীয়সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল মনে করিতে হইবে। কোন কোন পণ্ডিত বৈদিকসাহিত্যকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে করা আপত্তিজনক মনে করিয়া উপযুক্ত কারণ ব্যতীত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এস্থলে 'কৃত্তিকা' শব্দে রাশিচক্রের ঐ নামীয় অংশের প্রারম্ভ সূচিত হইতেছে। কৃত্তিকার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় অংশে রাশি-চক্রের ১০°—৫০' স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কৃত্তিকানক্ষত্রের পরিবর্ত্তে রাশিচক্রের 'কৃত্তিকা'নামক অংশের প্রারম্ভ বুঝাইলে, কৃত্তিকানক্ষত্রের প্রায় ১১০° ডিক্রী পশ্চাতে বাসন্তবিষুববিন্দু অবস্থিত হইবে। এই হিসাবে সংহিতা-সঙ্কলন কাল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের ৭২×১১=৭৯২ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ

১৪২৬ অব্দে নির্দ্ধারিত হয়। আমি পূর্ব্বেই এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছি এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈদিকসময়ে 'নক্ষত্র'-শব্দে রাশিচক্রের অংশবিশেষকে না বুঝাইয়া সেই নামীয় নক্ষত্রকে বুঝাইত। যদি মনে করা হয় * যে, ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থকারগণ খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে অয়নবিন্দু সম্বন্ধে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে অক্ষম ছিলেন—তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্তবিষুবিন্দু অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তখন তাঁহারা ঐ নামীয় নক্ষত্রের পরিবর্ত্তে রাশিচক্রের অংশবিশেষকে কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহা অনুমান করা অসঙ্গত ও ন্যায়বিরুদ্ধ। আমি বুঝিতে পারি না যে, চীন ও ইজিপ্টদেশীয়দিগের সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আপত্তি না করিলেও বৈদিকসাহিত্যকে তাহাদিগের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিতে কেন পণ্ডিতগণের এত আপত্তি! †

কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আমি যদি দেখাইতে পারি (আশা করি পারিব) যে বৈদিকসাহিত্যে এরূপ প্রচুর প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে, যাহা দ্বারা ইজিপ্ট বা চীনদেশীয় সাহিত্য অপেক্ষা বৈদিকসাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করিতে পারা যায়, তবে বিরুদ্ধবাদিদিগের ভ্রান্ত ধারণা কল্পনা ও মত খণ্ডন করিবার জন্য কোন যুক্তি বা তর্কের অবতারণা করিতে হইবে না।

বেণ্টলি অন্যভাবে এই বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "বিশাখা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে "দুই শাখাবিশিষ্ট" ইহাই বুঝিতে পারা যায় এবং বিষুববিন্দুদ্বয়-সংযোজক বৃত্ত রাশিচক্রস্থিত বিশাখা-নামক অংশকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া এই দুই শাখার উৎপাদন করিয়াছে। ঐ বৃত্ত কৃত্তিকার প্রথম অংশের মধ্য দিয়া যাইলেই "বিশাখা"কে দ্বিখণ্ডিত করিবে। বেণ্টলি সেইজন্য কেবল ঐ ঘটনার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যখন বিশাখানক্ষত্র ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তখন বিষুববিন্দুদ্বয়-সংযোজক বৃত্তের উপর্য্যুক্ত অবস্থান ছিল। তাঁহার ধারণা সুযুক্তিপূর্ণ না হইলেও কূটবুদ্ধির পরিচায়ক। বৈদিকসাহিত্যে এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহা দ্বারা এই ধারণার পোষকতা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহা

---

* ঋগ্বেদ পূর্ব্বিভাষ ৪র্থ খণ্ড—২৯ পৃঃ।

† বায়ট্ বলেন যে, হিন্দুগণ চীনদেশীয়দিগের নিকট হইতে খগোল-বৃত্তান্ত শিক্ষা করেন।

দেখান যাইতে পারে, এই তৈত্তিরীয়সংহিতায় উত্তরায়ণবিন্দুর যে অবস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা বেণ্টলির ধারণার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, তৈত্তিরীয়-সংহিতা-প্রণয়নকালে উত্তরায়ণবিন্দু মাঘীপূর্ণিমায় এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষ-মতে আরও একপক্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে সংঘটিত হইত।

মোটামুটি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, বিষুববিন্দু দুই নক্ষত্রস্থান অর্থাৎ ২৬ অংশ ৪০ কলা পরিমিত স্থান পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে ঋতুপ্রবর্ত্তনকাল একমাস পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। সুতরাং তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বেদাঙ্গজ্যোতিষ-প্রণয়নকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিষুববিন্দু ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত স্থান পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। বেদাঙ্গজ্যোতিষে ভরণীনক্ষত্রের পর অংশে বিষুববিন্দুর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইস্থান হইতে কৃত্তিকায় প্রারম্ভ ৩ অংশ ২০ কলা দূরে অবস্থিত, কিন্তু কৃত্তিকানক্ষত্র ঐ স্থান হইতে ৩°।২০´+১০°।৫০´=১৪°।১০´ দূরে অবস্থিত। সুতরাং তৈত্তিরীয়সংহিতা-প্রণয়নকাল হইতে বেদাঙ্গজ্যোতিষ-প্রণয়ন পর্য্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে বেণ্টলির মতে বিষুববিন্দু ৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত স্থান পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে; কিন্তু যদি 'কৃত্তিকা' বলিতে কৃত্তিকানক্ষত্রকে বুঝায়—তবে অয়নাংশের পরিমাণ ১৪ অংশ ১০ কলা হইবে। উত্তরায়ণবিন্দু যখন ঐ সংহিতা-প্রণয়নকালে চতুর্দ্দশদিবস পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন ঐ হিসাবে অয়নাংশের পরিমাণ ১৪ অংশ এবং বাসন্তবিষুববিন্দু কৃত্তিকায় অবস্থিত ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যুক্তিসিদ্ধ। অন্যান্য কারণেও এই অনুমান সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যদি তৈত্তিরীয়-সংহিতোক্ত যুক্তি-সিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া, বিশাখা-শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত কষ্ট-কল্পিত অর্থের উপর আস্থাস্থাপন না করা যায়, তবে বেণ্টলির মত গ্রহণীয় নহে।

বিশাখা-শব্দের ব্যাখা সম্বন্ধে বেণ্টলির মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা একেবারে সন্দেহ-শূন্য নহে। বিশাখার দুই অংশ ঠিক্ সমান, তাহার কি প্রমাণ আছে? বিদল-শব্দে এরূপ বুঝাইলেও দল ও শাখা শব্দ এই সম্বন্ধে একার্থবোধক নহে। বিষুব-বিন্দু সংযোজক বৃত্ত বিশাখাকে দ্বিখণ্ডিত করা সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিলেও উহাকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে—এরূপ যুক্তির কোন প্রমাণ নাই। সমুদয় রবিমার্গকে ২৭টী নক্ষত্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক গোলার্দ্ধে

১৩॥০টী করিয়া নক্ষত্র অবস্থিত হইতেছে। কৃত্তিকা হইতে গণনায় চতুর্দ্দশ নক্ষত্র বিশাখা আংশিকভাবে দেব ও পিতৃদিগের আবাসভূমি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবস্থিত ছিল। কারণ যদিও আমরা মনে করিতে পারি যে, বৈদিক সময়ের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আকাশমণ্ডলে কাল্পনিক বিন্দু নির্দ্দেশ করিয়া সেই ভিত্তির উপর আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের ন্যায় জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি নির্ণয় করিতে সক্ষম ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলার পরস্পরের দূরত্বের বিষয় তাঁহারা অবগত ছিলেন না—এরূপ ধারণা অসঙ্গত মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা নক্ষত্রগণের পরস্পরের দূরত্বের বিষয় অবগত ছিলেন, কিন্তু জ্যোতিষ্কসমূহের গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁহারা স্থির নক্ষত্রগণের অবস্থানের উপর নির্ভর করিতেন। এই হিসাবে বেণ্টলির বিশাখা-শব্দের ব্যাখ্যা হইতে বিষুববিন্দু-সংযোজক বৃত্ত, বিশাখা-নক্ষত্রপরিমিত স্থানকে (অর্থাৎ রাশিচক্রে বিশাখা-নক্ষত্র-সম্বলিত ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত স্থানকে) সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে—ইহা অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ যখন তাঁহার স্বীয় ধারণাই তাঁহার মতের পোষকতা করে না এবং যখন অন্যান্য কারণে ঐ সিদ্ধান্ত আপত্তিজনক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, তখন বেণ্টলির মত উপেক্ষা না করিবার কোন হেতু নাই। সুতরাং আমি বলিতে চাই যে, তৈত্তিরীয়-সংহিতা খৃঃ পূঃ ২৩৫০ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং বেণ্টলির মতানুসারে উহা কখনই খৃঃ পূঃ ১৪২৬ অব্দে সঙ্কলিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তাহা অন্যান্য পণ্ডিতগণও অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আমরা কি বৈদিকসাহিত্যের প্রাচীনত্বের শেষসীমায় উপস্থিত হইয়াছি? প্রাচীনতম বেদগীতি বা আর্য্যদিগের মানসিক ভাবের প্রথম অভিব্যক্তির কি সীমা এই পর্য্যন্ত? ইহার পূর্ব্বের কি কিছুই নিদর্শন নাই? প্রাচীনকালের ব্রহ্মবাদিগণ ও পাণিনি খৃষ্টজন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে যাহা "দেখিয়াছেন" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কি সেই স্তোত্র? পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে আমি বৈদিকসাহিত্য হইতে এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিব, যাহা দ্বারা এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় চিত্রা ও ফাল্গুনীপূর্ণিমা বৎসরের মুখরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সকল বাক্যের গূঢ় অর্থ কি, এবং অন্য প্রমাণের দ্বারা কতদূর তাহাদের সত্যতা নিরূপণ করা যায়, এবং তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তের ব্রহ্ম এবং ন্যায় ও যোগমতের ঈশ্বরের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

এতত্ত্রয়ের সামঞ্জস্য বা পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে ন্যায় ও যোগ-শাস্ত্রের ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্তি দেখিতে হয়। এই প্রবন্ধে প্রথমোক্ত শাস্ত্রদ্বয়ে ঈশ্বরের স্থান-নির্দ্দেশানন্তর বেদান্তসম্মত ব্রহ্মের সহিত তাহার সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য বিবেচিত হইবে। প্রথমে ন্যায়শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ বিচার আছে দেখা যাউক্। গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের চতুর্থ অধ্যায় প্রথম আহ্নিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সূত্র আছে যথা—"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" "ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" ভিন্ন উক্ত ন্যায়শাস্ত্রের কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বাৎস্যায়নমুনি এই শাস্ত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তিনি এই সূত্রগুলির এই অর্থ করেন যে, কর্ম্ম দ্বারাই শরীরের উৎপত্তি ও সুখদুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে ও পুরুষ চেষ্টা করিয়াও অনেক সময়ে স্বীয় অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং পুরুষার্থ পরাধীন এবং পুরুষার্থ-প্রদানকারী একজন কেহ আছেন এবং তিনিই ঈশ্বর—ইত্যাদি বাক্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়, কারণ কর্ম্মফল-প্রদান যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হইত, তাহা হইলে বিনা উদ্যোগে পাওয়া যাইত এবং তাহা যখন পাওয়া যাইতেছে না—তখন এই ধারণা অমূলক। পর সূত্রের অর্থ এই যে, ঈশ্বরকে কর্ম্মফলের কর্ত্তা স্বীকার না করিয়া কর্ম্মকেই তৎফলের কর্ত্তা স্বীকার করা হউক, তাহাও হয় না, কারণ কর্ম্ম জড়, সুতরাং নিজ-ফল-সম্পাদনে অসমর্থ, সুতরাং কর্ম্মের যে ফলাদি দৃষ্ট হয়, ঈশ্বরই তৎসমুদয়ের কর্ত্তা। জীব কর্ম্মফলের কর্ত্তা নহে, কারণ ফল তাহার অভিপ্রায় অনুসারে হয় না। তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী এবং প্রাণী ও জগৎ-সৃজনকারী। ঈশ্বরের কর্ম্মফল নিজভূত মনে করা উচিত। তিনি সকলের পিতাস্বরূপ। বেদাদিতেও এই উপদেশ আছে। অতএব কর্ম্মফলের একজন কর্ত্তা আছেন ও তিনিই ঈশ্বর—সিদ্ধ হইল। "ন্যায়-বার্ত্তিক"-প্রণেতা উদ্যোতকরাচার্য্য উল্লিখিত সূত্রের প্রথমটীর সম্বন্ধে এক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু পরটীর স্থলে কর্ম্মাদি ঈশ্বরসাপেক্ষ নহে কারণ ঈশ্বর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যেনৈব ন্যায়েন ঈশ্বরস্য কারণত্বং, সিদ্ধতি, তেনৈবাস্তিত্বমিতি; নহ্যবিদ্যমানং কারণমিতি।" "ন কারণং ঈশ্বরঃ, নিষ্ফলানুপপত্তেঃ; কর্ত্তা চেদীশ্বরঃ, কিং সাপেক্ষঃ করোতি, উত নিরপেক্ষ ইতি? × × অয়মীশ্বরঃ কুর্ব্বাণঃ কিমর্থং করোতি? লোকে হি যে কর্ত্তারো ভবন্তি তে কিঞ্চিদুদ্দিশ্য প্রবর্ত্তন্তে—ইদমাপ্স্যামি ইদং হাস্যামি চেতি, ন পুনরীশ্বরস্য প্রেপ্সিতং দুঃখাভাবাৎ, নোপাদেয়ং বশিত্বাৎ? যদীশ্বরস্যৈশ্বর্য্যং কিং তন্নিত্যমনিত্যমিতি সন্দেহঃ—ঈশ্বরঃ কিং দ্রব্যমাহো গুণাদীনামন্যতম ইতি? অথ বুদ্ধিমত্ত্বে ঈশ্বরস্য শরীরযোগমপি প্রতিপদ্যতে? কিময়ং বদ্ধো মুক্ত ইতি? স পুনরাত্মান্তরসম্বন্ধঃ কিং ব্যাপকোহব্যাপকো বা ইতি?"—ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া, অবশেষে "এবং যত্র যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ কার্য্যত্বস্য, তত্তদনেনৈব ন্যায়েনানেন দৃষ্টান্তেন বাস্যাদিনা পক্ষয়িত্বা সাধয়িতব্যম্। আগমাচ্চ—আগমাদিষু শ্রূয়তে ঈশ্বরঃ কারণম্" বলিয়া নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥ যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বো নিমীলতি॥" উদয়নাচার্য্য "কুসুমাঞ্জলি" নামক (ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয়) একখানি গ্রন্থ পাঁচস্তবকে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মনন-ব্যপদেশভাক্" অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্ক-যুক্তিই শাস্ত্রোক্ত মননক্রিয়ার স্থানীয়।

"কুসুমাঞ্জলি"র নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রমায়াঃ পরতন্ত্রত্বাৎ সর্গ-প্রলয়-সম্ভবাৎ।
তদন্যস্মিন্নবিশ্বাসান্ন বিধান্তরসম্ভবঃ॥ (২।১)

অপ্রাপ্তেরধিকপ্রাপ্তেরলক্ষণমপূর্ব্বদৃক্।
যথার্থোহনুভবো নাম মমপক্ষতয়েষ্যতে॥ (৪।১)

মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগ-ব্যবচ্ছেদঃ প্রমাণং গৌতমে মতে॥
সাক্ষাৎকারিণি নিত্যযোগিনি পরদ্বারানপেক্ষস্থিতৌ (৪।৫)

ভূতার্থানুভবে নিবিষ্টনিখিলপ্রস্তাবিবাস্তু ক্রমঃ।
নৈশাদৃষ্টিনিমিত্তদুষ্টি-বিগম-প্রভ্রষ্টশঙ্কাতুরঃ
শঙ্কোন্মেষকলোঙ্কিভিঃ কিমপরৈস্তন্মে প্রমাণঃ শিবঃ (১।৬)

তর্কাভাসতয়াহন্যেষাং তর্কাশুদ্ধিরদূষণম্।
অনুকূলস্তু তর্কোহত্র কার্য্যলোপো বিভূষণম্ (৫।৩)

ইত্যেবং শ্রুতিনীতি-সংপ্লব-জলৈর্ভূয়োভিরাক্ষালিতে
যেষাং নাস্পদমাদধাসি হৃদয়ে তে শৈলসারাশয়াঃ
কিন্তু প্রস্তুতবিপ্রতীপবিধয়োহপ্যুচ্চৈঃ ভবচ্চিন্তকাঃ
কালে কারুণিক ত্বয়ৈব কৃপয়া তে তারণীয়া নরাঃ (৫।১৭)

"সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ"কার মাধবাচার্য্য ন্যায়-মতের ঈশ্বর সম্বন্ধে তদীয় পুস্তকে বিশেষ কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই। অতএব দেখা গেল যে, ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ন্যায়-শাস্ত্রসম্মত মোক্ষ বা অপবর্গ-লাভের সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই। ন্যায়ে যে ষোড়শপদার্থের উল্লেখ আছে, তাহাদের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষলাভ হইবে। তর্কস্থলে কর্ম্মফলাদি ও জগৎ এবং প্রাণিসৃজনাদির একজন কর্ত্তা আবশ্যক, ঈশ্বর সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ান্তঃপাতী নহেন, প্রাসঙ্গিক মাত্র।

এক্ষণে "পতঞ্জলি"প্রণীত "যোগশাস্ত্রে" ঈশ্বরকে কোন্ স্থান দেওয়া হইয়াছে—তাহাই বিচার্য্য। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ "পাতঞ্জলদর্শনে" ঈশ্বর সম্বন্ধে অতিসামান্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"ঈশ্বরপ্রণিধানং নামাভিহিতানাং চ সর্ব্বাসাং ক্রিয়ানাম্ পরমেশ্বরে পরমগুরৌ ফলানপেক্ষতয়া সমর্পণম্। অত্রেদমুক্তম্—

কামতোঽকামতো বাঽপি যৎকরোমি শুভাশুভং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং।

ক্রিয়াফলসংন্যাসোঽপি ভক্তিবিশেষাপরপর্য্যায়ঃ প্রণিধানমেব, ফলাভিসংধানেন—কর্ম্মকরণাৎ"—বলিয়া গীতার "কর্ম্মফলে অধিকার নাই, কর্ম্মে আছে" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ও নীলকণ্ঠ ভারতীর উক্তি—

"স্বাপি প্রযত্নসংপন্নং কামেনোপহতং তপঃ।
ন তুষ্টয়ে মহেশস্য শ্বলীঢ়মিব পায়সম্॥"

দ্বারা যোগশাস্ত্রের ঈশ্বর-প্রামাণ্য শেষ করিয়াছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে পতঞ্জলির গ্রন্থে ৩টী সূত্র আছে। "যোগবার্ত্তিকে" সমাধিপাদের ২৩।২৬ সূত্রের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ ব্রহ্মাত্মনা চিন্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাৎ নিরূপ্যমানাৎ প্রণিধানাদাবর্জিতোঽভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধ্যানমাত্রেণ যোগশক্ত্যাদি-রূপাদনুষ্ঠানমাদ্যোঽপাস্যগৃহ্ণাতি আনুকূল্যাং ভজতে, অতস্তস্মাদভিধ্যানাদপি প্রণিধান-বিশেষ্যাদিদ্বারা যোগিনামাসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষোভবত ইত্যর্থঃ—বলিয়াছেন—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে প্রেম-ভক্তি দ্বারা তদভিমুখ করিলে, ঈশ্বর কৃপা করিয়া,

"ইহার মোক্ষ হউক্" এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ইচ্ছামাত্রই যোগী মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্র "সেশ্বর সাংখ্য" বলিয়া পরিচিত। মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পাতঞ্জল-দর্শনকে "সাংপ্রতং সেশ্বরসাংখ্যপ্রবর্ত্তকপতঞ্জলিপ্রভৃতিমুনিমতমনুবর্ত্তমানানাং মতমুপবর্ণ্যতে," বলিয়াছেন। কাপিল সাংখ্য প্রাধানাতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। অতএব এই স্থলে সাংখ্য ও যোগে বিরোধ ঘটে। এই বিরোধে সাংখ্যের মত কর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে পতঞ্জলি "ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ" বলিয়া ঈশ্বরের সংজ্ঞা করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মত যথা—"অতঃপ্রধানজীবাতিরিক্ত ঈশ্বরো নাস্তীতি সাংখ্যা-ক্ষেপ-নিরাসকত্তয়োত্তরংসূত্রমবতারয়তি। অথ প্রধানেতি। কইত্যাক্ষেপে। অথবা প্রকৃতিপুরুষাতিরিক্তস্যেশ্বরস্য কিং লক্ষণমিতি প্রশ্নেন লক্ষণসূত্র-মুত্থাপয়তি প্রধানেতি। সূত্রের অর্থ এই যে, যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়শূন্য, তিনিই ঈশ্বর। যোগবার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিচার দ্বারা—ও

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥

শ্রুতির উল্লেখ দ্বারা—

প্রকৃতের্বৈষম্যহেতুকোক্তেঃপীশ্বরেচ্ছাত এব; স্মর্য্যতে চ ততঃ সাম্যাবস্থায়ামপ্য-গত্যেশ্বরোপাধিজ্ঞানাদি স্বীকার্য্যমিতি"—বলিয়া পুনরায় উপাধি লইয়া অনেকত্ব সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছেন এবং তাহার মীমাংসা এই করিয়াছেন যে—যদিহি বিশিষ্টা অনেকে আত্মানঃ কল্পনীয়াস্তর্হি অস্মাসূপপন্নগৌরবং ভাবমপ্যাপত্তিমধিকং তু সাম্যৈক-কাত্মকল্পনমিতি॥ যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, পুরুষান্তরেভ্য ঈশ্বরস্য নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞরূপবিশেষান্তরং প্রতিপাদয়ন্ সূত্রমবতারয়তি—কিং চেতি। (যোগবার্ত্তিক)।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবীজম্॥

তিনি বিষ্ণু ও শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বার্ত্তিকোক্ত বচন এই যে—

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ ব্রহ্মন্ প্রধানাঃ ব্রহ্মশক্তয়ঃ।
ততোন্যূনাশ্চবৈত্রেয় দেবা দক্ষাদয়স্ততঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ॥

বার্ত্তিকে অবতার, ঐশ্বর্য্যাদি ও হিরণ্যগর্ভাদি সম্বন্ধে বিচার আছে। পরে উক্তি আছে যে—"আদিবিদ্বান্ স্বয়ং ভূঃসর্গাদাবাবির্ভূতো নির্ম্মাণচিত্ত

যোগবলেন স্বনির্ম্মিতং চিত্তমধিষ্ঠায় স্বাং যোনিং প্রবিশ্য কপিলাখ্যঃ পরমর্ষিঃ ভূত্বা কারুণ্যাৎ জিজ্ঞাসবে আসুরয়ে তত্ত্বং প্রোবাচেত্যর্থঃ।" এস্থলে হিরণ্যগর্ভাদির ব্যাপারে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ এই যে—স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ,—ঈশ্বর ব্রহ্মাদিরও গুরু, কারণ তিনি কালের অতীত। বার্ত্তিকে "কালানবচ্ছিন্নং গুরুং বিনা ন সম্ভবন্তীত্যর্থঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি। এখানেই যোগশাস্ত্রের ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইল।

শাস্ত্রের ঈশ্বর কিরূপ? তিনি আনন্দময়। শঙ্করাচার্য্য "সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে" বলিয়াছেন যে,—এই অজ্ঞানসমষ্টি সত্ত্বগুণের আধিক্য-প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট, কেবলসত্ত্বগুণ তাহার স্বভাব—তাহার স্বরূপ যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই ইহাকে "মায়া" বলিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বশক্তি-রূপ-গুণযুক্ত, সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, স্বতন্ত্র, সত্যসংকল্প এবং সত্যকাম, তিনিই ঈশ্বর। সত্ত্বগুণ সমষ্টিভূত অজ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতির কারণ—বলিয়া মনীষিগণ তাঁহাকে মহাশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক মহাবিষ্ণুর কারণ বলিয়া থাকেন ও আনন্দের বাহুল্যহেতু এবং কোশের ন্যায় আবরক বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে আনন্দময় কোশও বলিয়া থাকেন।

ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টসত্ত্বাংশোৎকর্ষতঃ পুরা
মায়েতি কথ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈক-লক্ষণা।
× × × ×
সর্ব্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্ব্বজ্ঞানাবভাসকঃ
স্বতন্ত্রঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ॥
তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণোঃ মহাশক্তের্মহীয়সঃ
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বান্মনীষিনঃ
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্ববৃংহিতম্
আনন্দপ্রচুরত্বেন চ্ছাদকত্বেন কোশবৎ
সৈষানন্দময়ঃ কোশ ইতীশস্য নিগদ্যতে॥

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে "সরস্বতীরহস্যোপনিষদে" আছে যে—

"শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়াং বিম্বিতোহজঃ।
কা মায়া স্ববশোপাধিঃ সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যহি।
জগৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুং বা চান্যথা কর্ত্তুমীশতে।
যঃ স ঈশ্বর ইত্যুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভিঃ গুণৈঃ॥

"নিরালম্বোপনিষদে" উক্ত আছে যে "ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাদীশ্বরঃ—" ঈশ্বরের কার্য্য কি? বহ্বাচোপনিষদে যথা—"ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।" ঈশ্বরের প্রবর্ত্তকত্ব সম্বন্ধে "কৌষীতক্যুপনিষদে" আছে যে—

এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমুন্নিনীষতে

এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে

"শারীরকভাষ্যে" এই ঈশ্বর "ব্রহ্ম"নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মই ভাষ্যে ভূমা, বৈশ্বানর ও গুহাপ্রবিষ্ট পুরুষ, জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর-শব্দবাচ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাষ্যে বিশেষ কোন বিচার নাই, কেবল ২ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম তর্কাতীত,—অনুমান দ্বারা তর্ক উদ্ভাবন করিলেও অন্যান্য তর্কাদির ন্যায় তাহাও প্রতিষ্ঠাহীন হয়। আর অন্যান্য সংস্কৃত বিষয়ে তর্ক সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু "ব্রহ্ম" সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসা নাই। এক পণ্ডিতের কল্পনায় অন্য পণ্ডিত দোষ প্রদর্শন করিবেন। বুদ্ধির বিচিত্রতা অনুসারে কল্পনারও বিচিত্রতা। গোতম, কণাদ ও কপিলাদি ঋষিগণের মতে পরস্পর বিরোধ আছে। উক্তি যথা—"কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কানাং শক্যং সমাশ্রয়িতুম্—পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ—অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধস্য মহাত্মনঃ কপিলস্যান্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়তে, এবমপ্যপ্রতিষ্ঠিতমেব। প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরানাং কপিলকণভুক্প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তি-দর্শনাৎ"—এই বাক্য দ্বারা ভাষ্যকার ন্যায়মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বিশেষতঃ ন্যায়ে যখন ঈশ্বরের স্থান গৌণ—দেখা গিয়াছে, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত বেদান্তসম্মত ব্রহ্মের সামঞ্জস্য বা বিরোধ কিরূপে প্রদর্শিত হইবে? যোগমত ও সাংখ্যসম্মত ঈশ্বর ও প্রধান বিষয়ে ভাষ্যে প্রকাশ্য বিচার আছে। ভাষ্যের এই বিচারাংশকে ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের "যোগস্মৃতের্বাধ্যত্বাধিকরণং" বলা হইয়াছে। এই অধিকরণে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই একটী সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বৈয়াসিক-ন্যায়মালা"য় যথা—

যোগস্মৃত্যাস্তি সংকোচোন বা যোগোহি বৈদিকঃ।
তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ তকঃ সংকুচ্যতে তয়া ॥
প্রধানেঽপি যোগে তাৎপর্য্যাৎ অতাৎপর্য্যান্ন সাত্র মা
অবৈদিকে প্রধানাংশাবসংকোচস্তয়াঽপ্যতঃ ॥

ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বাধিকরণে সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান-কারণ-বাদ নিরস্ত হইয়াছে, অতএব যোগস্মৃতিও তদ্দ্বারা প্রত্যুক্ত অর্থাৎ খণ্ডিত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, সাংখ্য ও যোগ এই দুইটী পরমপুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিখ্যাত, শিষ্টগৃহীত ও বেদ-পরিদৃষ্ট যথা—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহ ।৪।৫১) "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" (শ্বেতা ২।৮) "বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্" (কৌ ২। ৬। ১৮) তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়োযোগঃ" ইত্যাদি শ্রুতি আসনাদিকল্পনাপুরঃসর বহুপ্রপঞ্চ যোগবিধান করিতেছেন, তবে তাহাদের নিরাসার্থ যত্ন কেন? এই প্রশ্নের স্বভাবসিদ্ধ উত্তর এই যে—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতা ৩।৮) ইত্যাদি শ্রুতি বৈদিকজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানে বা পথে মোক্ষ হয় না—নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং "দ্বৈতিনোহি তে সাংখ্যাযোগাশ্চ নাত্মৈকত্ব-দর্শিনঃ, যত্তুদর্শনমুক্তং "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্" (শ্বেতা ৬।৩) ইতি বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানংচ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যামভিলপ্যেতে, প্রত্যাসত্তেরিত্যবগন্তব্যম্। যেন ত্বংশেন ন বিরুদ্ধ্যেতে, তেনেষ্টমেব সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্।" অবৈদিক সাংখ্য ও অবৈদিক যোগ মোক্ষদায়ক নহে; যোগ-স্মৃতির একঅংশ বেদসম্মত ও অপর অংশ বেদ-বিরুদ্ধ। যোগ আত্মদর্শনের উপায় দেখা যায় যথা "শ্রোতব্যো মন্তব্যেত্যাদি" "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্যসমং শরীরং"—বেদও ইন্দ্রিয়ধারণাদিকে যোগ বলেন। যোগশাস্ত্রও লোকবেদাদিবিরুদ্ধ প্রধানের ও মহত্তত্ত্বের উপদেশ করেন—এজন্য যোগশাস্ত্রকে নিরাশ করা কর্ত্তব্য। জীব সাংখ্য ও যোগ দ্বারা পাশমুক্ত হয়—এ বাক্যান্তর্গত 'সাংখ্য'শব্দের অর্থ "জ্ঞান" ও 'যোগ'শব্দের অর্থ—"ধ্যান"; এতদ্দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র বা যোগশাস্ত্র উপলব্ধ হয় না। শ্রুতির অভিমত অংশে কোন বিরোধ নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব বেদান্তরত্ন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক

সামাজিক সম্মিলন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সভাপতি শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, মহাশয়ের অভিভাষণ)

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্॥
(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ১৷৫৬)

বিষ্ণুস্মৃতিতে আছে,—

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু
মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।
(বিষ্ণুস্মৃতি, ১৬ অধ্যায়)

এখানে দেখা যায়, অনুলোম ও প্রতিলোম দুই প্রকার বিবাহই হইত। পৈঠীনসি বলিয়াছেন,—

"অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ। অপি বা
ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়ীত, শূদ্রায়াং বা ইত্যেকে।"

মনু প্রথমে অসবর্ণ-বিবাহের বিধান করিয়া (৩।১২, ১৩) আবার আপদের সময়ও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা-বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন (মনু ৩-১৪ ১৯)। এই বিরোধের সমাধান কি? কুল্লুকের মতে ব্রাহ্মণের প্রতিলোমক্রমে শূদ্রা-বিবাহ-নিষেধই মনুর অভিপ্রেত——অর্থাৎ অগ্রে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া শূদ্রা-বিবাহ করা দূষণীয়। মাধবাচার্য্যের মতে এই নিষেধ মতভেদ মাত্র, অথবা ভিন্ন যুগের জন্য—"মতভেদেন যুগভেদেন বা ব্যবস্থোপপত্তেঃ" পরাশরভাষ্য।

এই যুগভেদের ব্যাখ্যা যে কল্পিত, তাহা আমরা পরে দেখাইব। ফলতঃ ধর্ম্মসংহিতা ও পুরাণের কালে অনুলোম ও প্রতিলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল; তবে প্রতিলোমবিবাহ নিন্দনীয় ছিল। সবর্ণা হইতে উৎপন্ন পুত্র পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত; কিন্তু অসবর্ণা হইতে অনুলোম-বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা মাতার বর্ণ পাইত ও প্রতিলোম-বিবাহজাত পুত্র "বর্ণসঙ্কর" বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণ হইতে অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান তিন প্রকার, ক্ষত্রিয় হইতে দুই প্রকার ও বৈশ্য হইতে এক প্রকার। ইহাদের মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ,

নিষাদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র নাম হইলেও ইহারা মাতার বর্ণই প্রাপ্ত হইত, "বর্ণসঙ্কর" বলিয়া গণ্য হইত না। প্রতিলোম হইতে জাত সঙ্করবর্ণ তিন প্রকার; যথা, বর্ণসঙ্কর, সঙ্কীর্ণসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কীর্ণসঙ্কর। উত্তম ও অধম বর্ণের মিলনে বর্ণসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর ও বর্ণসঙ্করের মিলনে সঙ্কীর্ণসঙ্কর, এবং বর্ণসঙ্কর ও সঙ্কীর্ণসঙ্করের মিলনে বর্ণসঙ্কীর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে বৈদিককালের চারি বর্ণের মিশ্রণে অসংখ্য বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই সময়ে এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নীত বা অবনীত হইবারও নিয়ম ছিল। নিকৃষ্টবর্ণের কন্যা উৎকৃষ্ট বর্ণের দ্বারা ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষ পরিণীতা হইলে তাহার সন্তান উৎকৃষ্টবর্ণেরই হইত। এইরূপে শূদ্রার সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে সাত পুরুষ লাগিত। আবার উৎকৃষ্ট বর্ণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া নিকৃষ্টবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাহার সন্তানেরা নিকৃষ্টবর্ণ হইত। এইরূপে ব্রাহ্মণের পুত্রের শূদ্র হইতে সাত পুরুষ লাগিত।

আরও দেখা যায়, মুসলমান-অধিকারের পূর্বপর্যন্ত ব্রাহ্মণের শূদ্রা-পুত্র বা অন্য অনুলোম-বিবাহজাত সন্তান "ঔরসপুত্র" মধ্যে গণ্য হইত, এবং সে ধনাধিকারীও হইত। একাদশশতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় লিখিয়াছেন,—

তথা অনুলোমজানাং মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ঔরসেষ্বন্তর্ভাবাৎ তেষামপ্যভাবে ক্ষেত্রজাদীনাং দায়হরত্বং বোদ্ধব্যম্। শূদ্রাপুত্রস্ত্বৌরসোঽপি কৃৎস্নং ভাগং অন্যাভাবেঽপি ন লভতে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ার সহিত অনুলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্তাদি ঔরসপুত্রের অন্তর্গত বলিয়া, তাহাদেরও অভাবে ক্ষেত্রজাদি পুত্র ধনের অধিকারী হইবে—ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু অনুলোমবিবাহ দ্বারা উৎপন্ন শূদ্রাপুত্র যদিও ঔরসপুত্রের মধ্যে গণ্য, তথাপি অন্য পুত্রের অভাবেও সে সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে না।

জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগেও এরূপ কথা আছে,—"যস্তু শূদ্র এবৈকঃ পুত্রো ব্রাহ্মণস্য, স তৃতীয়ভাগাধিকারী।"

অর্থাৎ যদি ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে সে ধনের তৃতীয় ভাগ পাইবে।

জাতিভেদের তৃতীয় অবস্থা। একাদশশতাব্দীর পর হইতে সর্বপ্রকার অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, সমুদ্রযাত্রাদির নিষেধ ও জাতিভেদ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া বিবাহাদিসামাজিকসম্বন্ধশূন্য উপজাতিভেদে পরিণত হইয়াছে।

মুসলমান্-আক্রমের পরবর্ত্তিকালে প্রণীত বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে আমরা প্রথমে দেখি—কলিকালে অসবর্ণবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

বৃহন্নারদীয়ে।

সমুদ্র-যাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

আদিত্যপুরাণে।

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। * * *
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ॥

*　　*　　*　　*

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

নিবন্ধকার হেমাদ্রি ও রঘুনন্দন আধুনিক লোকাচারের অনুরোধে এই নিষেধের কলিকালে প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। আমরা এস্থলে দেখাইব যে, কলির আরম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অসবর্ণ-বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত ছিল। মুসলমান্-আক্রমণের পর হিন্দুদের জাতীয় পতনের সঙ্গে সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মণের শূদ্রের গৃহে বা শূদ্রের পাক করা অন্নভোজন ও সমুদ্র-যাত্রা প্রভৃতি উঠিয়া গিয়াছিল।

পরাশরই কলির ধর্ম্মবক্তা :—'কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ' (পরাশর-সংহিতা ১।২৪)। কলিতে যদি অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে পরাশর-সংহিতায় নিশ্চয়ই ইহার নিষেধ থাকিত। তাহা যখন নাই, অথচ গৃহ্যসূত্র ও মনুসংহিতা প্রভৃতিতে যখন তাহার বিধান আছে, তখন কলিতেও তাহার প্রাপ্তি না হইবে কেন? পরাশরসংহিতায় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে (কলিতে) বিবাহ করিতেন এবং সেই বিবাহজাত পুত্রের ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কার হইত এবং সেরূপ স্থলে পরাশর, তাহার অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন। সুতরাং কলিতে অসবর্ণবিবাহ পরাশরের অভিমতই বলিতে হইবে।

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কারাত্তু ভবেদ্দাসোঽসংস্কারাত্তু নাপিতঃ ॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সুতো ভবতিজাত্তিতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥
বৈশ্যকন্যাসমুদ্ভূতো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
স হ্যার্ধিক ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥

(পরাশরসংহিতা ১১।২১-২৪)

ইহার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণঃ শূদ্রকন্যাং ঊঢ়া তস্যাং যং পুত্রং উৎপাদয়তি, স যদি অমন্ত্রকৈঃ নিষেকাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ ভবতি, তদা দাস ইতি উচ্যতে, সংস্কারাভাবে তু নাপিত ইত্যভিধীয়তে * * দাসাদীনাং ভোজ্যান্নত্বং যাজ্ঞবল্ক্যোঽপ্যাহ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, যদি সে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া নিষেকাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয়, তাহা হইলে দাস বলিয়া উক্ত হয়; অন্যথা নাপিত হয়। ** দাসাদির অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন—ইহা যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন।

কলিতে শূদ্রার সহিত দ্বিজাতির যে অসবর্ণবিবাহ হইত, এই পরাশর-বচন তাহার প্রমাণ। সুতরাং কলির আদিতে অসবর্ণবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও সমুদ্রযাত্রা, বা দাসাদির ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল—বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের এইরূপ বচন শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ, অতএব তাহা অপ্রমাণ। ব্যাসসংহিতায় স্পষ্ট কথিত আছে,—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥"

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের যেখানে বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতির প্রমাণ গ্রাহ্য, এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ স্থলে স্মৃতির প্রমাণই গ্রাহ্য। বিশেষ আদিত্যপুরাণ পুরাণও নহে, উপপুরাণ মাত্র। সুতরাং তাহার সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে উপপুরাণ যে অগ্রাহ্য—তাহাতে আর সন্দেহ কি? এস্থলে মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি ও রঘুনন্দনের মতাবলম্বীরা বলেন যে, "মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধারণভাবে অসবর্ণ-বিবাহের বিধান আছে। আদিত্য-পুরাণে

কলিতে উহা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ নাই। স্মৃতির বিধি, কলি ভিন্ন অন্যযুগের জন্য বুঝিয়া লইতে হইবে।" এরূপ মীমাংসা অসঙ্গত। পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিরা নিজেরাই কলিতে অসবর্ণা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণমতে কলির পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী যুধিষ্ঠিরের কাল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের পিতামহ ব্যাস ও প্রপিতামহ পরাশর কলিরই লোক। এই তপোনিষ্ঠ ঋষিরা নিজেরা কলিধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিলেন, আর অন্যের বেলা কলিতে অসবর্ণ-বিবাহ নিষেধ করিলেন—ইহা কল্পিত ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনও কি একালের লোকদের জন্য ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীজাত পুত্রের দায়াধিকারের ব্যবস্থা না লিখিয়া সত্যযুগের জন্য ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলেন? সুতরাং কলিতে অসবর্ণ বিবাহ তাঁহারা বিধান করেন নাই, ইহা কল্পিত ব্যাখ্যা। ইহা হইতে আরও বুঝা যায়, শ্রুতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ দেখিয়া আধুনিক হিন্দুসমাজ চলে ইহা ভ্রম। আধুনিক হিন্দুসমাজ, প্রচলিত আচারেরই দাস। সে আচার শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া আধুনিক উপপুরাণরচয়িতারা তাহা সমর্থনের জন্য নূতন বচন রচনা করিয়াছেন, এবং নিবন্ধকারেরা সেই সকল লোকাচার সমর্থন করিবার জন্য এবং তাহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নহে—ইহা দেখাইবার জন্য দৃষ্ট শ্রুতিস্মৃতির অর্থসঙ্কোচ ও অদৃষ্টশ্রুতি-কল্পনারূপ কৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে, শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত অসবর্ণবিবাহ কলিতেও শাস্ত্রসম্মত বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি কলিতে নিবর্ত্তিত হইয়াছিল—আদিত্যপুরাণের এই বচন পৌরাণিকের কল্পনা মাত্র। পুরাণকর্ত্তা ইহাও [বু]ঝিতেন যে, ঐ সকল প্রথা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নহে, সেই জন্য তিনি, [স]ময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ' এই বলিয়া ওকালতি করিয়াছেন। [র]ঘুনন্দন বলেন,—'সময়ঃ সংবিৎ সা চ প্রতিজ্ঞা' (উদ্বাহতত্ত্ব ১৪); অর্থাৎ [স]ময় অর্থে সংবিৎ বা প্রতিজ্ঞা। পুরাণকর্ত্তা বলিতেছেন—'বুধেরা' ব্যবস্থা [ক]রিয়া ঐ সকল আচার তুলিয়া দিয়াছেন, এবং সাধুদের 'প্রতিজ্ঞা' বেদবৎ [প্র]মাণ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমান রাজত্বের আরম্ভের [প]র সমাজবিপ্লবের ভয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা একটা সংবিৎ বা resolution পাস [ক]রিয়া কতকগুলি উদার প্রাচীন আচার তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ও সভার সেই resolution সমাজে পাছে গ্রাহ্য না হয়—এই আশঙ্কায় তাহা বেদবৎ প্রমাণ—এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাশীরাম বাচস্পতি রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্বে"র টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন,—

'নন্বেতেষাং কর্ম্মণাং কলৌ নিষেধকো বেদোনাস্তি। তৎ কথমেতানি কলৌ নিষিদ্ধানি। তত্রাহ, সময়শ্চেতি।'

অর্থাৎ, এই সকল কর্ম্মের করিতে নিষেধক বেদবাক্য নাই; তবে এই সকল আচার কিরূপে কলিতে নিষিদ্ধ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—'সময়শ্চ' ইত্যাদি।

আমরা দেখিলাম—অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সমাজ এখন শ্রুতিস্মৃতির অনুসরণ না করিয়া অন্ধভাবে প্রচলিত আধুনিক দেশাচারেরই অনুসরণ করিতেছে এবং সেই দেশাচার শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও সমাজের ঘোর অনিষ্টকর হইলেও তাহার সমর্থন করিতেছে। ইহারই ফলে চতুর্ব্বর্ণ এখন অসংখ্য উপবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে এবং সেই সকল উপবর্ণের মধ্যে বিবাহ, ভোজন প্রভৃতি সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। উপবর্ণের মধ্যে কোন শাস্ত্রই ত বিবাহ বা আহার নিষেধ নাই, তবে তাহা সমাজে কেন বন্ধ হইল? ইহাতেও অধোগতির শেষ নাই। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি করিয়া এ উহাকে একঘরে করিতেছে, ও তাহার সহিত সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ করিতেছে—এইরূপে হিন্দুসমাজের একতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বৈদিককালে এবং স্মৃতি ও সংহিতার যুগে আমরা দেখিয়াছি, বর্ণভেদ কেবল বংশভেদের উপর নহে, বৃত্তিভেদের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকাতে জাতিভেদ তখন সমাজের তত অনিষ্ট করিতে পারে নাই বরং জাতীয় উন্নতির অনেক বিষয়ে কারণ হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও জাতিভেদ বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে এখন আর তাহা বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; একমাত্র বংশভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ আর এখন শূদ্রের কাজ করিলেও ব্রাহ্মণত্ব হারাণ না; বা নীচবর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণের গুণসম্পন্ন হইলেও উৎকৃষ্ট বর্ণের স্থান লাভ করেন না। সুতরাং এখন বর্ণভেদ কেবল গুণকর্ম্মহীন বংশভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সমাজের এরূপ অবস্থা, তাহার উন্নতি হইতে পারে না।

৪। সমাজকে জনতন্ত্রশাসনপ্রণালীর উপযোগী করিতে হইলে, এই সমস্ত কাল্পনিক ভেদ ও বৈষম্য—দূর করিয়া তাহাকে ব্যক্তির গুণ ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এইরূপ অন্তঃসারশূন্য বংশমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর স্থাপিত ইংরেজশাসনের সংস্পর্শে আমাদের সমাজ এখনই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর একমাত্র ব্রাহ্মণই শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী নহেন; জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে পৌরোহিত্য ছাড়িয়া পাচকত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। কায়স্থগণ এখন আর ব্রাহ্মণের "দাস" নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের "প্রভু" হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ সকলের শিক্ষক ছিলেন, নিকৃষ্টজাতিরা ইংরাজিশিক্ষার মাহাত্ম্যে এখন তাঁহার শিক্ষক হইয়াছে। বৈদিককালে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত থাকাতে নানাবর্ণের মিশ্রণে প্রকৃতবংশভেদ, অন্ততঃ উচ্চবর্ণদের মধ্যে, অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছিল। জাতির বৃত্তিভেদও এখন উল্টাইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই কাল্পনিক জাতিভেদকে আশ্রয় করিয়া আর হিন্দুসমাজ কতদিন থাকিতে পারে? ইহা ভিন্ন হিন্দুসমাজের ধ্বংসের আরও দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বিধবাবিবাহ বন্ধ হওয়াতে হিন্দুর জনসংখ্যা দিন দিন কমিতেছে, ইহার উপর হিন্দুসমাজ সংকীর্ণনীতির অনুসরণ করিয়া, উন্নতিশীল হিন্দুদিগকে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য সমাজচ্যুত করাতে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। এই বহিষ্কার-নীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ দিন দিন আত্মহত্যাই করিতেছে। যাঁহারা গুণকর্ম্মান্বিত, তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া, কেবল গুণকর্ম্মহীন জাত্যভিমান লইয়া হিন্দুসমাজ কয়দিন আর এই জীবনসংগ্রামে টিকিতে পারে? সমাজকে ব্যক্তির গুণ ও যোগ্যতার উপর পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত না করিলে আর রক্ষা নাই।

৫। প্যাটেল্-বিল্।

মাননীয় প্যাটেল্ মহোদয় অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণতার অত্যাচার হইতে উন্নতিশীল হিন্দুদিগকে রক্ষা করিয়া, হিন্দু-সমাজের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থান দিয়া, ইহাকে উন্নত ও নবযুগের উপযুক্ত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক রূপ আপত্তি করিতেছেন। আমরা সেগুলি বিচার করিব।

(১) রক্ষণশীল হিন্দুরা ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় আপত্তি করিতেছেন। আমরা দেখিয়াছি, অসবর্ণবিবাহ হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। তথাপি যদি কোন হিন্দুর ইহা উপ-পুরাণবিরুদ্ধ হওয়াতে অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাঁহার স্বাধীন ধর্ম্মমতে হস্তক্ষেপ করা এ আইনের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। কেবল যাঁহারা অসবর্ণবিবাহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু বর্ত্তমান আইনের দোষে হিন্দুনাম পরিত্যাগ না করিলে—অসবর্ণার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহারা যাহাতে 'হিন্দু'নাম রক্ষা করিয়া অসবর্ণবিবাহ করিতে পারেন, তাহার উপায় করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। সুতরাং রক্ষণশীল হিন্দুদের ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহাদের স্বাধীন ধর্ম্মাচরণে এই আইন্ কিছুমাত্র বাধা দিবে না। কিন্তু এই আইন পাশ না হইলে, উন্নতিশীল হিন্দুদিগের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেবল উন্নতিশীল হিন্দু কেন, বৈষ্ণবসম্প্রদায়, শৈব ও অন্যান্য সম্প্রদায়, যাঁহাদের শাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের স্পষ্ট বিধান আছে, যাঁহাদের সমাজে অসবর্ণাবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে—তাঁহাদেরও অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া অসবর্ণবিবাহ করিলে, বর্ত্তমান আইন্ অনুসারে সেই বিবাহজাত সন্তান "বৈধ" পুত্র বলিয়া গণ্য বা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। এই আইন্ কেবল সেই আইনের ত্রুটি সংশোধন করিয়া অনেক হিন্দুর আপন বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মাচরণের বাধা দূর করিবে মাত্র।

(২) অনেকে আইনের দ্বারা সমাজসংস্কার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু সে আপত্তি বাধ্যতামূলক আইনের বেলা খাটিতে পারে, অনুমোদক আইনের বেলা খাটে না। প্রস্তাবিত অসবর্ণবিবাহ আইন্, বিধবাবিবাহ আইনের ন্যায় অনুমোদক আইন্ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বাধা দূর হইবে। সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতার প্রসারের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের এ আইনের বিরোধী হওয়া অসঙ্গত। পারিবারিক ও সামাজিক-জীবনের উপরেই রাজনৈতিক-জীবন প্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা-লাভের যাঁহারা বিরোধী, রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্য কোলাহল করা কেবল তাঁহাদের ছলনা মাত্র।

(৩) কেহ কেহ সৌজনিকের (Eugenics) দোহাই দিয়া অসবর্ণ-বিবাহের প্রতিবাদ করিতেছেন। এ আপত্তিটা বৈদিককালে করিলে শোভা

পাইত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অসাবধানতায় আমাদের দেহে এখন কৃষ্ণ-জাতির ছাপ এমন লাগিয়া গিয়াছে যে, তাহা অসবর্ণ-বিবাহ কেন, অসগোত্র ও অসপিণ্ড-বিবাহ পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেও আর মিলাইয়া যাইবে না। বরং বিপরীত ব্যবস্থা করিলে, তাহা মিলাইবার কিছু আশা আছে। সৌজনিকের নিয়ম অনুসারেই অসবর্ণবিবাহ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিবাহও এখন আবশ্যক হইয়াছে।

৬। অদ্বৈতবাদী, বিশ্বপ্রীতির প্রচারক হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত আধুনিক হিন্দু-সমাজের অসামঞ্জস্য ও তাহা দূরীকরণের উপায়।

মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্ম্মের মূল, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম যাহার শাখা, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রে যাহার সমন্বয়, তাহা কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ই সেই ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও গৌরব।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—(ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৯।১৪।১)

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—(ঈশোপনিষদ্। ১)

যে ধর্ম্মের উপদেশ, কেবল মনুষ্যে নয়, সর্ব্বজীবে দয়া ও প্রীতি যে ধর্ম্মের বিধান, স্বদেশপ্রীতি নহে, "জগদ্ধিত"—যাহার নীতি, সে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, যাহার বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে বহিস্কৃত করিতে হইবে। এ ধর্ম্মের উদারতা ও ব্যাপকতা এত অধিক যে, ইহার মধ্যে কেবল ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ নহে, বৌদ্ধ, পার্শি, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান্ হইতে জড়োপাসক ও ভূতপূজক পর্য্যন্ত সকলেই স্থান পাইতে পারে। উপনিষদেই যে কেবল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের সহিত অনার্য্যধর্ম্মসমূহের সমন্বয়ের জন্যই নবীন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। কি বৈদিক কি পৌরাণিক কালে হিন্দুধর্ম্মের অধিকার-ভেদে উপাসনা-ভেদের ব্যবস্থা এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের জন্যই বিহিত হইয়াছে। ইহাতে পিশাচোপাসক অসভ্যজাতি হইতে অদ্বয়চৈতন্যবাদী পর্য্যন্ত সকলেরই নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। জগতে এমন কোন মত নাই বা ধর্ম্মের আদর্শ নাই, যাহার ইহার মধ্যে উপযুক্ত স্থান না হইতে পারে। সকল ধর্ম্মেরই একটা না একটা creed আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এ পর্য্যন্ত কেহ একটা creed বা catechesm বা definition তৈয়ার করিতে পারিলেন না। ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে;

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব। creed আছে বলিয়াই অন্য সকল ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। creed নাই বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, অনন্ত ও সনাতন। সকল ধর্ম্মই কোন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দেবতাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাতে বিদ্বেষ-পোষণ করেন। হিন্দুধর্ম্মের মূল শ্রুতির উপদেশ,—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৩)

কেননা—

যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।

(ঐ, ৭।২৪)

সেই জন্য হিন্দুর দেবতা গীতায় বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

(গীতা, ৪।১১)

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(গীতা ৯।২৩)

াণেও হিন্দুর দেবতা 'সর্ব্বভূতসংস্থিতা—' (চণ্ডী ৫।১৬-৮০)।

বৈদিককালে অনার্য্যজাতিসকল ও আর্য্যসমাজচ্যুত লোকেরা ব্রাত্যস্তোমের অনুষ্ঠান করিয়া আর্য্য-সমাজভুক্ত হইতেন, (সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়।) পরবর্ত্তী পৌরাণিক-কালেও ভারতবর্ষীয় অনার্য্য বর্ব্বর-জাতিসকল, ও শক, যবন, কাম্বোজ, হূণ, প্রভৃতি বিদেশীয়জাতি সকল হিন্দু সমাজ-ভুক্ত হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। এখনকার অধিকাংশ রাজপুত ও ক্ষত্রিয়-রাজগণ—যাঁহারা সূর্য্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন—তাঁহারা এইরূপে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত বৈদেশিক জাতিমাত্র। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বেদ-স্বরূপ ভাগবত পুরাণ, যবন ও অনার্য্যজাতিদিগের বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা বিধান করিয়াছেন,—

কিরাত-হূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরকংকা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ইহা সকলেই জানেন—শ্রীচৈতন্য হরিদাস-নামক যবনকে দীক্ষিত করিয়া

তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। শৈবদিগের শ্রুতি তন্ত্রশাস্ত্রেও এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাব দৃষ্ট হয়। মহা-নির্ব্বাণ-তন্ত্রে (১৪।১৮৭) আছে,—

চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া।
কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্॥

স্ত্রীলোক ও যবনকে পর্য্যন্ত কৌল করিতে হইবে, না করিলে নরক হয়। অন্যত্র বলা হইয়াছে—

যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্‌ভাবমাপ্নুয়াৎ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জনাঃ পৃথক্॥
বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে
তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

(মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৪।১৮০-১৮০)

যেমন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অস্পৃশ্য-জাতির সংস্পর্শেও অপবিত্র হয় না, সেইরূপ শৈবদিগের মতেও ব্রহ্মে নিবেদিত অন্ন নীচজাতির স্পর্শে অশুদ্ধ হয় না।

যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধিং কুরুতে মূঢ়ঃ স মহাপাতকী ভবেৎ॥

(মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে, ৩।৯১-৯২)

এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা ভারতবর্ষে একদিন সকল ধর্ম্মের ও জাতির সমন্বয় হইয়াছিল—এবং এখনও এই আন্তর্জাতিক সম্মিলনের যুগে, এই জাতিসঙ্ঘস্থাপনের কালে, এই ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে। উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে এই বিশাল ধর্ম্ম এখন এক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা সনাতনধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন উদার অসাম্প্রদায়িক আচার বা মত-প্রচারে বাধা দিতেছেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুনাম তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মত ও আচার হইতে অনেক বিশাল। হিন্দুধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ করিতে গিয়া, তাঁহারা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিতেছেন। যদি নবযুগের উপযোগী করিয়া আমাদের সমাজকে গড়িতে হয়, তবে তাহা এই সনাতনধর্ম্মের উদ্বোধনের দ্বারাই হইবে। ধর্ম্মসংস্কারবিরহিত সমাজসংস্কার বা কেবল রাজনৈতিক উপায় দ্বারা তাহা হইবে না। অন্য দেশে কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা বা আইন্ পাশ করিয়া সমাজ-সংস্কার হইতে

পারে, কিন্তু এদেশে সমাজ ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ এরূপ অচ্ছেদ্য যে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নহে। কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কোন সংস্কার করিতে হইলে, তাহা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া করিতে হইবে। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য সেই বিশ্বজনীন উদার সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্বোধন আবশ্যক—এবং সেই বিশাল ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে অজ্ঞান, কুসংস্কার ও ভেদমূলক সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্মকে বিলীন করিতে হইবে। এই বিরাট্ ধর্ম্মের আদর্শ পুনর্ব্বার উদ্দীপিত করিতে পারিলে, সেই অগ্নিতে সমস্ত সামাজিক বৈষম্য, প্রাণহীন লোকাচারের কঙ্কাল গলিয়া এক অভিনব ধর্ম্মপ্রাণ মহা-সমাজে পরিণত হইবে। সহস্র সমাজসংস্কারকের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যাহা না হইয়াছে, একজন ধর্ম্মবীরের ক্ষণিক-সংস্পর্শে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া নিমিষের মধ্যে সেই সকল মহাপরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। বর্দ্ধমান মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য এই সকল ধর্ম্মসংস্থাপকের দ্বারা যে সকল মহাসমাজসংস্কার হইয়াছিল, তাহা যুক্তির দ্বারা বা রাজনীতির দ্বারা কখনই হইতে পারিত না। সেইজন্য সমাজসংস্কারের ভিত্তি সনাতনধর্ম্মের উপর স্থাপন করিতে হইবে—এবং তাহা হইলে আমরা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র জগতের আন্তর্জ্জাতিক সমাজসংস্কার-সমস্যারও সমাধান করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সভ্যতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় করিতে পারিব।

(সমাপ্ত)

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

১। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম হইতেছে—শরীরকে কর্ম্মক্ষম রাখা ও সাধারণ রকম রোগ-আক্রমণের হাত এড়াইয়া চলা।

২। স্বাস্থ্যের অনুকূল ও নিয়মমত চলার অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে কর্ম্মক্ষম রাখিবে ও তাহা পালন করিবে; যাহাতে ক্লান্তিবোধ হয় তাহা করিবে না, ঠাণ্ডা লাগাইবে না, অপরিষ্কার দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মানিয়া চলিলে, রোগের আক্রমণ এড়াইবার ও যাহাতে মৃত্যু ঘটে—এমন সমস্ত উপসর্গকে বাধা দিবার ক্ষমতা বাড়ে।

৩। জ্বরভাবসূচক প্রবল সর্দ্দির লক্ষণও যা, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম লক্ষণগুলিও সচরাচর তাই। প্রথম ঝোঁকে রোগ দ্রুত বাড়িতে থাকে; প্রথম অবস্থাগুলিতে ইহা অত্যন্ত সংক্রামক; মুখ ও নাসিকা হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা দ্বারা ইহা ছড়াইয়া পড়ে; এবং ইহাতে যে সমস্ত উপসর্গ আসে, প্রধানতঃ তাহাতেই মৃত্যু ঘটে। যে কোন ব্যক্তি এই রোগে ভোগে, তাহার রোগ যত মৃদু আকারেরই হউক্ না কেন, তাহা হইতে অপরের বিপদ্ ঘটে।

৪। সকল সময় রোগের আক্রমণ এড়ান সম্ভব নহে; কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে বিপদের সম্ভাবনা অনেকটা কমিতে পারে:—

(ক) স্বাস্থ্যের অনুকূল ভাবে থাকা;

(খ) যে সমস্ত ঘরে ভাল বাতাস খেলে তাহাতে কাজ করা ও ঘুমান;

(গ) লোকের ভিড়ের মধ্যে না যাওয়া এবং বদ্ধ ও ভাল বাতাস খেলে না এমন সমস্ত ঘরে না থাকা;

(ঘ) উপযুক্ত কাপড়চোপড় পরা;

(ঙ) কুল্লি করিয়া গলা ধুইয়া ফেলা ও নাক ধুইয়া ফেলা;*

(চ) ইনফ্লুয়েঞ্জারোগাক্রান্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিবার সময় বা তাহার কাছে হাজির থাকার সময় একটি মুখোস † ও চসমা পরা।

৫। রোগের আক্রমণ-নিবারণের মিথ্যা আশায় ঔষধ কিনিয়া অনর্থক অর্থ নষ্ট করিও না।

৬। বদ্ধ দালানে, কুঠারীতে, থিয়েটারে, এবং এই রকম সমস্ত জায়গায় লোকের ভিড়ে যাইও না। ফাঁকা জায়গা অপেক্ষা বদ্ধজায়গার আক্রমণের আশঙ্কা বেশী।

৭। যাহারা সামান্যভাবে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারাও যেন কোন কারণে, রোগ আরম্ভ হওয়ার পর অন্ততঃ দশ দিন পর্য্যন্ত; যেখানে লোক জমায়েত হয়—সেখানে তাহাদের সঙ্গে না মিশে।

* গলা ধুইবার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে:—

সাধারণ নুন মিশানো জল (এক পাঁইট গরম জলে এক চা-চামচ-পূর্ণ নুন) ইহাতে কয়েক দানা পোটাসিয়ম্ পারম্যাংগানেট্ যোগ করা হয়—যতটা দিলে ঐ জল লাল হইয়া উঠে। ইচ্ছা হইলে, পোটাসিয়ম্ পারম্যাংগানেটের বদলে একটি ছোট থাইমলের দানা দেওয়া যাইতে পারে।

† ঐ মুখোস জাপানী কাগজে (২ পুরু), বা গজ কাপড়ে (৬ পুরু) বা মলিন কাপড়ে (৩ পুরু) প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এবং ইহাতে যেন মুখ ও নাক ঢাকা যায়। চোখ রক্ষণ করিবার জন্য, ঢুলি চসমা ব্যবহার করা ভাল।

৮। আক্রান্ত ব্যক্তিগণ—

(ক) বাড়ী যাইয়া শুইবে, এবং গরমে থাকিবে;

(খ) ডাক্তার ডাকিবে;

(গ) সম্ভব হইলে, পৃথক্ শোবার ঘরে থাকিবে, অথবা ঘরের অবশিষ্ট অংশ হইতে আলাদা করিয়া ঘেরা বিছানায় শুইবে;

(ঘ) কাশিবার বা হাঁচিবার সময় সুমুখে একখানি রুমাল ধরিবে; ঐ রুমাল গরম জলে ফুটাইয়া লইতে হইবে, অথবা কাগজের হইলে পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে;

(ঙ) গলা ধুইবার ও নাক ধুইবার যে ঔষধের কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্যবহার করিবে;

(চ) সারিয়া উঠিবার সময় খুব সাবধানে থাকিবে, যেন পাল্‌টিয়া পড়িতে না হয় বা উপসর্গ না জুটে;

(ছ) গায়ের তাপ স্বাভাবিক অবস্থার মত হইবার পর অন্ততঃ একসপ্তাহ বাদ কোন সভায় ও আমোদ-প্রমোদের জায়গায় যাইবে না।

[বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনার কর্ত্তৃক প্রচারিত।]

লঙ্কা-বিজয়।

তৃতীয়-সর্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"প্রভো হে, দারুণ তব বাক্য-প্রহরণে
বিদারিত মর্ম্মস্থান মুহুর্ম্মুহু মোর
হইতেছে, মৃত্যু যেন আস্য প্রকাশিয়া
গ্রাসিছে ব্রহ্মাণ্ড ঘোর প্রচণ্ড তাণ্ডবে।

যে ব্যাঘ্রের ভয়ে ব্যগ্র সমগ্র সংসার
খর-শর-জালে যার হলাহলময়
কোলাহলময় সিন্ধু, আছে বন্দীরূপে
বন্ধন-শৃঙ্খল পরি, ধরেছে উরসে

বিপুল পাষাণস্তূপ, কৃতাঞ্জলিপুটে
লুঠে যেই সকাতরে পদ-তলে তব,
ভার্গবের গর্ব্বচূর্ণ যাঁর বাহু-বলে,
বিরাধ দূষণ খর সুগ্রীব-অগ্রজ
শায়িত শায়ক সনে অন্তিম শয়নে
যাঁহার ; প্রখর শরে হত রক্ষঃকুল
সে মহাপুরুষ হেন কাপুরুষসম
হারায়ে পুরুষকার, কেন অকস্মাৎ
হানিলা পুরুষ-শিরে, পরুষ বচনে,
এ প্রপঞ্চ-প্রহেলিকা নারিনু বুঝিতে।"

অতঃপর মহাক্ষোভে কহে হনুমান্
কেন বা আসিনু আমি ঋষ্যমুক ছাড়ি
অবিমৃশ্য ; এ বীভৎস দৃশ্য দেখিবারে,
বিলের মাঝারে মোরে কেননা বধিল
দুরন্ত অসুর কুল, কেনবা পশিনু
সম্পাতির মুখে শুনি এ সম্পাতবাণী
মৈথিলীর, লঙ্কাধামে সাগর লঙ্ঘিয়া,
কেননা বধিল মোরে সুরসা সিংহীকা
সিংহীসম, হিংসাপরা সংহারে মগন,
এ লঙ্কার রক্ষয়িত্রী কাল স্বরূপিণী
কেননা গ্রাসিল মোরে ভীমা ভয়ঙ্করী,
বিশাল সরসীনীরে কেননা বধিল
নিদারুণ শম্ভূবলে মোরে কুম্ভীরণী !
কেন বা বাঁচিনু পুনঃ কিশোরবয়সে
কুলিশ-প্রহারে মরি বাসবের করে।
হায় অকরুণ বিধি ! কি পাপে এ দাস
অনুতপ্ত, অভিশপ্ত কা'র অভিশাপে !
রহিলেন মা আবার অশোক-কাননে
একাকিনী, আমি যাব স্বদেশে আমার।

না না না ! প্রভো হে ! তুমি আদেশ দাসেরে
পশি লঙ্কাপুরে আমি লক্ষ্মণেরে লয়ে
একাকী ; আসিবে মাতা মৈথিলী, সরমা
শ্রীমানের সাথে, শেষে ডুবাইব লঙ্কা
সিন্ধুনীরে, বিনারণে বাহুবলে শুধু,
দেখিব যে কোন্ যোধ রোধে মোর গতি।

এতেক কহিলা যদি রিপুনিসূদন
পবননন্দন, কোটিবীণা-ধ্বনি সম
কোটি কণ্ঠে জয়ধ্বনি ধ্বনিল গগন—
কাঁপিল কর্ব্বুরকুল সে ভীষণ-নাদে।

শুনিয়া হনুর বাণী সুশীল সুমতি
লক্ষ্মণ, কহিলা—"মিত্র, চরিত্র তোমার
জানি দেবোপম ; কিন্তু মমাগ্রজ একে
বৈদেহী-বিরহ-বাণে বিষম ব্যথিত।
একাধারে কি দুঃসহ—কি দুর্ব্বহ হায়
সহিছেন কষ্ট জ্যেষ্ঠ ভেবে দেখ মনে।
অবিরাম নিগৃহীত গ্রহদোষে, সদা
বিহ্বল, বিভ্রান্ত তিনি, সবে সম্বোধিয়া
কহিছেন বিভীষণে ফিরে যেতে ভাই
মোহবশে, রাজ্যচ্যুত নির্ব্বাসিত একে,
পিতার নিধনবার্ত্তা, অপহৃতা জায়া—
একাধারে এত জ্বালা কে পারে সহিতে !

এক শক্তিশেলে বিঁধে রক্ষোরাজ মোরে
অগ্রজ আমার বিদ্ধ শত শক্তিশেলে।
সকলি সম্ভবে ভবে হে সখে তোমাতে
জানি মোরা ; এই রণে মূলাধার তুমি
আমাদের, তা' না হলে সিন্ধুপারে আসি
সম্বাদিত কেবা সীতা সন্ধান করিয়া !
কে চিনাত দুরাচার রক্ষঃকুলাধম

রাক্ষসের স্বর্ণময়ী লঙ্কাধাম, এই।
অযুত অযুত এই যোধ-সুরক্ষিত
দেবের অগম্যপুরে প্রবেশিত কেবা?
তুমি না দেখালে পথ কে জানিত সখে
রাবণের হৃতা সীতা অশোককাননে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

দান। মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহোদয়, মেদিনীপুরকলেজভবন-নির্ম্মাণার্থে ৫ সহস্র মুদ্রা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধন্যবাদ।

বৃত্তিলাভ। শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর রায় আমেরিকার হাভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হেমিংওয়ে' বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ যাবৎ কোনও বৈদেশিকছাত্র এই বৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

নারী-জুরি। সংবাদপত্রে প্রকাশ—অতঃপর বিলাতের নারীগণ—'জুরি' নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। তাঁহারা জুরিরূপে বিচারালয়ে বসিয়া যথাবিধি কার্য্য করিবার অধিকার পাইলেন। "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।"

সভ্যপদ-লাভ। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম্ এ (বারাকপুর উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) মহাশয় গ্রেট্‌বৃটন ও আয়র্লণ্ডের "রয়াল এসিয়েটিক্ সোসাইটী"র সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুখের কথা।

শোক-সংবাদ। বর্ত্তমানজগতের অন্যতম প্রধান গণিতবেত্তা মাদ্রাজের অধ্যাপক 'রামাণুজম্' সম্প্রতি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে 'রামাণুজম্' যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? দেশের দুর্ভাগ্যে অধ্যাপক রামাণুজম্ ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পরলোকে প্রয়াণ করিলেন।

'বহুরূপ' তারা-পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ।

এপ্রিল ১৯২০ খৃঃ অঃ।

বহুরূপ তারার অবস্থান।	নাম।				পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।	
০৪৫৫১৪	শশ	রাশির	R.	তারা	০৫০৮	৭·২	
০৫৪৯২০	কালপুরুষ	,,	U.	,,	০৫০৯	১২·৫	
০৬০৫৪৭	ব্রহ্ম	,,	SS	,,	০৭১৮	১১·৫	হইতে ছোট
০৭০১২২a	মিথুন	,,	R.	,,	০৭১০	১১·৫	,, ,,
০৭১০৪৪	অর্ণবযান	,,	L^2.	,,	১১০৮	৪·৫	
০৭২৭০৮	শুনী	,,	S.	,,	১৩১১	১১·৫	
০৮১১১২	কর্কট	,,	R.	,,	১৩১১	৬·৫	
০৮৪৮০৩	ক্ষুদ্রসর্প	,,	S.	,,	১৩১১	৯·১	
০৮৫০০৮	,,	,,	T.	,,	২২১০	১১·০	হইতে ছোট।
০৯৪২১১	সিংহ	,,	R.	,,	১৪১১	৬·৮	
১০৩৭৬৯	সপ্তর্ষি	,,	R.	,,	০৭০৮	৮·৭	
১২৩১৬০	,,	,,	T	,,	০২১১	১১·০	হইতে ছোট
১২৩৪৫৯	,,	,,	RS.	,,	০২১১	৮·৮	
,,	,,	,,	,,	,,	২৮১১	৯·৩	
১২৩৯৬১	,,	,,	S.	,,	০২১১	৮·৬	
,,	,,	,,	,,	,,	২০১১	৮·৫	
১৩২৪২২	ক্ষুদ্রসর্প	,,	R	,,	২১১২	৯·৭	
১৫১৮২২	তুলা	,,	S	,,	১০১১	৮·৫	
১৫১৭৩১	উত্তর কিরীট	,,	S.	,,	১৪১১	১০·১	
১৫৪৪২৮	,, ,,	,,	R	,,	০৪১০	৬·৪	
১৫৪৬১৫	সর্প	,,	R.	,,	১২১১	৬·৬	
১৬২১১৯	হরকুলেশ	,,	U.	,,	১০১১	১১·০	হইতে ছোট।
১৬৩১৩৭	,,	,,	W.	,,	১০১১	১১·০	,, ,,
১৬৩২৬৬	তক্ষক	,,	R.	,,	২১১১	৭·৫	
১৭০২১৫	সর্পধারী	,,	R.	,,	১৭১৫	১০·৮	
১৭৫৫১৯	হরকুলেশ	,,	RY.	,,	১০১২	৮·৫	
,,	,,	,,	,,	,,	২০১১	৮·৬	
১৮০৫৩১	,,	,,	T	,,	১০১২	১১·০	
১৮৪২০৫	গরুড়	,,	R.	,,	১৭১৫	৫·০	
১৮৫৩০০	,,	,,	নূতন*	,,	১৭১৫	৮·১	
১৯৩৪৪৯	বক	,,	R	,,	১৭১৬	১০·৬	
১৯৪০৪৮	,,	,,	RT.	,,	১৭১৬	১০·৯	
১৯৪৬৩২	,,	,,	Chi	,,	১৭১৬	১০·৮	
২০০৯৩৮	,,	,,	RS.	,,	১৭১৬	৮·৬	
২১০৮৬৮	শেফালী	,,	T.	,,	২৭১৪	৭·৪	
২১৩৮৪৩	বক	,,	SS.	,,	১৭১৬	১১·৫	হইতে ছোট।

২৭ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ। ২য় সংখ্যা

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

ধর্ম্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্।

সহকারি-সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইং—১১ই জুন ১৯২০।

বাং—২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

শকাব্দাঃ ১৮৪২।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ।	১৩২৭ সাল।
২য় সংখ্যা।		১৮৪২ শকাব্দ।

শ্রীরামানুজাচার্য্য।

দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ পাষণ্ডপ্রচুরে জনে।
রামানুজেতি ভবিতা বিষ্ণুধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ॥

মাদ্রাজের সাড়ে তিন যোজন অর্থাৎ চৌদ্দ ক্রোশ নৈঋতকোণে পেরুম্বদুর নামে একটি গ্রাম আছে। সংস্কৃতসাহিত্যে ঐ গ্রামকে "মহাভূতপুরী" বলা হয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আসুরি কেশবাচার্য্য নামক জনৈক ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে বাস করিতেন। আসুরি কেশবাচার্য্য অত্যন্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী কান্তিমতীও স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কেশবাচার্য্যের যজ্ঞীয় কর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখিয়া, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "সর্ব্বক্রতু" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ সন্তানাদি না হওয়ায় কেশবাচার্য্য যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। শাস্ত্রে আছে;—

"যজ্ঞ এব পরো ধর্ম্মো ভগবৎপ্রীতিকারকঃ।
অতোঽকামধুক্ যজ্ঞস্তস্মাৎ যজ্ঞঃ পরাগতিঃ॥"

যজ্ঞানুষ্ঠানের এক বর্ষ পরে ভাগ্যবতী কান্তিমতী সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন এক সুকুমার পুত্র প্রসব করেন। বলা বাহুল্য, এই সুকুমার শিশুই কলির

জাদিতে প্রকটিত অবতার শ্রীরামানুজাচার্য্য। দিন দিন পৌর্ণমাসী শশিকলার ন্যায় বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে শিশু রামানুজাচার্য্য বাল্যে উপনীত হইলেন। রামানুজের অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানে আসুরি কেশবাচার্য্য কোন প্রকার ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন না। বিদ্যারম্ভ হইতেই রামানুজ আশ্চর্য্য ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। অধ্যাপকগণ রামানুজের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কেবল যে গ্রন্থ অধ্যয়নেই রামানুজের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহা নহে, ধর্ম্মানুশীলন ও ধার্ম্মিকদিগের সহবাসও তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের প্রধান সহচর হইল। ঐ সময়ে কাঞ্চীপূর্ণ-নামে একজন পরমবৈষ্ণব, ঐ অঞ্চলের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রামানুজ একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে পথিমধ্যে পাইয়া বলিলেন—"আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আপনার সেবা করি।" কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন—"সে কি ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ, আর আমি অতিনীচবংশীয়; আমি তোমার সেবা করিব, না, তুমি আমার সেবা করিবে?"

রামানুজের বয়স তখন ষোড়শ বৎসর মাত্র। ঐ বয়সে তাঁহার এবম্বিধ ধর্ম্মভাব ও সংসার-বৈরাগ্য-দর্শনে কেশবাচার্য্য তাঁহাকে অবিলম্বে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শীঘ্রই এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালার সহিত রামানুজের বিবাহ হইল। তাঁহার মাতা পিতা ও আত্মীয়স্বজনের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে এই ধার্ম্মিক-পরিবারের আনন্দের শুভ্রাকাশ অচিরাৎ শোকের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। আসুরি কেশবাচার্য্য, বালক রামানুজকে সংসার-পারাবারে ভাসাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন। পিতৃশোকে মুহ্যমান রামানুজ, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি-সমাপনান্তে কাঞ্চীপুরী-নামক-স্থানে গিয়া "যাদবপ্রকাশ"-নামক জনৈক অদ্বৈতবাদী অধ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। দেশবিখ্যাত পণ্ডিতের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, তদীয় মুখ-বিনিঃসৃত জ্ঞানপূর্ণ বাক্যাবলী শুনিতে পাইবেন—এই আশায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সংসারে মানুষ যাহা চায়, তাহা ত পায় না! যাদবপ্রকাশ ঈশ্বরের সাকারমূর্ত্তি আদৌ মানিতেন না। একদিন এক ছাত্রকে "ছান্দোগ্য উপনিষৎ" পড়াইতে পড়াইতে যাদবপ্রকাশ উক্ত উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠখণ্ডে সপ্তমমন্ত্রে যে "তস্য যথাকপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" আছে, তন্মধ্যে "কপ্যাসং"

পদটীর অর্থ করিলেন "বানরের অপান-দেশ।" রামানুজ তখন গুরুর অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতেছিলেন। ভগবানের নয়নের সহিত বানরের অপান-দেশের তুলনা করিতে শুনিয়া, রামানুজ বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় দুই ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়া গুরুর চরণ অভিষিক্ত করিল। রামানুজ গুরুর আজ্ঞা লইয়া বলিলেন,—"দেব! "কপ্যাসং" শব্দের অর্থ "বানরের অপান-দেশ" নহে, উহার অর্থ "সূর্য্যবিকশিতং।" যাদবপ্রকাশ, শিষ্যের দ্বৈতবাদ-প্রীতি-দর্শনে একটু বিরক্ত হইলেন।

আর একদিন তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া যাদবপ্রকাশ কহিলেন, "ব্রহ্ম সত্যব্যাবৃত্ত, অজ্ঞানব্যাবৃত্ত ও পরিচ্ছেদ-ব্যাবৃত্ত" বলিলেন। তখন রামানুজ আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।" যাদবপ্রকাশ, শিষ্যের এতাদৃশ ধৃষ্টতা দেখিয়া তৎপ্রতি বাহ্যিক বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলেন। মুখে প্রশংসা করিলে কি হয়? সকলেই সংসারে "তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" হইতে পারেন না। যাদবপ্রকাশ সে জ্ঞানেই যেন রামানুজের প্রাণসংহার করিবার জন্য স্থিরসংকল্প হইলেন। গোবিন্দ-নামে রামানুজের এক মাসতুতো ভ্রাতা সর্ব্বদা সহোদরভ্রাতার ন্যায় রামানুজের অনুসরণ করিত। গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। যাদবপ্রকাশ শিষ্যগণের সহিত রামানুজকে ছলে বা কৌশলে তীর্থভ্রমণে লইয়া সংহার করিবেন, ইহা স্থির করিলেন। তদনুসারে সকলে যাদবপ্রকাশ আর্য্যাবর্ত্তের দিকে প্রস্থান করিলেন। একদিন এক গভীর অরণ্যের মধ্যে গোবিন্দ রামানুজকে একাকী পাইয়া, গুরুদেবের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিল। রামানুজ সেই দূর দেশে গভীর অটবীর মধ্যে হিংস্র-জন্তু-সমাকুল নির্জ্জন বনানীতে বসিয়া শান্ত মনে আপন অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে বহু অনুসন্ধানেও রামানুজের কোন সন্ধান না পাওয়ায় যাদব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী মনে করিলেন—রামানুজকে নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রে উদরসাৎ করিয়াছে। গুরু কৃত্রিম ক্রন্দন করিলেন। গোবিন্দ গুরুদেবের কৃত্রিম অশ্রুতে দু'বিন্দু অশ্রু মিশাইয়া একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিল; কারণ ঐরূপ না করিলে মন্ত্রণাপ্রকাশক বলিয়া গুরুদেবের যে তাহারই উপর সন্দেহ হইবে। তখনও দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হন নাই,

রামানুজ সেই জন-প্রাণিহীন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক ব্যাধদম্পতীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ব্যাধদম্পতি তাঁহাকে বনের বহির্ভাগে লইয়া মহাযত্নে ভূমিশয্যায় বিশ্রাম করাইলেন। প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাধপত্নী রামানুজকে একটু জল আনিতে অনুরোধ করিলেন। রামানুজ অনতিদূরে একটি সুন্দর সরোবর দেখিয়া তাহা হইতে এক গণ্ডূষ জল আনিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যাধপত্নীর পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। অতঃপর যখন রামানুজ দ্বিতীয়বার জল লইয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, সেখানে ব্যাধ কিংবা ব্যাধপত্নী নাই। রামানুজ ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন—সম্মুখে এক সুদর্শন নগর। নগরের প্রাসাদশীর্ষ ঊর্দ্ধে নীলাম্বরকে চুম্বন করিতেছে। কৌতূহলপরবশ হইয়া জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—এই নগর তাঁহারই বাসভূমি। তখন মহামায়ার মহামায়া বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। তিনি যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া বলিলেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

মাতা কান্তিমতী বহুদিনের পর হৃতপূর্ব্ব স্নেহধনের ন্যায় প্রিয়দর্শন তনয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন। রামানুজ ঘরে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহার তিনমাস পরে যাদবপ্রকাশ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কাঞ্চীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গোবিন্দের মাতা তাঁহার পুত্রটীকে শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে না দেখিয়া, যাদবপ্রকাশের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে "গোবিন্দ গঙ্গায় অবগাহন-কালে একটি বাণলিঙ্গ পাইয়া মঙ্গলগাঁও নামক স্থানে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতঃ ইষ্টদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।" পুত্রের এবম্বিধ সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া গোবিন্দ-জননী পরম আনন্দিতা হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কান্তিমতী রামানুজের স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। রামানুজের পত্নী তঞ্জমাম্বা তখন সংসারের কর্ত্রীপদে অধিষ্ঠাতা হইলেন। শ্রীমহাপূর্ণ নামক একজন ভক্তের নিকট রামানুজ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। একদিন রামানুজপত্নী ও শ্রীমহাপূর্ণপত্নী উভয়ে জল আনিতে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমহাপূর্ণের পত্নীর কলসী হইতে একবিন্দু জল রামানুজ-পত্নীর অঙ্গে পড়িল। ইহাতে রামানুজ-পত্নী ক্রোধান্ধা হইয়া তাঁহার

ভর্ত্তৃগুরুপত্নীকে অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি দিলেন। শ্রীমহাপূর্ণপত্নী এইকথা স্বীয় স্বামীর নিকট প্রকাশ করিলে, শ্রীমহাপূর্ণ সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর একদিন এক জীর্ণশীর্ণ বুভুক্ষু অতিথি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দু'টি অন্নের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। রামানুজ-পত্নী সেই ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে কর্কশ কথায় তাড়াইয়া দিলেন। এই ঘটনায় রামানুজ স্বীয় স্ত্রীর প্রতি এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, তিনি "পাপানামাকরাঃ স্ত্রিয়ঃ" স্থির করিয়া কৌশলে স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। অনেকে রামানুজ-চরিত্রের এইটি প্রধান দোষ বলিয়া মনে করেন যে, তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু শাস্ত্রে যখন দেখিতে পাই—

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥"

তখন রামানুজকে কোন মতেই দোষ দিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেবও বিষ্ণুপ্রিয়াকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহও সকলের অজ্ঞাতে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।

রামানুজকে সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী হইতে দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। অনিন্দ্যসুন্দরী রূপলাবণ্যবতী, যুবতী রমণীর প্রেম-পাশ ছিন্ন করিয়া তরুণ যুবক রামানুজ যে সন্ন্যাসী হইলেন—ভোগের পথ ছাড়িয়া ত্যাগের মার্গ অবলম্বন করিলেন, ইহা সকলেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল। রামানুজ ক্রমে কাঞ্চীপূর্ণ-মঠের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে হরীত, কুরনাথ বা কুরেশ প্রভৃতি শ্রুতিধরগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত ভাস্করের অনলবর্ষী কিরণ যেমন লঘু জলদজালে অধিকক্ষণ আচ্ছাদিত থাকে না, তদ্রূপ রামানুজের প্রতিভারশ্মিও অপ্রকাশ রহিল না। গুরু যাদবপ্রকাশ স্বয়ং আসিয়া রামানুজের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিলেন। রামানুজ তাঁহাকে "গোবিন্দদাস" নামে অভিহিত করিলেন।

এদিকে রামানুজের দীক্ষাগুরু শ্রীমহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া, রামানুজ গুরু-সন্নিধানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রে আছে—

"শরীরং বহু বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্ম গুণানসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্‌যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যে শরীর, ধন, জ্ঞান, বাস, কর্ম্ম, গুণ ও প্রাণ গুরুর জন্য ধারণ করে, সেই প্রকৃত শিষ্য। রামানুজও এইশ্রেণীর শিষ্য ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে গুরুকে ভক্তি করিতেন। শ্রীমহাপূর্ণের নিকট তিনি পঞ্চরাত্রাগম, ব্যাসসূত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপূর্ণ রামানুজের অলৌকিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া আপন পুত্র পুণ্ডরীককে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। রামানুজাচার্য্য শ্রীমহাপূর্ণের নিকট গোষ্ঠীপূর্ণ-নামক এক পরমবৈষ্ণবের মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাঁহার দর্শনাভিলাষে গোষ্ঠীপূর গ্রামে উপনীত হইলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে দেখিয়াই এরূপ আত্ম-বিস্মৃত হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন।

যজ্ঞদত্ত-নামক এক দিগ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্তের সমগ্র পণ্ডিতসমাজকে পরাস্ত করিয়া আপন দেশাভিমুখে প্রস্থান করিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, রামানুজ-নামক একজন বৈষ্ণবসন্ন্যাসী মায়াবাদ-খণ্ডন-পূর্ব্বক আপন সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন। সংবাদ শুনিয়া যজ্ঞদত্ত রামানুজকে পরাস্ত করিবার জন্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞদত্ত ক্রমে রামানুজের নিকট গমন করিলেন। যজ্ঞদত্ত রামা-নুজের নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র রামানুজ বলিলেন—"আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম।" ঐ কথা শুনিয়া যজ্ঞদত্ত বলিলেন—'যদি আপনি বিনাতর্কে পরাজয় স্বীকার করেন তাহা হইলে ইহাই বুঝা যাইবে যে আপনি ভ্রান্ত-বৈষ্ণব-মত পরিত্যাগ করিয়া অভ্রান্ত মায়াবাদ গ্রহণ করিলেন।"

রামানুজ বলিলেন—'মায়াবাদীরা "ভ্রান্তি ভ্রান্তি" করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে। তাহাদের মতে তর্ক-যুক্তি প্রভৃতি সবই মায়া; সুতরাং যুক্তিসিদ্ধ মায়াবাদকে কিরূপে "অভ্রান্ত" বলিয়া মনে করা যাইবে?"

যজ্ঞদত্ত বলিলেন—"দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তৎ সমস্তই মায়াময়। এই কারণেই মায়াবাদীরা বলেন—এই তিনটিকে ত্যাগ না করিলে, কোন প্রকারেই অভ্রান্ত-সত্য-প্রাপ্তি হয় না। অতএব চিন্তা করুন—আপনারা ভ্রান্ত, না আমরা ভ্রান্ত?"

এই প্রকার সপ্তদশ দিন যাবৎ বহু শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের পর রামা-নুজ পরাজিত হইলেন। শ্রাবণের বর্ষণক্লিষ্টমেঘাবৃত আকাশের ন্যায়

তাঁহার মুখখানি বিষাদের কালিমায় ঢাকিয়া গেল। রামানুজ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন ইষ্টদেবতার সম্মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“হে নাথ! প্রাচীন মহাত্মারা যে বৈষ্ণবশাস্ত্র অবলম্বনে আপনার চরণকমলের মধু-পানের অধিকারী হইয়াছেন, কালক্রমে সেই মহান্ বৈষ্ণবশাস্ত্র আজ বোধ-হয় মায়াবাদরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইল!”

রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে রামানুজ দৈববাণী শুনিলেন। তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহাকে যেন বলিলেন—“হে যতিরাজ! তুমি নিরাশ হইও না। তোমার দ্বারাই শীঘ্র জগতে ভক্তিযোগ-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইবে।”

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতেই রামানুজের বড় আনন্দ হইল। দেবতার অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দিয়া, তাঁহার মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। সেদিন তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া মায়াবাদী চকিত হইলেন। ভাবিলেন, “কল্য যাঁহাকে মলিন মুখে ফিরিতে দেখিয়াছি, অদ্য তাঁহাকে দেখিয়া, স্বর্গীয় দেবতার সমান প্রতীতি হইতেছে। নিশ্চয়ই ইনি দেববল প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আসিয়াছেন; সুতরাং ইঁহার সহিত শাস্ত্রার্থ করা ব্যর্থ। এই মহাত্মার শরণাগত হওয়াই কল্যাণকর। ব্যর্থ শুষ্ক শাস্ত্রার্থ করিয়া আমি জীবন কাটাইয়াছি। অহঙ্কার বাড়াইয়া চিত্ত কলুষিত করিয়াছি। যখন চিত্তের শুদ্ধি হয় নাই, তখন ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে হইবে? আহা! এই মহাপুরুষ কেমন অভিমানশূন্য! আমি ইঁহার শিষ্য হইয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিব।” এই ভাবিয়া পুণ্যবান্ যজ্ঞদত্ত, রামানুজকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামানুজ “শ্রীভাষ্য” রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি বোধায়নের “বৃত্তি” এদেশে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, রামানুজ, প্রিয়শিষ্য কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে সারদাপীঠাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সারদা-পীঠে বহু পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও শাস্ত্রালাপ হইল। রামানুজের বিদ্যাবত্তায় ও বাগ্মিতায় তৎস্থানীয় পণ্ডিতগণ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। রামানুজ বোধায়নবৃত্তির কথা তুলিবামাত্র তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করিলেন, ইঁহাকে বোধায়নবৃত্তি দেওয়া কোনমতে উচিত নহে; কারণ ইঁহার সিদ্ধান্ত, মহর্ষি বোধায়নের অনুমোদিত নহে। যদি ইনি বোধায়নবৃত্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে ইনি তৎসাহায্যে নিজমত দৃঢ় করিয়া, অদ্বৈতমতের প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবেন। ইহা স্থির করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—“মহাত্মন্!

ঐ পুস্তক আমাদের নিকট ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পোকায় তাহা নষ্ট করিয়াছে।" রামানুজ পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও বিরস-বদনে যাইয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিতে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে পুস্তক-হস্তে প্রাদুর্ভূতা হইয়া বলিলেন—"বৎস। তুমি এই পুস্তক লইয়া শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া যাও; কারণ এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী জানিতে পারিলে তোমার এস্থান হইতে প্রাণ লইয়া যাওয়া দুষ্কর হইবে।" সরস্বতী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রামানুজও পুস্তক লইয়া দক্ষিণদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে পণ্ডিতমণ্ডলী পুস্তকরাশি অন্বেষণ করিতে করিতে বোধায়ন-বৃত্তি না পাইয়া মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই রামানুজ উক্ত পুস্তক চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তখনই কতিপয় বলবান্ লোক রামানুজের অনুসরণার্থে প্রেরণ করিলেন। একমাস পথ চলিবার পর তাহারা রামানুজকে ধরিয়া গ্রন্থখানি কাড়িয়া লইল। রামানুজ বহুকষ্টলব্ধ পুস্তক হারাইয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তখন কুরেশ, গুরুর বিমর্ষ বদন দেখিয়া বলিল "আপনি দুঃখ করিবেন না। কাশ্মীর হইতে আসিবার কালে আপনি পথিমধ্যে আমাকে বোধায়নবৃত্তি পড়িয়া শুনাইয়াছেন, তাহাতেই ঐ পুস্তক আদ্যোপান্ত আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। আমি আপনাকে তাহা লিখিয়া দিতেছি।" রামানুজ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া কুরেশকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই রামানুজ শিষ্যবর্গকে বলিলেন—"হে ভাগবতগণ, তোমাদের ভক্তিবলে ও কুরেশের স্মরণ-শক্তি-প্রভাবে আমি "বোধায়নবৃত্তি" পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সমস্ত তার্কিক লোক "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ-জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়—বলেন, অথবা যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম আদি মুক্তির একমাত্র উপায় বলেন, আজ আমি তাঁহাদের মত খণ্ডনপূর্ব্বক ধ্যান, উপাসনা ও ভক্তির দ্বারাই যে মুক্তিলাভ হয় এবং ইহাই যে বেদ-বেদান্তের অভিপ্রায়, তাহা প্রতিপাদন করিয়া "শ্রীভাষ্য" রচনা করিব।"

এইরূপে "শ্রীভাষ্য" লিখন আরম্ভ হইল। শ্রীভাষ্য-লিখনানন্তর রামানুজ "বেদান্তদীপ." "বেদান্তসার" "বেদার্থসংগ্রহ" এবং "গীতাভাষ্য" এই চারিখানি গ্রন্থ লিখেন। ইহা ছাড়া "দ্রাবিড়বেদ" নামে আর একখানি গ্রন্থও তিনি সম্পাদন করেন।

অতঃপর রামানুজ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমে কুম্ভকোণম্, কুম্ভকোণম্ হইতে মাদুরা, মাদুরা হইতে কেরল,

(মালাবার) তথা হইতে তিরুঅনন্তপুরম্ (ত্রিবেন্দ্রম্) মথুরা, বৃন্দাবন, শালগ্রাম, বদরিকাশ্রম, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ ইত্যাদি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত ও আপন মতে দীক্ষিত করিয়া, কাশ্মীরের সারদামঠে গিয়া উপনীত হইলেন। তত্রত্য সারদাদেবী রামানুজের মুখে "কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্" ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাকে "ভাষ্যকার" উপাধি প্রদান করিলেন। কাশ্মীরের রাজা ও তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কাশ্মীর হইতে রামানুজ শ্রীপুরুষোত্তমের জগন্নাথপুরীতে গমন করিলেন। তথায় কয়দিন বিশ্রামানন্তর স্বীয়মত-প্রচারের জন্য তিনি তথায় এক মঠ স্থাপন করিলেন।

জগন্নাথক্ষেত্র হইতে রামানুজ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণ নানাস্থানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল। মহাপ্রাণ রামানুজ গুরু শ্রীমহাপূর্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে শুক্লাদশমী শনিবার মধ্যাহ্নসময়ে পরমপদলাভের জন্য মহাপ্রয়াণ করিলেন। *

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শিক্ষাষ্টকম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের অনুবৃত্তম্)

কৃষ্ণসঙ্গ গোপাঙ্গনাগণের সতীত্বেরই পরিচায়ক। এক্ষণ যাঁহাদিগকে আমরা সামাজিক প্রথা অনুসারে "সতী" বলিয়া থাকি, তাঁহারা এ শ্রেণীর সতী নহেন, কারণ তাঁহাদের পতিগণ তাঁহাদের দ্বারা পরমাত্মারূপে সেবিত নহেন। তাঁহারা এতদিন কেবল লৌকিক দেহকে পতি বলিয়া সেবা করিতেছেন; যখন তাঁহারা তাঁহাদিগের পতিগণকে পরমাত্মারূপে দর্শন করিবেন, তখনই তাঁহারা যথার্থ সতী হইবেন; কারণ আত্মারামরূপে পরমাত্মাই পতি, অন্য কেহ নহেন। অতএব গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা ভাবিয়া আসক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা "সতী" ভিন্ন কি হইতে পারেন?

* এই জীবনচরিত লিখনে আমি চতুর্ব্বেদী দ্বারকাপ্রসাদ প্রণীত হিন্দী "রামানুজাচার্য্যচরিতের" সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। মদীয় পরমবন্ধু হিন্দী "প্রেমপুষ্প"-সম্পাদক আমাকে এই প্রাচীন গ্রন্থখানি পড়িতে দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।— লেখক।

ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে কেহ মুনিচরী, কেহ শ্রুতিচরী ও কেহ কেহ দেব-কন্যা ছিলেন। মুনিচরী যথা—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২৭২ অধ্যায়ে।

(পুনা মুদ্রিত)

পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, পরমরমণীয় শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কাম-ভাবে প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

শ্রুতিচরী যথা—

সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ॥
তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে।
বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে।

যে সমস্ত উপনিষদ্ সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মদর্শিনী, তাঁহারা গোপীদিগের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া, অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন এবং গোপী-তুল্য-ভাগ্য-লাভার্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া, প্রেমবতী হইয়া, ব্রজে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণে এবং উপনিষৎসকলে এইরূপ প্রথা বর্ণিত আছে যে তাঁহারা বল্লবী।

দেবকন্যা যথা—

জনিষ্যন্তে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ।

শ্রীভাগবতে ১০।১।২৩

তাঁহার প্রিয়-কার্য্য জন্য সুরস্ত্রীসকল জন্মগ্রহণ করিবেন।

অন্যত্র—

দেবেষংশেন জাতস্য কৃষ্ণস্য দিবি তুষ্টয়ে।
নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ॥

তত্র দেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ।
তা অংশিনীনামেবাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সন্তোষের জন্য নিত্যপ্রিয়াগণের অংশসকলেরও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে নিত্যপ্রিয়াগণের যে সকল অংশ বৃন্দাবনে গোপকন্যা-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই নিত্যপ্রিয়াগণের প্রাণ-তুল্যা সখী।

শ্রীকৃষ্ণকে যে যে ভাবে চিন্তা করুক না কেন, তাহাতেই তাহার মুক্তি হইবে—

যং ক্রোধ-কাম-সহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্য-মোহ-গুরুগৌরব-সেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ৫৫।

যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধভাব, সহজ প্রণয়ভাব, (সখ্য) ভীতিভাব, বাৎসল্যভাব, মোহ (সর্ব্ববিস্মরণময় ভাব, কিন্তু অন্তরে পরব্রহ্মদর্শন বশতঃ স্ফূর্ত্তি), গুরুজনের প্রতি গৌরবভাব এবং সেব্যভাব,—ভক্তগণ এই সকলের মধ্যে যে কোন ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ভজনা করিলে, তিনি নিজের ভজনানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গোপাঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যাবয়ং বিভো ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১।৩০।

হে বিভো! কামবশতঃ গোপাঙ্গনাগণ, ভয়বশতঃ কংস, দ্বেষবশতঃ শিশুপালাদি রাজগণ, সম্বন্ধবশতঃ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, স্নেহ বশতঃ তোমরা এবং ভক্তিতে আমরা (নারদ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন) ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছি।

সুতরাং গোপললনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কামভাবে ভজনা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল গোপী ছিলেন, তাঁহারা মনুষ্য থাকেন নাই—

গোপ্যশ্চ শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋচো বৈ গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র তপোযুক্তা ন মানুষাঃ॥

পদ্মপুরাণে—পাতালখণ্ডে।

হে রাজেন্দ্র! গোপীগণ শ্রুতি ছিলেন, গোপকন্যাগণ ঋক্‌সকল ছিলেন, এবং দেবকন্যাগণ তপস্বিনী ছিলেন, তাঁহারা মানবী থাকেন নাই। গোপীভাবে ভজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইভাবে ভজন করিতে পারিলে, শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি কৃষ্ণেরে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ পরিচ্ছেদে।

গোপাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা, তাঁহারা পরকীয়া নহেন। কেবল শ্রীবৃন্দাবন-লীলা-মাধুরী-বিকাশ-জন্য পরকীয়ারূপে প্রতীত হইয়াছিলেন মাত্র; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ছিলেন।

মহর্ষি শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-পূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন যে, গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরদার থাকেন নাই—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০। ৩৩। ৩৭

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া স্ব স্ব পত্নীগণকে স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা কৃষ্ণে বিদ্বেষ করেন নাই।

ব্রজাঙ্গনারা নিত্যসিদ্ধা। যখন ভগবান্ লীলার জন্য আবির্ভূত হন, তখনই নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধাগণ সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধারা শ্রীভগবানেরই ভোগ্যা; তাঁহারা কখনও গোপগণের ভোগ্যা হইতে পারেন না। এই বিষয়ে গোস্বামিপাদগণ কহিয়াছেন—

ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে।

ব্রজদেবীগণের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই।

যোগমায়া এই সকলের কার্য্য-কর্ত্রী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি হইলেই গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতেন ও যোগমায়া সেই সেই ব্রজাঙ্গনার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গোপগণের পার্শ্বে রক্ষা করিতেন! রাবণ যখন সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সীতাদেবীর প্রতিকৃতি লইয়া গিয়াছিলেন, সীতাদেবীকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। সীতাদেবীকে অগ্নিদেব লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন।* সুতরাং নিত্যসিদ্ধাকে অন্যে স্পর্শও করিতে পারে না, ভোগের কথা ত দূরে।

এই লীলা ভক্তির পরাকাষ্ঠা। হরিনামোত্তোজ-মধুপান-মত্ত বিবেক মহাত্মা নারদ ঋষিও ব্রজ-দেবীগণের শ্রীকৃষ্ণ-রতিকে পরাভক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা। ১৯

অস্ত্যেবমেবং। ২০ ॥

যথা ব্রজগোপিকানাং। ২১ ॥

নারদসূত্রে।

এই লীলা কেবল কামজয়ী ভক্তগণের আস্বাদনের সামগ্রী। ভক্তরূপ শুকপক্ষী যেন ইহা আস্বাদন করেন, অভক্তরূপ বায়স যেন ইহা আস্বাদন করিতে চেষ্টা না করেন; যদি করেন, তাহা হইলে তিনি ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করিবেন। এ লীলা সাধারণের আলোচ্য নহে; এবং এই লীলা সাধারণকে বলাও কর্ত্তব্য নহে—

ইদং বৃন্দাবনে যৎ তু রহস্যং মম বৈ শুভম্।

ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র বক্তব্যং ন পশৌ কচিৎ ॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৭৫ অধ্যায়ে ৪৮।

শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে—"বৃন্দাবনে আমার যে সমুদায় রহস্যলীলা আছে, তাহা কখনও কোথায়ও বলা কর্ত্তব্য নহে, কারণ পশুবৃত্তি মনুষ্য উহা শ্রবণ করিলে কদর্থ করিবে।"

মহাপ্রভু আর কেহই নহেন, তিনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপ; তিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে গৌর—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং———।

ভগবৎ-সন্দর্ভে।*

---

* কূর্ম্মপুরাণে উত্তরভাগে ৩২ অধ্যায়ে।

তাঁহার অবতারের প্রয়োজন তিনি নিজে শ্রীমুখে কহিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যোযেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশোবা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং বাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যং সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌহরীন্দুঃ॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ১ পরিচ্ছেদে।

শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা প্রেম দ্বারা আস্বাদন করেন—সেই মাধুর্য্যাতিশয়ই বা কীদৃশ, এবং আমার অনুভব-হেতু শ্রীরাধার যে সুখোদয় হয়, সেই সুখই বা কীদৃশ;—এই তিন বিষয়ে লোভ বশতঃ শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শচী-গর্ভ-সমুদ্রে কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যে মহাপ্রভু প্রকৃতি-স্পর্শে ভীত হইতেন, যিনি পরমবৈষ্ণবী মাধবীদাসীর নিকট ভিক্ষা করাতে হরিদাসকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীমুখের বাক্য—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ৮ অঙ্কে।

যিনি ভব-সাগরের পরপারে যাইতে অভিলাষী ও ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, সেই নিষ্কিঞ্চন জনের, বিষয়ী ব্যক্তি ও রমণীগণের দর্শন বিষ-ভক্ষণ হইতেও অনিষ্টকর।

যিনি আরও কহিয়াছেন—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১১ পরিচ্ছেদে।

যদ্রূপ সর্পকে দর্শন করিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ও বিষয়ী লোকের আকার দেখিয়া ভয় করা উচিত।

যে মহাপ্রভু আচণ্ডাল সকল জাতিকে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন—

যে আনিল প্রেমধন এই অবনীতে।
সাধ হয় এই গুণ বর্ণন করিতে॥

প্রেমবিলাসে ১৭ বিলাসে।

সেই মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে, উচ্ছৃঙ্খল-মতাবলম্বী ভেকধারী দুষ্ট-সম্প্রদায় যে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। উক্ত সম্প্রদায়, শ্লোকের বিকৃত অর্থ করিয়া, প্রকৃতি সঙ্গে লইয়া স্বীয় পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে ছল-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শাস্ত্রে ঐ ছল-ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে আদেশ আছে—

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমা চ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১৫।১২।

ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে আভাসধর্ম্মও বলা যাইতে পারে। আভাস-ধর্ম্ম যথা—

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসোহ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।

ঐ ৭।১৫।১৪।

মনুষ্যগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রমধর্ম্ম হইতে ভিন্নপ্রকার যে ধর্ম্মের আচরণ করে, তাহাকে আভাসধর্ম্ম কহে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি প্রাচীনধর্ম্ম। মহারাজ পৃথুও এই ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন—

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্রব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

শ্রীভাগবতে ৪। ২১ ১১

আমি সপ্তদ্বীপের একমাত্র দণ্ডধারী, কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণকুল ও অচ্যুত-গোত্র বৈষ্ণব হইতে অন্যত্র আমার আদেশ অস্খলিত থাকিবে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব চলিবে না, অবশিষ্ট সকলের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব চলিবে।

বেদেও বৈষ্ণবধর্ম্মের উল্লেখ আছে যথা—

"বৈষ্ণবো ভবতি"　　ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ১।৩।৪।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে কোটিকোটি প্রণাম করিতেছি; তাঁহারাই এই শিক্ষাষ্টকের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন।

সম্পূর্ণম্।

"মহাযশো মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্।
মহাভাগবতান্ বন্দে বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥
হরিনামপরা যে চ হরি-ভক্তি-পরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥"

"হে ভক্তাঃ বারিবন্দ্যকান্ বালমী রৌদ্ভায়ং জনঃ।
নাথাবিশিষ্টসেবাতঃ প্রসাদং লভতাং মনাক্॥"

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

শ্রুতি কর্ম্মপরা না জ্ঞানপরা ?

কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদকে অনুকরণ করিয়া, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা—এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক কাণ্ডে গীতার ছয়টী করিয়া অধ্যায় আছে।

অত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্ম-তত্ত্যাগ-বর্ণ্ণনা।
'ত্বং'পদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তি নিরূপ্যতে॥
দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা-বর্ণন-বর্ণ্ণনা।
ভগবান্ পরমানন্দ-"তৎ"পদার্থোঽবধার্য্যতে॥
তৃতীয়েতু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্।
এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরং॥

অতএব দেখা যায় যে, কর্ম্ম ও উপাসনার মধ্য দিয়া জ্ঞানসীমায় পৌঁছিতে হয়, এবং জ্ঞানই চরম পথ; জ্ঞান-কাণ্ডেই অপর কাণ্ডদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষ কাণ্ডেই মোক্ষহেতু সংন্যাসযোগ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমপাণ্ডবকে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, অনাসক্ত-চিত্তে কর্ম্ম করিতে হইবে; ফলের প্রতি কোন দৃষ্টি থাকিবে না। সমস্ত ফলই ব্রহ্মে অর্পণ করিতে পারিলে, প্রকৃত কর্ম্মসংন্যাস হইবে। তৎপরে জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, জ্ঞানবলে অক্ষরের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া, ত্রিগুণাতীত হইলে, ও প্রাকৃত গুণ ও সম্পদাদির যথার্থ বিভাগ জ্ঞাত হইলেই মোক্ষপদ

প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব গীতার মতে জ্ঞানই চরম লক্ষ্য এবং কর্ম্ম উপাসনা প্রভৃতি সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার ক্রম মাত্র। শ্রুতিতে কর্ম্মের উপদেশ আছে, সুতরাং শ্রুতি জ্ঞানপরা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না এমন নয়। বেদে পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদে দৃষ্ট হয় যে, "তস্য নিশ্চিন্তনং ধ্যানম্, সর্ব্বকর্ম্মনিরাকরণমাবাহনম্, নিশ্চয়জ্ঞানমাসনম্, উন্মনীভাবঃ পাদ্যম্, সদাঽমনস্কমর্ঘ্যম্, সদাদীপ্তিরপারামৃতবৃত্তিঃ স্নানম্, সর্ব্বত্র ভাবনা গন্ধঃ, দৃক্‌স্বরূপাবস্থানমক্ষতাঃ, চিদাপ্তিঃ পুষ্পম্, চিদগ্নিস্বরূপং ধূপঃ, চিদাদিত্যস্বরূপং দীপঃ, পরিপূর্ণচন্দ্রামৃতরসস্যৈকীকরণং নৈবেদ্যম্, নিশ্চলত্বং প্রদক্ষিণম্, সোঽহংভাবো নমস্কারঃ, মৌনং স্তুতিঃ, সর্ব্বসন্তোষো বিসর্জ্জনম্।" তত্ত্বজ্ঞানানন্তর শাস্ত্রত্যাগ সম্বন্ধেও উপনিষদের উক্তি এই—

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে নিবৃত্তিমার্গের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। আরও—

কর্ম্মাণি চিত্তশুদ্ধ্যর্থমৈকাগ্র্যার্থমুপাসনা।
মোক্ষার্থং ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ বি এল্ মহাশয় তাঁহার "গীতায় ঈশ্বরবাদ" গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যে দ্রব্যের কারণে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য-সেবনে রোগের উপশম হয় না, কিন্তু সেই দ্রব্য যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রণালীমতে দ্রব্যান্তরের দ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা রোগের শান্তি হইতে পারে, সেইরূপ এই যে তাপত্রয়ময় ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি কর্ম্ম হইতে, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহার উপশম হয় না, কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তবে ঈশ্বর দ্বারা ভাবিত সেই কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়। যথা—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।৩২।৩৩

মীমাংসকাদিগের বাক্য এই যে—

অতএব পুরাকার্য্যো বেদপাঠঃ প্রযত্নতঃ।
ততো ধর্ম্মস্য জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা ধর্ম্মসাধনী॥
চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ চোদনাতু ক্রিয়াং প্রতি।
প্রবর্ত্তকং বচঃ প্রাহুঃ স্বঃকামোঽগ্নিং যজেত্তথা॥

ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে জৈমিনিমতং।

কিন্তু মীমাংসা-প্রকরণ-গ্রন্থ-প্রণেতা লৌগাক্ষিভাস্কর তাঁহার "অর্থসংগ্রহে" আমাদিগের উক্তিরই পোষকতা করিয়াছেন—"সোঽয়ং ধর্ম্মো যদুদিশ্য বিহিত-স্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ"—অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদি-ফল-সাধক হয়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মীমাংসকের মধ্যেও কেহ কেহ প্রকারান্তরে শ্রুতিকে জ্ঞানপরা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ"-নামক গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিত উক্তগ্রন্থে তৃতীয়পরিচ্ছেদে প্রথম তিনটী শ্লোকে "কর্ম্মণাং বিবিদিষাবিদ্যাফলকত্ব"-বিচার করিয়াছেন যথা—

জ্ঞানেনৈব কথং মুক্তিঃ কর্ম্মভিশ্চাপি তৎস্মৃতেঃ।
নাবিদ্যকত্বাদ্ বন্ধস্য নান্যঃ পন্থা ইতি শ্রুতেঃ॥
কর্ম্মণামুপযোগস্তু তামর্থাক্রম্যতেঽস্থিতঃ।
তমেতমিতি বাক্যেন মুখ্যো বিবিদিষোদ্ভবে॥
সর্ব্বাং কাম্যমানে তৎ জ্ঞানে বিবরণানুগাঃ।
সিদ্ধান্তিতবাং শ্রুতিভিবর্হ্ম্যোত্যত্র শ্রুতেরিব॥

এই ছয় চরণের ভাবার্থ বুঝিলেই শ্রুতি যে জ্ঞানপরা, সহজেই তাহা উপলব্ধি হইবে। শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দতীর্থ এই গ্রন্থের "কৃষ্ণালঙ্কার" নামক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তল্লিখিত ব্যাখ্যার সাহায্যে এই শ্লোক বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথম দুই চরণের অর্থ এই যে, কেবল বিদ্যার দ্বারাই যে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় তাহা নহে, কেননা "তৎপ্রাপ্তিহেতু বিজ্ঞানং কর্ম্মচোক্তং মহামুনে" এই অংশে কর্ম্ম দ্বারাও ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, ইহা কর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন, কিন্তু "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই শ্রুতি, জ্ঞানকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, কর্ম্মকে নয়। ভ্রম নিরস্ত হইলে "নিত্যাত্মস্বরূপত্বে"র বলে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় এবং

সাধারণতঃ জ্ঞানের দ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হয় ইহা সাংসারিক দৃষ্টান্ত। কণ্ঠস্থ মালা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে—ভাবিয়া বৃথা অন্বেষণকারীকে "তোমার গলা-তেই মালা রহিয়াছে" বলিয়া দিলে, বিগতভ্রম হইয়া সে যেরূপ তাহার মালাকে পাইয়া থাকে এবং এস্থলে "কণ্ঠে মালা আছে" এই জ্ঞান মালাপ্রাপ্তি-বিষয়ে যেরূপ সহায় হয়, সেইরূপ অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে জ্ঞানই পথ প্রদর্শন করিতে পারে। এস্থলে বুঝা গেল—জ্ঞানভিন্ন পদার্থে অজ্ঞাননিবৃত্তির ক্ষমতার একান্ত অভাব। দ্বিতীয়শ্লোকের অর্থ এই যে "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহ-নাশকেন" শ্রুতিতে কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব এবং কর্ম্মের অপ্রাধান্য দৃষ্ট হয়—কারণ "বিদ্যাসংপ্রয়োগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শম-দমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাত্তু বাহ্যতরাণি যজ্ঞাদীনি" জ্ঞানে রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মা পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি আবশ্যক; জ্ঞান হইলে তাহাদের আর আবশ্যক হয় না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে বিবরণানুসারিদিগের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। বিবরণানুসারিগণ বলেন যে, প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োঃ প্রত্যয়ার্থস্য প্রাধান্যম্—এই সামান্য ন্যায় দ্বারা "ইচ্ছা-বিষয়তয়াশব্দবোধো এব শব্দসাধনতান্বয়ঃ" অর্থাৎ—অশ্বেন জিগমিষতি অসিনা জিঘাংসতি ইত্যাদি লৌকিকবাক্যে অশ্ব, অসি প্রভৃতির সাধনত্ব-স্বীকার আবশ্যক হয়, তদ্রূপ বৈদিকব্যবহারেও "তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যং" ইত্যাদি স্থানের "তব্য"-প্রত্যয়ান্ত পদার্থের সাধনরূপে যজ্ঞাদির উপদেশ। মীমাংসা এই যে, যজ্ঞের মুখ্যত্ব ও মুক্তিপ্রদানের শক্তি স্বীকার করিয়া লইলে "ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ কর্ম্মত্যাগের উপদেশের সহিত তাহার বিরোধ ঘটে। বীজবপনের পূর্ব্বে যেরূপ ভূমি-কর্ষণ আবশ্যক, তদ্রূপ চিত্তকে জ্ঞানের উপযোগী করিতে হইলে, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদন আবশ্যক যথা—

আরুরুক্ষোঃ মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

কৃষ্ণানন্দতীর্থ "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" হইতে প্রথম উদ্ধৃত করিয়াছেন যে—

প্রত্যক্‌প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যাপাদ্য শুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥

কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, এজন্য এতদুভয়ের একত্র বাস সম্ভব-পর নহে। জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি নাই। কর্ম্ম, জ্ঞানসাধনের সোপান-স্বরূপ।

যে কর্ম্মফল বশতঃ জীব জগতে বার বার জন্মগ্রহণ করে, সেই অজ্ঞান-জনিত কর্ম্মের নাশের জন্য জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। "সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

দেহাত্মবুদ্ধিবিচ্ছিত্ত্যৈ জ্ঞানং কর্ম্ম বিবৃদ্ধয়ে।
অজ্ঞানমূলকং কর্ম্ম জ্ঞানং তু তন্নাশকম্॥

জ্ঞান দেহে আত্মবুদ্ধিবিচ্ছেদের হেতু এবং কর্ম্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-বৃদ্ধির কারণ বলা হইয়াছে। কর্ম্ম অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু জ্ঞান, অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ম্মের নাশক। শারীরকভাষ্যের প্রথম অধ্যায় প্রথমপাদের চতুর্থ অধিকরণে বিস্তৃতভাবে ইহার মীমাংসা আছে, অধিকরণটি এই—

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত।
শাস্ত্রত্বতো বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ॥
নাহংবুদ্ধেশ্চ বিধিঃ শাস্ত্রত্বং শংসনাদপি।
মননাদিঃ পুরাবোধাদ্ ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ॥

বৈয়াসিক ১।১।৪।২১-২২

শঙ্করানন্দ তাঁহার "বেদান্তপ্রদীপিকা"—নাম্নী বৃত্তিতে বলিয়াছেন যে "জৈমিন্যাদিবচনানাং কর্ম্মাদিপ্রায়কত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তৌ ব্রহ্মণি শাস্ত্রং প্রমাণমেব সমন্বয়াদিত্যুক্তং।" শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের বিচার এই, উপাসনাই মুক্তিপ্রদ, কারণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ বলেন যে "দৃষ্টোহি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্, চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্, তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ", আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যাদিতে কতক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও কতক বিষয় হইতে নিবৃত্তি সূচনা করিতেছে। অতএব সামান্যতঃ ন্যায় দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রাদির ক্রিয়াপরত্ব নিশ্চিত হয়। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাসক উত্তর এই যে, স্বর্গাদিকামীর জন্য অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ আছে, সেইরূপ অমৃতত্বকামনাকারীর জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যবস্থা। আর কেহ বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভূত, কারণ মীমাংসাসূত্রে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"—সূত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদুক্তি সমীচীন নহে, কারণ জিজ্ঞাসার বৈলক্ষণ্যে ফলের তারতম্যের প্রমাণ আছে। "মুক্তেঃ বিধেয়ক্রিয়াজন্যত্বে কর্ম্মফলাদবিশেষপ্রসঙ্গাৎ" (রত্নপ্রভা) মুক্তি কর্ম্ম-জন্য হইলে কর্ম্ম-জন্য ফলের ন্যায় অনিত্য হয়। মুক্তির সহিত কর্ম্মফলের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য জ্ঞানের অনাগুক-শঙ্কা নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন

যে, শ্রুতি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিধিপ্রযুক্তত্ব নির্ণয় করিতেছে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" বৃহ (২।৪।৫।) "য আত্মাপহতপাপ্মা"। ছান্দো (৮।৭।১) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড ৩।২) ইত্যাদি শ্রুতি। সেই ব্রহ্ম কি, কি রূপ, তদন্বেষণেই সকল বেদান্তশাস্ত্রের উপযুক্তত্ব অবধারিত হইতেছে এবং "নিত্যতৃপ্তঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবঃ" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি রূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি ও প্রত্যগ্ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই মোক্ষফল অবশ্যম্ভাবী। বস্তুমাত্র-কথনে তৎসম্বন্ধজ্ঞান হয় না, শ্রবণ-মননাদি আবশ্যক—"তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যমিতি।" এ সম্বন্ধে নানারূপ শ্রুতিপ্রমাণও উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কূটস্থনিত্যত্ব ও পরিণামিনিত্যত্ব—এতদুভয়ের মধ্যে পরিণামিনিত্যত্বকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং অক্ষপাদ "ন্যায়ের" "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানা-মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"—সূত্র দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানানন্তর ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়—এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান সম্পৎস্বরূপ নহে—যথা অনন্তং বৈ মনো-হনন্তা বিশ্বেদেবা—অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি (বৃহ ৩।১।৯।) এবং অধ্যাসরূপও নহে, যথা—মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত (ছান্দোগ্য ৮।১) ইত্যাদিতে মন আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মত্বকল্পনাই অধ্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। সম্পাদাদিরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব মনে করিলে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহ ১।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ হয় না। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুণ্ড ২।২।৮।) ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অবিদ্যা-নিবৃত্তির ফলস্বরূপ। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড ৩।২।৯) ইত্যাদি বাক্যের সম্পাদাদিপক্ষে সামঞ্জস্য হয় না, অতএব "ব্রহ্মাত্মবিদ্যা" পুরুষব্যাপারতন্ত্রা নহে, তাহা হইলে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়ীভূত জ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্র। এইরূপ ব্রহ্মকে কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে? ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কর্ম্মানু-প্রবেশঃ কল্পয়িতুম্॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব বেদান্তরত্ন।

লঙ্কা-বিজয়।

তৃতীয়-সর্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

করেছিলে তুমি মোর শল্য নিদূরিত
বিশল্যকরণী আনি, বাঁচায়েছ প্রাণ
আমার, অগ্রজ সখে শ্রীরাম ভরত
মিলায়েছে বিধি তোমা তৃতীয় অগ্রজ
আমার : স্মরিলে তব শীলতার কথা
আনন্দের অশ্রুরাশি ধরে না হৃদয়ে।
সকলি সম্ভবে ভবে হে সখে তোমাতে
বাহু-বলে, বুদ্ধি-বলে, ক্রিয়া-বলে তব ;
পার হে বিপদবন্ধু মহাসিন্ধু-জলে
উপাড়িয়া লঙ্কাভূমি তুমি ডুবাইতে
একাকী ; কিন্তু এ দুষ্ট লঙ্কেশের পাপে
হইয়াছে হত কত নিষ্পাপ জীবন
বারে বারে, তাই বলি পবনকুমার !
এ অন্যায় আয়োজনে প্রয়োজন নাই।
উঠেছি উত্তরি যবে উত্তাল পয়োধি,
হে সুধি, হে শ্রদ্ধাস্পদ, গোষ্পদ হেরিয়া
কি কারণ ভয় কহ করিব এখন
আমরা! জীবিত মাত্র রাবণ একাকী
সম্পাতে সংবিত্‌হারা, বহিত্রবিহীন
প্রভঞ্জন-সন্তাড়িত পতিত অর্ণবে
ভ্রাম্যমাণ ঘূর্ণ্যমান তরণীর মত,
কিম্বা নির্বান্ধবদেশে,—প্রবাস-নিবাসে—
কালের কঠোর কক্ষে শয়ন-উন্মুখ
ভগ্নোদ্যম রুগ্নসম, স্মরিছে রাক্ষস
দীন মনে গতপ্রাণ প্রাণপুত্রগণে।
জনহীন জনপদ, বারিহীন সর,

পুণ্যময় পীঠস্থান বিগ্রহবিহীন
শ্রীহীন যেমতি, এই রাক্ষসের পুরী
ওতপ্রোত, শোক-স্রোত আঁধারে মগন।
ভাসিতেছে রক্ষকুল অকুলসলিলে
বিপদের, প্রফুল্লিত বদন তাহার
বিমলিন বিষাদের রোদনে রোদনে।
বহিছে সুগন্ধরূপে প্রভঞ্জনসম
পুতিগন্ধ রাশি রাশি, হিল্লোলে হিল্লোলে
হতাহত রাক্ষসের বপু-বিনিঃসৃত।
তরঙ্গিত এই রণ-পয়োধির মাঝে
পশিবে লঙ্কেশ লয়ে হুতাশ হুঙ্কার—
সঙ্গী হবে রণাঙ্গনে যাতনা-অনল
শত সন্তাপের দাহে দহিবে আপনি।

নীরবিলা নিবারিয়া লক্ষ্মণ সুমতি
তুষ্ট করি পাবনিরে শিষ্ট আলাপনে
এইরূপে, হেনকালে বিশ্বগ্রাসীরূপে
রাশি রাশি ধূমপুঞ্জ অগ্নিপুঞ্জ সহ
অবিচ্ছিন্ন আচ্ছাদিল আঁধারি ধরণী
আসি লঙ্কেশের সেই স্বর্ণ লঙ্কা হ'তে।
উঠিতে লাগিল সঙ্গে ঘোর কোলাহল
সিন্ধুর কল্লোল-সম বায়ুর তরঙ্গে।
হেরিয়া রাঘব এই অদ্ভুত ঘটন
বিস্ময় মানিয়া, চাহি বিভীষণ পানে
সুধান,—"হে মিত্র একি বিচিত্র ব্যাপার
ঘটিলেক অকস্মাৎ কহ কৃপা করি?
বিশ্বনাশী ধূমপুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে আসি
অগ্নি-শিখা সহ কহ কেন আবরিল
দশ দিশ? সেই সঙ্গে শুন মন দিয়া
কোটি কোটি রাক্ষসের কাতর ক্রন্দন।

গোপনে পাবনি কিহে পশি লঙ্কাপুরে
করিলেক ভস্ম পুনঃ গৃহ অট্টালিকা
অগ্নিযোগে? তাই কিহে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
আচ্ছাদিল ধূমপুঞ্জ অগ্নিপুঞ্জ সহ!

সপ্ত দিবানিশি রক্ষঃ বিরত সমরে
অবরোধি মোরে; কালি বিগত সে কাল,
সাজিছে রক্ষরাজা পুনঃ বুঝি রণে
অথবা নতুবা কেন হেন কোলাহল
ধূম শিখা উদগরিয়া ভস্মরাশি সনে
বিকট কটক-রব হতেছে ধ্বনিত?
সজ্জিত হইতে মিত্র সম্বোধি সবায়
বিষম সমরানল জ্বলিল আবার!"

উত্তরিলা বিভীষণ—"হে পুরুষোত্তম!
লঙ্কা-দাহ ধূমপুঞ্জ কিম্বা অগ্নি-শিখা
অথবা লহরী-লীলা রণ-পয়োধির
কখনই নহে ইহা, কহিনু তোমায়।
হারায়ে স্বজন সখা সহায় সম্পদ্
আত্মহারা রক্ষঃপতি শুক্রাচার্য্যে ধরি
লভিয়াছে মহামন্ত্র; তাঁহারি নিদেশে
গোপনে করিছে হোম, তাই ব্যোমব্যাপী
উঠিছে অনল শিখা ধূম-পুঞ্জ লয়ে,
কোটি কোটি রাক্ষসের সিংহনাদ সনে।
সঙ্গোপনে হোম যদি সাঙ্গ হয় তার
দুর্জ্জন অজেয় হবে অবশ্য সমরে,
বাহিরিবে শত শত, হোমানল হতে,
তূণীর, শরনিকর, শরাসন, রথ,
হস্তীরাজী কালসম কৃতান্ত-আকার।
রক্ষঃপতি হাতে যুদ্ধে নিহত হইবে

সেনাবল তব, প্রভো আদেশ সবায়,
অবিলম্বে এই হোম-নিবারণ তরে।"

ছুটিল বানরবৃন্দ রাঘবেন্দ্র-আদেশে
মহারোষে, চূর্ণ করি রুদ্ধ লঙ্কাদ্বার,
পদাঘাতে নিষ্পেষিয়ে অসংখ্য রাক্ষস,
মাতঙ্গ তুরঙ্গবৃন্দ বিনাশিল কত।
চন্দ্রশালা, অন্তঃপুর, সৌধ, হর্ম্ম্যরাজী,
অস্ত্রাগার, ধনাগার, উন্নত প্রাচীর,
অসংখ্য আকার কক্ষ, একে একে একে
বিমর্দ্দিল, আছিল যা দগ্ধ-অবশেষ।

পশি রাক্ষসের পুরে হেরি ঘরে ঘরে,
শত শত উপাদান সজ্জিত যতনে,
করিলেক ছিন্ন ভিন্ন, কিছু না রহিল,
কিন্তু রক্ষঃপতি সনে সাক্ষাৎ হল না;
পলায়িত ভাবি তায়, শান্তায়িত হয়ে
খুঁজি খুঁজি ফিরিবারে উদ্যত শিবির,
মনোদুঃখে; হেনকালে হেরে সবিস্ময়ে,
[illegible], ঊষা যেন বিমানজলদে
[illegible] (রমণীমূর্ত্তি শান্তিদেবীসমা)
দাঁড়াইয়া দ্বারদেশে বাড়াইয়া কর।
কহিলা মধুর স্বরে "কোথা যাও ফিরি,
ঘাঁটাইয়া কালসর্প বিবরে রাখিয়া?
ওই যে পাষাণখণ্ড প্রকাণ্ড আকার
হের তার অধোদেশে ভূগর্ভ-ভিতরে
উপবিষ্ট দুষ্টমতি পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ
ধ্যানমগ্ন; ভগ্ন তার না করিলে ধ্যান,
পশে যদি রণরঙ্গে সাঙ্গ করি হোম,
মারা যাবে একে একে সারা হবে সবে,

রণানলে ভস্ম হবে পতঙ্গের প্রায় ;
ভাঙ্গিয়া পাষাণখণ্ড প্রবেশ বিবরে।
অভাগী রামের দাস রাক্ষস-দয়িতা,
সরমা, অপ্সরীসুতা, বৈদেহীর দাসী
লুকাল সরমা সতী, লঙ্কেশের ভয়ে,
অবিলম্বে, মহোল্লাসে বানর-নিকর
পশিল, প্রস্তরখণ্ড খণ্ড খণ্ড করি,
দুর্জ্জন সে রাবণের নির্জ্জন-বিবাসে।

হেরিল অনলকুণ্ড প্রচণ্ড প্রভাবে
জ্বলিতেছে ধক্‌ধকি ধূমপুঞ্জ সহ
অবিরাম ; গুহামাঝে বিংশতিনয়ন
বিংশতি নয়ন মুদি নিগমন তথা
মহাধ্যানে, মহাযোগী ব্যোমকেশ যেন
অভ্রভেদি-গিরিরাজ-গুপ্ত-গুহামাঝে
সংজ্ঞাহীন, সুপ্রকাণ্ড গিরিখণ্ড প্রায়
সুস্থির, একাগ্রচিত্ত,-অস্থির যে শোকে।

কহিল বায়ুনন্দন নিকশানন্দনে,
"কি মন্ত্র জপিছ ওহে কহ লঙ্কেশ্বর!
যোগিবেশে, এ নির্জ্জনে ? আজ্ঞাকারী মোরা
রাঘবের, আজ্ঞা—পেয়ে তাই বিজ্ঞতম
আসিয়াছি তব সনে সাক্ষাৎ করিতে,
তৃপ্ত কর তপ্তপ্রাণ বাক্য-সুধা-দানে ;
পশু মোরা, নাহি জানি স্তুতি ও মিনতি—
কি মন্ত্রে ভাঙ্গিতে হয় যোগীন্দ্রের ধ্যান ;
করহ আদেশ, কিম্বা দাও উপদেশ
সঙ্কেতে, লঙ্কেশ এই কিঙ্কর নিকরে।

সারা নিশী ঋষিবর তব অনুধ্যানে
ভ্রমিতেছি অবিরাম অন্বেষণে তব,

ভাবিতেছি নটবর বিরাজিত আজি,
কোন্ রঙ্গভূমে, কোন্ অভিনয় তরে ?
অবশেষে দৈববশে পাইনু সন্দেশ
গুহায় পরমধন তপোধন-বেশে,
বিরাজেন ; বড়ভাগ্য ওহে মহাভাগ
লভিনু সে হারাধন আরাধন বিনা।
কিন্তু ওহে বকব্রতি, কি ব্রত সাধিতে
উদিত মুদিতনেত্রে গুপ্তগুহা মাঝে
সুপ্ত শার্দ্দুলের সম, নিরুত্তর যদি,
অবশ্য পুরুষকার করিয়া আশ্রয়
ভাঙ্গিব এ মহাধ্যান রক্ষোধন তব
অচিরে, হে রণজয়ি কহিনু তোমায়।
অতএব কহ কেন বৈরাগ্য মাখিয়া
রাজসুখ রাজভোগ রাজপরিচ্ছদ
সিংহাসন পরিজন পরিহার করি
ধরাসনে বঁধু, ধরি শুধু সাধু-বেশ !
বলনা, ললনা-বারি উদিত মানসে
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা দেবী কি দানবী,
মানবী অথবা, বাঁকী এই সৃষ্টি মাঝে
বৃষ্টি করিবারে তব প্রেমের উদ্যানে ?
তাই কি পেতেছ এই উর্ণনাভফাঁদ
পঞ্চবটীবনচারী ব্রহ্মচারী ভায়া !

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

সাম্য।

সমানীব আকূতিঃ সমানাহৃদয়ানিবঃ
সমানমস্তু বোমনো যথাবঃ সুসহাসতি।

(ঋগ্বেদ)

বহির্বিষয়িনী বেগবতী [illegible] আর্যযুগের মানবমণ্ডলী যখন মগ্নসুপ্তির অলসস্পর্শে অচেতনপ্রায় হইতেছিল, বিস্মৃতি যখন পূর্ণ আবেগে আপনার মহাপ্রসারের আবেষ্টনে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যগত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে অন্তর-রাজ্যের উচ্চতম সিংহাসন হইতে নামাইয়া কলুষকালিমায় কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যখন [illegible] মানবপ্রাণসমূহ মানবত্বের পবিত্রতম আদর্শ সম্মুখে না পাইয়া পশুত্বের পঙ্কিল আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে অতীতের সেই ঘনঘটাময়ী [illegible] "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া—জড়বাদের সেই অভ্রভেদী বৈজয়ন্তীকে [illegible] করিয়া, প্রচুর কামনাবহ্নি-বিক্ষিপ্ত তৃষিত বিশ্ববাসীর অন্তঃপ্রদেশে মধুর উৎস ঢালিয়া দিয়া, ত্রিদিব ও মর্ত্ত্য বিমোহিত করিয়া ভারতীয় তাপস-নিকুঞ্জে একদিন সাধনপূত ঋষিকণ্ঠে করুণ-স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল—

অপাম সোমমমৃতা অভূম অগন্মজ্যোতিঃ অবিদাম লোকান্

(ঋগ্বেদ)

আমরা সোমপানে অমৃত হইয়াছি, অমৃত [illegible] লাভ করিয়াছি। হে অমৃতের পুত্রগণ! এ আলোকে তোমাদেরও স্থান রহিয়াছে। এযে অনন্ত-অমৃতের অনন্ত উৎস; ইহা লাভ করিলে মানব অমৃতময় হইয়া যায়। আইস, মহাআনন্দের চিরন্তন অধিকারী হও; নিরানন্দে আর ডুবিয়া থাকিও না—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত

উঠ, জাগ, মহাজনপথের অনুসরণে কৃতার্থ হও। কাম্যকর্ম্মের ভীষণ কোলা-হলের মাঝে সে সাম্যের বীণা—আবার সমতার স্বরে জিঘাংসাতাড়িত ভেদনীতি-পরায়ণ বর্ত্তমানৈকসর্ব্বস্ব জড়বিশ্বকে সাদরে আহ্বান করিল। মানব-মনীষা-কাশে আধ্যাত্মিক গৌরবরবির পরমশুভ প্রাথমিক উন্মেষলগ্নে পরমকারুণিক সৌম্যমূর্ত্তি বৈদিক ঋষিগণ, ব্যষ্টির গূঢ় হৃদয়তলস্থ সুপ্তিমগ্ন মহাসমষ্টির সুপ্ত-চেতনা জাগরিত করিয়া ক্ষুদ্রে, মহত্তে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, জীবে, শিবে, জড়ে চৈতন্যে এক অচ্ছেদ্য মধুর একতার মহান্ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলেন।

সে উদাত্তগম্ভীর রবে ত্রিদিব স্তম্ভিত হইল। সে আশ্বাসের বাণীতে তৃষিত মর্ত্ত্য পরিতৃপ্ত হইল—জড় বিশ্বে চৈতন্যের অনুব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বে মানব বুঝিল, স্বর্গে দেবতা বুঝিলেন, এ অমৃতনিঃস্যন্দিনী বীণার অমৃতময়ীতন্ত্রী কোনও অলক্ষ্য শিবময় করে ধৃত হইয়া রহিয়াছে। কে ইহার পরিচালক। ঋগ্বেদের ঋষিগণ গাহিলেন—

সমানীব আকূতিঃ, সমানাহৃদয়ানিবঃ
সমানমস্তু বোমনো যথাবঃ সুসহাসতি।

হে মনুষ্যগণ! তোমাদের সকলের অভিপ্রায় এক হউক। তোমাদের হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা বিভিন্নতা ভুলিয়া যাও, এ আপাততঃ বহুত্বের মধ্যে যে একত্বের পূর্ণাভিব্যক্তি দেদীপ্যমান, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণা কর।

মানব! এই অন্তর্নিহিত বিরাট্ একত্বই তোমাদিগের অস্তিত্বের নিয়ামক। ইহাকে বিস্মৃত হইও না, বিস্মৃত হইতে পারিবে না। সুষুপ্তির পর চেতনা আবার ফিরিয়া আসিবেই। তোমরা ভুলিয়া থাকিলেও এ মহৎ একত্বের সত্তা নীরব হইয়া থাকিবে না। একদিন তাহার ঐ বিশালবক্ষে একত্বের সাম্যরোলে, তোমাদের ধ্যান, তোমাদের জ্ঞান, তোমাদের লক্ষ্য এক করিয়া তুলিবেই—সেদিন তোমাদিগের নিকট পার্থিব জগৎ মধুময় হইয়া উঠিবে। পার্থিব ধূলিকণায় স্বর্গীয় মন্দারকেণুর অনুভূতি পাইবে। তোমরা অবাক্ হইয়া দেখিবে—

অসংখ্য নামরূপের সংখ্যাতীত মুক্তারাজি একই নিয়ন্তৃত্বসূত্রে মালিকার মত গাঁথা রহিয়াছে, বস্তুতঃ একের সহিত অপরের কিছুমাত্র মৌলিক বিভিন্নতা নাই। তরঙ্গ, ফেন, বীচিমালাদি যেমন জলেরই স্বরূপ, উহাদের উৎপত্তিতে, অবস্থানে, বিলয়ে, আদি, মধ্য, অন্তে, জলই যেমন উহার একমাত্র সত্তা, জল ভিন্ন যেমন উহারা কল্পনায়ও অসম্ভব, তেমনি অসীম একত্বে, বিরাট্ চৈতন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি, মধ্য, অন্তের—প্রকাশের অবস্থানের ও বিলয়ের অসংখ্য নামরূপ বুকে লইয়া অনাদি আবহমানকাল একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। হে মানব! তোমার অন্তস্তলশায়িত শাশ্বত পরদেবতাকে চিনিতে চেষ্টা কর—তাঁহারই শরণাপন্ন হও—তাঁহাকেই দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে প্রয়াস পাও; বিশ্ব তোমাদের আপন হইয়া যাইবে—ভেদনীতির ভৈরববৃক্ষ বিক্ষিপ্ত চিত্তভূমে আর বহুত্বের ক্ষুদ্রবীজ বপন করিতে পারিবে না।

যতদিন ইহাকে চিনিতে না পারিবে—ততদিন—ততকাল—ততযুগ—তোমার

যেইই আপন হইবেনা—ততদিন জগতের আপন—জগদীশ্বরের আপন হইয়াও হে আত্মতৃপ্ত! তুমি ভতৃপ্তবাসনাস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত অকূল সাগরে ভাসিয়া যাইবে—কিছুতেই কূল পাইবে না। তুমি তোমার নিকট, বিশ্বের নিকট, বিশ্বের দেবতার নিকট দিন দিন 'পর' হইয়া উঠিবে। ঐ শুন, অন্তস্তলবাহিনী মন্দাকিনীর [illegible] তোমার শ্রবণ-পথে-কি এক মধুর বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিতেছে। তুমি বিস্মৃত হইয়াছ, তাই বুঝিতে পারিতেছ না—এ মধুর ললিতগলিত রব যে তোমারই স্বভাবগীতি, ভাই!

এ স্বয়মাগত অনাহত বংশীধ্বনি অনাদিকাল জীবহৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে চৈতন্যের মূর্ত্তিমতী মূর্চ্ছনা জাগরিত করিয়া দিতেছে—এ স্বর পরিকম্পন অন্তররাজ্যে বিপুল পুলকস্পন্দন জাগাইয়া আবার অন্তরেই মিশিয়া যাইতেছে! হে মানব! তোমার বিষয়বিমুগ্ধ লৌহময় হৃদয়দ্বারে বার ২ তাহার শুভাগমন ব্যর্থ হইয়া গেল, তবু তাহার বিরাম নাই—সহস্রবার উপেক্ষিত হইয়াও সে আবার আসিয়া বলিতেছে—

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়োঽ
সকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ
বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥
নমে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ
নধর্ম্মো নচার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

কোন্ দুর্ভেদ্য আবরণে হে মানব! তোমার এই সুখময়স্বরূপ আবরিত হইয়া গেল—কে তোমার একত্বের সার্ব্বভৌম শাশ্বতক্ষেত্রে বহুত্বের বিষময় বীজ রোপণ করিয়া স্বর্গীয় নন্দনকানন নরকের তীব্রপূতিগন্ধময় অন্ধতামসাবৃত লৌহগহ্বরে পরিণত করিয়া দিল—একবার তাহা অনুসন্ধান কর।

বৈদিক ঋষিগণের এ সাদর সম্ভাষণ প্রাচীনতম যুগের মানবপ্রাণ উ[illegible] পারিল না। [illegible] সত্যের অমোঘস্পন্দন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির [illegible] প্রসুপ্ত মহাসত্যের এক শুভময় উন্মুখাবস্থা আনিয়াদিল। [illegible] অনুকূল-বায়ু জ্ঞানময় মহাব্যোমে বিশ্বহিতে স্পন্দিত হইয়া ধীরে ব্যষ্টিকেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িল। প্রকৃতির ক্রোড়গত, অলস-নিদ্রা-লুলিত

বিচেতন মানবচিত্তে প্রাথমিক পৌরুষেয় বোধপ্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিল। উচ্চকল্পনার নবীন উন্মেষ-প্রভাতে মানব বুঝিল, যে নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে শান্তির সুখময় ক্রোড়ে অনন্তবিশ্রামলাভ সুদূরপরাহত। প্রতি আঁধারের হৃদয়দেশে বিরাট মুক্ত-চৈতন্যের পূত আবাস নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; চৈতন্যনিরপেক্ষ এ আঁধার গুলির কোনই সত্তা নাই। জড়সংস্পর্শে জীব তাহার সূত্র-চৈতন্যের সার্ব্বভৌমিকত্ব যতই বিস্মৃত হয়—ততই তাহার উপর জড়ীয় প্রভাব আপন প্রসার বিস্তার করিতে থাকে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত স্বভাব-প্রচ্যুত জীব তখন ইন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগে প্রাকৃতিক-গুণানুপ্রেরণায় আত্মোপলব্ধিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয়েরই বশীভূত হইয়া পড়ে। এই "বশীভবন"ই যাবতীয় দুঃখের একমাত্র কারণ।

ঋষিহৃদয়াগত স্বচ্ছ জ্ঞানালোকে বিশ্বমানব একথা বুঝিতে পারিল। তাহারা প্রতিহৃদয়নিহিত জীব-চৈতন্যের একত্ব অমৃতত্ব অবগত হইয়া যুক্তস্বরে গাহিল—

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি-পবমান! অমৃতলোকে।

৯। ১১৩। ৭

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে
যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মামমৃতং কৃধি।

৯। ১১৩। ১১ ঋগ্বেদ।

"যে লোকে অজস্র অমৃতজ্যোতি ক্ষরিত হইতেছে, সেই অমৃতলোকে আমাকে লইয়া চল।"

"যে লোকে মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ অবস্থান করে, যে লোকে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া যায়, সেই অমৃতলোকে আমাকে অমর কর।" মনের চিন্তা যতই উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিল, ততই তাহারা সংশয়শূন্য হইয়া জ্ঞাননেত্রে দেখিতে লাগিল—

"হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরীক্ষসৎ
হোতা বেদিষৎ অতিথির্দুরোণসৎ
নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ।

(হংসবতী ঋক)

সূর্য্য বায়ু অগ্নি ইহারা এক ঋত (ব্রহ্মসত্তা) ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার এই ঋতসত্তাই (নৃবৎ) মানব-হৃদয়ে জীবচৈতন্যরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলের গূঢ়তম প্রদেশে ব্রহ্মযজ্ঞের অগ্নিমধ্যে, গতিশীল বায়ুর অন্তর-প্রদেশে এই ঋত সত্যই সত্তারূপে বিরাজমান। এই ব্রহ্মসত্তাই সমুদ্রে অগ্নিরূপে, উদয়াচলে সূর্য্যরূপে, আবার ইনিই শশিসূর্য্যাদির কিরণরূপেও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই ঋত ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র মহাসত্য। ইনিই বিশ্বের ঋত অর্থাৎ একমাত্র অধিষ্ঠান-ভূমি।

সূক্ষ্মাস্তর্দৃষ্টির গভীর গবেষণা আদিযুগের মানবমণ্ডলীকে এই ভাবে আত্মিক-জ্ঞানের এক অভিনব অরুণোদয়ে বিরাট একত্বের দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত করিয়া দিল—চিরন্তন সত্যের "একমেবাদ্বিতীয়ং"-বিজয়গৌরবে বহুত্বের অবসান হইয়া গেল। একত্বের বিশাল পক্ষপুটে ক্ষুদ্রত্ব লজ্জে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল। "বসুধৈব-কুটুম্বকম্" প্রেমের আলিঙ্গনে ভেদনীতিমূলক হিংসাদ্বেষের অবসান হইল। স্বভাবস্থ মানব সবিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে দেখিল—অবাঙ্-মনসোগোচর অচ্ছেদ্য অদাহ্য, তাহার সুখময় স্বরূপ কি মধুর! সে আরও দেখিল—তাহারই অন্তঃসত্তা গ্রহ-নক্ষত্রের অভ্যন্তরে, হিমানীর শীতবক্ষে, শ্যামলা ধরিত্রীর হরিৎতৃণরাজিপরিকম্পিত পুলকোচ্ছ্বাসে, অভ্রভেদী হিমাদ্রির প্রতি শৃঙ্গে শৃঙ্গে, মহাসাগরের প্রশান্ত উদারবক্ষে, মুকুলোদ্গমযুক্ত পল্লবপরি কম্পমান মলয়ানিলে, সর্ব্বত্রই সুকৌশলে আপন আবাস রচনা করিয়া রহিয়াছে—

এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।

এক আত্মাই সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন। যেমন এক চন্দ্রই চঞ্চল জল-মধ্যে বহু চন্দ্র বলিয়া প্রতীত হন, সেইরূপ একই আত্মা প্রতি দেহাধারে পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ (ইত্যাদি শ্রুতি)

এই আত্মাই দ্রষ্টব্য, ইনিই একমাত্র শ্রোতব্য, ইনিই একমাত্র অন্বেষণীয়—

অনয়া বৃতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-
দুঃখিত্বাদি-সংসারসম্ভাবনাপি ভবতি
যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা।

(বেদান্ত)

জ্ঞাতব্য বস্তু অজ্ঞানে আবৃত হইলে, তাহাতে কোন এক বিপরীত জ্ঞান

উৎপন্ন হইবেই। অজ্ঞানাবৃত রজ্জুতে যেমন সর্পরূপ কল্পিত দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞানাবৃত আত্মাতেও সুখিত্ব, দুঃখিত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে—

অজ্ঞানন্তু, সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি
ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদন্তি (বেদান্ত)

অজ্ঞান এক প্রকার জ্ঞাননাশ্য অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। তাহা ভাব ও অভাব দুই এর বহির্ভূত ত্রিগুণাত্মক যাবতীয় দুঃখের জনক।

যয়া সম্মোহিতো জীবঃ
আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং
পরোপি মনুতেঽনর্থং
তৎ কৃতং চাভিপদ্যতে।

জীব স্বয়ং চিরমুক্ত হইলেও এই মায়ায় মোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে এবং মায়ার ত্রিগুণাত্মক ধর্ম্ম-সংস্পর্শে আপনাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, ইত্যাদি মনে করিয়া অশেষ দুঃখ পাইতে থাকে।

নদ্যাং কীটাইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাপ্যতে
ব্রজন্তো জন্মনোজন্ম লভন্তে নৈবনির্বৃতিম্
(বেদান্ত)

যেমন নদীর আবর্ত্তে পতিত কীট সকল এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়, কোনরূপেই উত্তীর্ণ হইয়া সুখলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানবিমূঢ় জীব কার্য্যাকর্ম্মের প্রবল প্রবাহে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে থাকে, বিশ্রামসুখ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যতদিন জীব তাহার একত্ব ও নিত্য নির্ম্মুক্ত স্বরূপ অবগত হইতে না পারিবে, ততদিন এ ক্ষুদ্রত্বের বহুধা বোঝা শিরে লইয়া, অজ্ঞাননিয়মিত প্রহেলিকাময় দীর্ঘ কুটিল পথে তাহাকে ঘুরিতেই হইবে।

"ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্"

জন্ম জন্ম এই দুঃখের গতাগতিতেই কাটিয়া যাইবে, শান্তি নিকটেও আসিতে পারিবে না।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।
অনন্ত অচল স্থির সমুদ্রের সনে,
জলরাশি ধীরে ধীরে মিশিছে যেমন,
তেমনি অনন্ত আত্মা স্থির অবিচল,
কামনা বাসনা যায় তাহাতে বিলয়,
সেই মাত্র লভে শান্তি কামী নাহি পায়।

যে আপন মহান্ স্বরূপ অবগত হইতে পারে নাই, যাহার হৃদয় সাম্যের স্বচ্ছ বিমল আলোকে আলোকিত হয় নাই, তাহার পক্ষে এ শাশ্বতী শান্তির সুখময়ী আশা কুশার স্বপ্নমাত্র।

সাম্যের দেবতা ঞ্রবসত্যের বেদবাণীর অভ্যন্তরে উপনিষদের অমৃত-নিস্যন্দিনী দুগ্ধধারায় দর্শনের সুসুক্ষ জ্ঞানালোকে, তন্ত্রের মাতৃমন্ত্রে যমুনা-স্পর্শী শীতল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে পরিকম্পিত কুসুমিত বনভূমে গোপী-কুলবিমোহনচাতুর্য্য-বংশীনিনাদে, পূণ্যতোয়াভাগীরথীর কূলে ছিন্নকন্থা-পরিধৃত আবেশ-আকুলিত ঊর্দ্ধভুজযুগে "আয় আয়" বলে, আরবের উত্তপ্ত মরুভূমে, হিমানীর শীতশুভ্র বক্ষাসনে, যুগে যুগে একই একত্বের মহান্ শ্লোষ জাগাইয়া, জড়ে, চৈতন্যে জীবে শিবে মহতে ক্ষুদ্রে "সাম্যে" মৈত্রীর সুখাসন পাতিয়া গিয়াছেন। আবার বিধাতার এ প্রবোধন-ক্রিয়া লোক-নয়নের অদৃশ্যে কৃতিষ্ট একমাত্র অস্তিত্বের পরিচায়করূপে নীরবে প্রকৃতির অনুকূলে নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে, মানব তাহা বুঝিতেও পারিতেছে না। সেথায় কার্য্য আছে, কোলাহল নাই, বিশ্বহিতে মহাত্যাগের মহাযজ্ঞ অনু-ষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু যজ্ঞের কৃষ্ণধূমে অনন্ত আকাশের অনন্ত নীলিমার স্থান-ভেদও আচ্ছাদিত হইতেছে না—যজ্ঞাগ্নিতে সহস্র ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতেছে কিন্তু সে পূত ব্রহ্মাগ্নি স্থির, অবিচল, প্রশান্ত নির্ম্মল, নির্ব্বাক্—বিন্দুমাত্রও ধূম উদ্গীরণ করিতেছে না। মানব! সহায় খুঁজিতেছ, সহায় পাইবে, নিঃস্ব হইয়াছ, পাথেয় পাইবে,—এমূর্ত্ত পবিত্রতার অনুসরণ কর। সে আশীর্ব্বাদ-বাণী—সে অযাচিত করুণা—সে বিগলিত কারুণ্যের নিয়তবিনির্গত অশ্রুধারা জগতের প্রতিধূলীকণায়, বনান্তরালবর্ত্তী মিলনলোলুপ দিগ্বলয়ের প্রতি আকুল মিলন-স্পন্দনে, জীবহৃদয়ের প্রতিনিঃভৃতপ্রদেশে অনন্তব্যোমের অন্তঃসত্তায়, বাতাসের স্পর্শে, তেজের রূপাভিব্যঞ্জনায়, শৈত্যের শীতকণায়, কাঠিন্যের কঠিনতায় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যুগাবতারের অবতরণ ব্যর্থ হইবার

নহে; তাঁহাদের সে মধুময় অভয় আহ্বান আজও জীবের শ্রবণপথে ধ্বনিত হইতেছে। মানব যতই জড়বাদের অন্তস্তলে বৈষম্যের উচ্চকোলাহলে আত্ম-বিস্মৃত থাকুক্, না কেন, তাহার অন্তস্তলশায়িত বিরাটসত্তা আবার এক শুভলগ্নে জাগরিত হইয়া তাহাকে সাম্যের পথে বিশ্ব ও বিশ্বের দেবতার সহিত এক করিয়া দিবেই—

সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ
সমানমস্তু বো মনো যথাবঃ সুসহাসতি

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।

ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-নির্ব্বাচন।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দায়িত্বপূর্ণ-শাসনযন্ত্রপ্রতিষ্ঠার যে উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে অনেক আনুষ্ঠানিক নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা সংক্ষেপে এই নূতনত্বের কথা বলিব।

আমাদের বুঝিতে হইবে, "দায়িত্বপূর্ণ শাসন" কাহাকে বলে? "দায়িত্বপূর্ণ শাসন" বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদের বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির আলোচনা করা দর-কার। এখন ভারতে আমরা স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদ্বারা শাসিত হই। ঐ রাজকর্ম্মচারীরা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার প্রাদেশিকসভার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার পরিষৎ, সমগ্র ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার কাউন্সিল্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন। রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার কাউন্সিল্ আবার ইংলণ্ডস্থ সেক্রেটারীর অধীনতায় কার্য্য করেন, ঐ সেক্রেটারী ও ইংলণ্ডস্থ পার্লামেণ্ট মহাসভার নির্দেশমতে কার্য্যব্যবস্থা করেন।

পার্লামেণ্ট প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—এক জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সভা বা জনসাধারণ-সভা, অপর অভিজাতসভা। জনসাধারণসভাকে "হাউস্ অব্ কমন্‌স্" বলে, আর অভিজাতসভাকে "হাউস্ অব্ লর্ডস্" বলে। ইহার উপরে আর এক শক্তি আছে, সে রাজশক্তি। "কেবল হাউস্ অব্ কমন্‌স্" বা

"হাউস্ অব্ লর্ডস্" অনুমোদন করিলেই কোনও বিধান কার্যাকারী হয় না। রাজসম্মতি চাই।

ইংলণ্ডের মূলশাসন-যন্ত্রে এই ত্রিশক্তির সমন্বয় আছে—সাধারণপ্রতীতি এইরূপই বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ধারণা হয় যে, জন-শক্তিই উহার সর্ব্বেসর্ব্বা। "হাউস্ অব লর্ডস্" বা অভিজাতসভা, "হাউস্ কমনস্" বা জনসাধারণসভার কাছে দুর্ব্বল। অভিজাতসভা যদি জন-সাধারণ সভার অনুমোদিত কোনও বিধানের পাণ্ডুলিপী পর পর তিনবার পরিত্যাগ করেন, পাশ না করেন, তবে জনসাধারণসভার সমর্থন-বলে ও রাজানুমোদিত হইলে, উহা বিধান-রূপে পরিণত হয়। জনসাধারণসভা কর্তৃক অনুমোদিত সমর্থিত হইলে, রাজা, অভিজাত-সভার অননুমোদিত বলিয়া ঐ পাণ্ডুলিপী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ, জন-সাধারণের অভিমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় রাজ্যের অকল্যাণের আশঙ্কা, সুতরাংই রাজা জনমতের সম্মান রক্ষা করিতে প্রস্তুত হন। এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শাসন-ব্যাপারের মূলকর্তৃত্ব ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত, কেননা তাঁহাদেরই প্রতিনিধিবর্গ জনসাধারণসভার সভ্যরূপে পরম্পরায় ভারতের ভাগ্যযন্ত্র নিয়-ন্ত্রিত করেন।

ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য ভারতীয় জন-সাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ভারতীয় প্রজারা ভারতের রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; তাঁহারা অধস্তন রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য অন্যায় মনে করিলে ঊর্দ্ধ-তন কর্ম্মচারীর নিকট প্রতীকারার্থে আবেদন করিতে পারেন। রাজপ্রতি-নিধির কার্য্য বা ব্যবহার অনুচিত মনে হইলে, ইংলণ্ডের জনসাধারণসভায় তাহার প্রতীকারের জন্য আবেদন নিবেদন করিতে পারেন। কিন্তু, নিজেরা একজন কর্ম্মচারীকেও শাসন করিতে বা পদচ্যুত করিতে সমর্থ নহেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষ হইতে বহুসহস্র মাইল দূরে অবস্থান করিয়া ভারতীয় ব্যাপারের যথার্থ রহস্য বুঝিতে পারেন না। ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকেরই জ্ঞান অল্প, সেই অল্পজ্ঞানও রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে লব্ধ। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা ব্যবস্থা, কার্য্যকলাপ, প্রকৃতি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের জ্ঞান যে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ—অবস্থাবিশেষে বিসদৃশ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান

লইয়া বহুযোজন দূরে সাগরপারে থাকিয়া যে নানাভাবের বহুকোটি মানবের সুশাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়না—একথা বলাই বাহুল্য। মোটকথা, ভারতশাসন ভারতবাসীর হস্তে নহে, ইংলণ্ডবাসীর হস্তে অর্থাৎ ইংলণ্ডের শাসকবৃন্দ যেমন তত্রত্য জনসাধারণের নিকট স্বীয় স্বীয় কার্য্যের জন্য দায়ী ও তিরস্কার-পুরস্কারের ভাজন, ভারতের শাসক-বৃন্দ তেমন ভারতীয় জনসাধারণের কাছে স্ব স্ব কার্য্যের জন্য দায়ী নহেন—অথচ তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যের জন্য ভারত সম্বন্ধে অনেকাংশে অনভিজ্ঞইংলণ্ডীয়জনসাধারণের নিকট দায়ী—ইহাই ভারতের প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির বিশেষত্ব ও ইংলণ্ডীয় শাসনের সহিত ইহার এই খানেই আকাশপাতাল ব্যবধান।

অতঃপর এই পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে জনসাধারণের যেমন তত্রত্যশাসন-যন্ত্রের যথার্থ পরিচালক, তত্রত্য রাজকর্ম্মচারিগণ যেমন তাঁহাদের নিকট স্বীয় কার্য্যের জন্য দায়ী ও তাঁহাদের দণ্ডপুরস্কার-ব্যবস্থার অধীন,—ভারতেও যদি তদ্রূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ভারতের সম্পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন প্রবর্ত্তিত হইল, মনে করা যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে যে দায়িত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে, আংশিক। শাসনযন্ত্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কতিপয় বিভাগের বা অংশের ভার ভারতবাসীর হস্তে ন্যস্ত হইতেছে মাত্র, অন্য সমস্ত অংশই পূর্ব্ববৎ সুদূরস্থ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে থাকিতেছে। ইহাও আপাততঃ পরীক্ষা করা হইতেছে। যদি ভারতীয় জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে যোগ্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে পারেন, আর সদস্যেরা নিজেদের মধ্য হইতে যোগ্য মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা উত্তমরূপে ঐ সকল বিভাগের উপযুক্ত পরিচালন বা উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তবে পরে আরও অধিক সংখ্যক বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভারতবাসীর হস্তে ন্যস্ত হইবে—এবং ক্রমে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর যদি জনসাধারণের নির্ব্বাচনশক্তির অপব্যবহার হয়, অনুপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হয়, তাহার ফলে উপযুক্তরূপে শাসনযন্ত্র-পরিচালনের ব্যাঘাত ঘটে, কর্ত্তৃত্বের অপব্যব-হার হয়, তাহা হইলে লব্ধ অধিকারে বঞ্চিত হইতে হইবে। দেশবাসীর সম্মুখে গুরুতর সমস্যা সমুপস্থিত।

যে সমস্ত বিভাগের কর্ত্তৃত্ব দেশবাসীর হস্তে প্রদত্ত হইতেছে, সে সমস্ত বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইতেছেন দেশবাসী। সে সব বিভাগের

রাজকর্ম্মচারীরা জনসাধারণের কাছে—তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কার্য্যের জন্য দায়ী এবং তাঁহাদের বিচার-বিবেচনা অনুসারে নিগ্রহ অনুগ্রহ পাইতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাই পরিবর্ত্তনের মূল তত্ত্ব।

ভারতীয় জনসাধারণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় জাতীয়মহাসমিতি বা কংগ্রেসের মারফতে এই অধিকারের জন্য আবেদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলিয়া আসিতেছেন যে—"ভারতবাসীর কাছে যাহাতে শাসকেরা দায়ী থাকেন—এরূপ ব্যবস্থা হউক্। দেশবাসীরা যাহাতে রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্যের অন্যায় ন্যায় বিচার করিয়া দণ্ড পুরস্কার দিবার অধিকারী হন—সেরূপ ব্যবস্থা হউক্।" দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশবাসীরা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের ন্যায্য-দাবী জানাইয়া আসিলেন। শাসকজাতির কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু ফল হইল না। রাজকর্ম্মচারিগণের মুখে তাঁহারা শুনিলেন—"ভারতবাসী দায়িত্বমূলক শাসনাধিকারের যোগ্য নহে। তাহারা দেশশাসনে অসমর্থ।" শিক্ষিত ভারতবাসী, গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন "আমরা শাসন-যন্ত্র-পরিচালনে সম্পূর্ণ সমর্থ।" শাসকজাতি কর্ম্মচারীবর্গের কথায় বিশ্বাস করিলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীর বাক্যে আস্থাস্থাপন করিলেন না। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, ভারতবাসীর আন্দোলনও চলিতে লাগিল। কিন্তু অজ্ঞতার কুজ্ঝটিকা আর কাটিল না। অকস্মাৎ ইউরোপে মহাসমর সংঘটিত হইল। নানাকারে ভারতবাসীর যোগ্যতার আংশিক চিত্র ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইল। সেদিক দেখিয়া, শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংলণ্ডবাসী বলিলেন—"ভারতবাসীগকে দেশশসাসনে কিঞ্চিৎ অধিকার দেওয়া হউক্। যদি তাঁহারা যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, ক্রমে অধিকার বৃদ্ধি করা হইবে, আর শাসনে ভারতবাসীর অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইলে, তাঁহাদের চীৎকার যে নিরর্থক—তাহাই অবধারিত হইবে।" ইংলণ্ডের সেই অঙ্গীকার সম্প্রতি প্রতিপালিত হইতেছে। ইহাই বর্ত্তমান-শাসন-সংস্কার বা আংশিক দায়িত্বমূলক-শাসন-প্রবর্ত্তন।

এই ব্যাপারে যশোহরের অধিবাসীরা বঙ্গের প্রাদেশিক-ব্যবস্থাপক সভায় দুইজন মুসলমান সভ্য ও দুইজন হিন্দু সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদের সমাদর কেন, বুঝি না। পূর্ব্বে এদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে জাতিভেদে ধর্ম্মভেদে অনুষ্ঠানভেদ ছিল না। ইংরেজ জেতা, এদেশবাসী জিত। জেতার জাতি, জিতের জাতি অপেক্ষা স্থল-বিশেষে

বিশেষ বিশেষ অধিকার পাইতেন, কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে অধিকারের তারতম্য বড় একটা দেখা যাইত না। বর্ত্তমানে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাহা হয় হউক, প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু এরূপ নির্ব্বাচন হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের সহায় নহে। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লক্ষ্যগত বা কার্য্যগত ভেদ থাকা সঙ্গত নহে। ফলতঃ ভেদ যতই বিস্তার লাভ করিবে, ততই শাসন-সংস্কারের সাফল্যে বাধা পড়িবে। পুলিশ, বিচার, শাসন, সৈনিক প্রভৃতি অত্যাবশ্যপ্রয়োজনীয় বিভাগ গুলি ভারতবাসীর হাতে আসে নাই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতিতে ক্ষমতাপরিচালনের বিশেষ কিছুই নাই; বিশেষতঃ এ সমস্ত বিভাগের উন্নতিসাধনে অর্থের অপেক্ষা আছে—আবার এই দীর্ঘকাল ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃত্বে অবস্থিত থাকায়ও এই সকল বিভাগের যথোচিত উন্নতি হইতে পারে নাই, সুতরাং কতিপয় অনুন্নত অথচ যাহাদের উন্নয়ন বহুব্যয়সাধ্য—এরূপ বিভাগের ভার পাইয়া ভারতবাসী বিশেষ কিছু পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। হিন্দু মুসলমানের নির্ব্বাচন স্বতন্ত্র হইবে, হউক, কিন্তু নির্ব্বাচিত হিন্দু-মুসলমান্ সদস্যগণ একযোগে ভারতবাসীর যোগ্যতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত না হইলে, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে—ভবিষ্যৎ অধিকতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

দেশবাসী যাহা পাইয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহারের উপর এদেশের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে, কেননা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সকলের মূল। এই দুই বিভাগের উন্নতি না হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন মৃতপ্রায় লোক দেশের—দশের, এমন কি, নিজেরও কিছুই করিতে পারে না। বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, দেশবাসী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যভার পাইয়াছেন।

সদস্যনির্ব্বাচনের অধিকারী কাহারা, একথাও এখানে বলা দরকার। যাঁহারা বার্ষিক অন্যূন ২৲ চৌকিদারী ট্যাক্স দেন, যাঁহারা বার্ষিক অন্যূন ১৲ রোডসেস্ দেন, আর যাঁহারা বার্ষিক অন্যূন ১৷৹ মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেন, তাঁহারা সকলেই সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকারী। মুসলমানেরা দুইজন মুসলমান প্রার্থীকে ২টী ভোট্ দিতে পারিবেন। হিন্দুরা দুই জন হিন্দুকে ২টী ভোট দিতে পারিবেন। প্রত্যেকে ইচ্ছা করিলে একটী ভোট্ একজন প্রার্থীকে দিয়া

অন্যটী হাতে রাখিতে পারিবেন—অর্থাৎ কাহাকেও না দিয়া নষ্ট করিতে পারিবেন। কেহই একজনকে একাধিক ভোট্ দিতে পারিবেন না।

যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিলে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূতি বিষয়ে যে প্রার্থীর জ্ঞান অল্প, স্বাধীনচিন্ততা বা নির্ভীকতা যাহার নাই, যে অলস, বিলাসী, যে দেশের দশের বিপদে কখনও সাহায্য করে নাই, যাহার শ্রমে অভ্যাস নাই, দেশবাসীর দুঃখদৈন্যে যাহার সান্ত্বনা-বাণী কখনও শুনা যায় নাই, সেরূপ প্রার্থীকে ভোট্ দিলে, দেশের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আহ্বান করা হইবে। যে প্রার্থী যোগ্য, বিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা, কর্ম্মদক্ষ, শ্রমশীল, পরোপকারী, জনসাধারণের বিপদের বন্ধু সম্পদের সহায় ও স্বদেশভক্ত—এমন লোককে ভোট্ দিলে দেশের মঙ্গল। তারতম্য বিবেচনা করিয়া, ভাবিয়া দেখিয়া, কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভয়ে, লোভে, চক্ষুলজ্জায় অনুপযুক্ত প্রার্থী নির্ব্বাচন করিলে অধিকারের সদ্ব্যবহার হইবে না। অবিমৃষ্যকারিতার ফলে নিজেদের সর্ব্বনাশের সূচনা করা হইবে। সাধু সাবধান!

শ্রী——

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম দেখুন, ধর্ম্ম কথাটীর উদ্দিষ্ট কি? ধর্ম্মের মূলই ভগবান্। তাঁর প্রতি ভক্তিমতি না হইলে ধর্ম্মই হইবে না। তার পর "স্বনুষ্ঠিতঃ" উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত, তাহাও আবার যথাযথ, অণুমাত্র বিকলাঙ্গ নহে,—এমত যে ধর্ম্ম, তাহার আচরণ করাও পণ্ডশ্রম মাত্র সার হইবে, যদি সেই ভগবানের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন না হয়। তণ্ডুলার্থীর তুষাবঘাতবৎ ভগবদনুরাগশূন্য ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল শ্রমসার। অতএব ভগবানে অনুরাগ উৎপাদনের জন্য সততই প্রযত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাহার আনুকূল্য-প্রকাশের সহায় যে কোন ব্যক্তিই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সুহৃৎস্থানীয়, সন্দেহ নাই। এজন্য ইহাই জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠকর্ম্ম ও মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায়। ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মের যে দশটী লক্ষণ উক্ত আছে, তাহার

এক একটী গুণ অর্জ্জন করিতেও মনুষ্যের বহুজন্ম গত হইয়া যায়। তাহার পর চিত্তশুদ্ধি। তাহার পর বিশ্বাস, তাহার পর শ্রদ্ধা, তার পর আসক্তি, তাঁহার পর সাধুসঙ্গ, তাহারপর ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন, তাহারপর অনুরাগ। দেখুন, এতদূর পৌঁছিতে জীবের কত জন্ম গত হইয়া যায়। কৃপাসিদ্ধশক্তিগণ, একই জীবনে সমস্ত সোপান অতিক্রম না করিয়াও অমানুষিক শক্তিবলে উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। যাঁহার কৃপায় বোবা কথা বলে, পঙ্গু, গিরিলঙ্ঘন করে, সেই শ্রীমাধবের কৃপালাভ হইলে আর প্রার্থিত কি অবশিষ্ট থাকে? শান্তিসুখ পাব বলে চেষ্টার ত্রুটি কিছুই করি নাই। ক্ষুদ্র-প্রাণে অনন্ত অবিতৃপ্ত কামনা, তাহা পূর্ণ হইবার নহে, তবুও শান্তিসুখ পাবার আশায় কিছুই বাঁকী রাখি নাই, কিন্তু, কিছুতেই তাহা পাই নাই। তবুও অতৃপ্ত মন যেন তৃপ্তির জন্য কিছু চায়। কি চায়? সুখ ও শান্তি। জগতে যাহা পাইয়াছে, সেই পার্থিব সুখশান্তিতে আশা বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তখন বিষন্নমন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হয়। শাস্ত্র বলিয়া দিল "যং লব্ধা নাপরং লাভং মন্যতে চাধিকং ততঃ" "যল্লব্ধা লোকঃ তৃপ্তোভবতি অমৃতো-ভবতি"। তখন মন জিজ্ঞাসা করিল, —"সে বস্তু কি?". উত্তর হইল "ভগবান্"— তদবধি নির্দ্দোষসুখপ্রত্যাশায় মন ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনে তৃপ্তি অনুভব করিতেছে, আশ্বাসও পেয়েছে। সেই প্রাণস্পর্শী আশ্বাসবাণী। শুনুন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশোগৃণন্।
সদ্য এব প্রমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং॥

এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া যদি কেহ অবশ ইন্দ্রিয়েও ভগবানের নাম গ্রহণ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎই ভববন্ধনমুক্ত হয় এবং যম-ভয়শূন্য হয়। যেহেতু স্বয়ং কৃতান্তও যাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া থাকেন। ভগবন্নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, মহাপাতকী অজামীল মৃত্যুকালে যমদূত-দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, "বাবা নারায়ণ! আমি বড় ভয় পেয়েছি আমায় রক্ষা কর।" এমনি নামের শক্তি যে, নামের মহিমায় মহাপাতকী কৃতান্তকবলমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিল। অনন্ত ভগবানের নাম যদি কেহ শ্রদ্ধায় বা হেলায়ও কীর্ত্তন করে, তবে সেও ভববন্ধন মুক্ত হয়। ভগবানের নামমাহাত্ম্য যদি কেহ "স্তুতিবাদ" মনে করেন, তবে তাঁহার নরকেও স্থান হইবে না। আমরা মহাপাতকী, সতী মতি নাই, ভগবানে রতি নাই, শমন ভবন-গমন-ভীতি-নিবারণের কোনও

উপায় নাই। জীবনের পরিমিত দিন শেষ হইয়া আসিল। বিষম রবিসুত-দূত পার্শ্বে দাঁড়ায়ে। এখনও ক্ষণকাল সেই কালভয়হরণ কালবরণ রাধা-রমণের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলেও প্রাণে আশ্বাস আসিতে পারে। যাহা নিজের ভাল লাগে, তাই প্রিয়জনদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা হয়। সেইজন্যই আমার এত প্রয়াস। সদ্‌বৈদ্য রোগীকে বুকে হাঁটু দিয়া জোর করিয়াও ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন। যদি কাহারও পক্ষে এ উপহার অপ্রীতিকর বোধ হয়, তাহা হইলেও শুভকামনায় তাঁহাকে লইতে অনুরোধ করি। যাহাতে দাতা ও গ্রহীতা চরিতার্থ হয়, সেইরূপ দান অপ্রীতিকর না হইবারই সম্ভব। তবে আমরা দীনাতিদীন, শক্তিহীন, ঘরে ২ নাম বিলাইবার শক্তি জগদীশ দেন নাই—এই যা' কথা।

ধর্ম্ম সত্য কিনা, ভগবানের দর্শনলাভ সম্ভবপর কিনা, ইত্যাদি তর্ক আশ্রয় করিয়া অনন্তযুগ ধরিয়া কালাতিপাত করিলেও কোন ফল দর্শিবে না। তদপেক্ষা রত্নাকর গর্ভে রত্ন মিলে কিনা, ডুব দিয়া পরীক্ষা করাই ভাল। আমরা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতিকে অবতার জ্ঞানে পূজা করি, কিন্তু, তাঁহারাও মনুষ্যরূপেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐশশক্তি মানবের মধ্য দিয়াই বিকাশ পাইয়া থাকে এবং পাওয়াও সম্ভবপর। আদর্শ সম্মুখে না পাইলে মানব কাহার ধ্যান করিবে? নিম্নাধিকারীই শক্তিসম্পন্ন হইলে কালে উচ্চ-ধিকারী হইতে পারেন। সুতরাং নিম্নাধিকারীর নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া ভাব—যতই অন্তর্মুখ হইবে, ততই মানব সত্যলোকের নিকট উপনীত হইবে। আধারবিশেষ শক্তির পরিচালক মাত্র। তড়িৎ-শক্তি সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় না, তদ্রূপ ঐশশক্তিও বিকাশ-ভাবে সমস্ত দেহীর মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় না। তবে দেহী মাত্রেই ঐশী শক্তির পরিচালনের অনুকূল। তজ্জন্যই গুরুর সাহায্যে সাধনার আবশ্যক। কর্ম্মী যাঁহাকে চায়, জ্ঞানী যাঁহাকে চায়, ভক্তও তাঁহাকেই চায়। লক্ষ্য কাহারও ভিন্ন নহে। সুতরাং সাধন পথে বিবাদ একবারেই পরিহার করা কর্ত্তব্য। সবল অধিকারীর পন্থা ও দুর্ব্বল অধিকারীর পন্থা এক হইতে পারে না; হওয়াও সঙ্গত নহে। ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার, আমরাও তাঁহার, সুতরাং জগৎ বাদ দিয়া আমরা তাঁহাকে ভাবিতে পারি না। সুতরাং আমরা প্রভু, সখা, পুত্র, ঈশ্বর ও পতিভাবে তাঁহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করি। ভাগবত-কার, ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঐ ভাব গুলিরই বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া কেহ একপদও চলিতে পারেনা। স্বভাব যে দিকে মানবকে পরিচালিত করে মানব সেই দিকেই ধাবিত হয়। তাহাতে মানবের দোষ দেওয়া যায় না। একটা চলিত কথা আছে যে, "হউক না কাঠের বিড়াল ইঁদুর ধরিতে পারলেই হয়" আমরাও তাহাই চাই। খৃষ্ট ভজে যদি কৃষ্ণ মিলে তবে তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি কি আছে? পুতুল পূজে যদি গোপাল মিলে তাহাতে দোষ কি? সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি বাদ বিতণ্ডায় এবং বহুবিধ বাগ্‌জাল বিস্তারে কি ফল আছে? অমৃত কণ্ঠস্থ না হইয়া উদরস্থ হওয়াই প্রার্থনীয়। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, ঈশ্বর, ঈশ্বর করিয়া অনন্তযুগ ধরিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করতঃ চীৎকার করিলেও বিন্দুমাত্র লাভ হইবে না। ব্যবহারিক না হইয়া ধর্ম্ম অন্তর্গত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্রমোন্নতিই বিশ্বের নিয়ম, সেই নিয়ম ধরিয়া চলাই ঠিক্। ধর্ম্মের উপর নিজের কল্পিত মত একদম চালান বন্ধ করা উচিত। ধর্ম্মদর্শী ঋষিবাক্যই সর্ব্বথা গ্রাহ্য। ভক্তিমার্গ, কাপুরুষের দর্শিত পন্থা নহে। ঐ পথে কোন ভয় নাই, প্রত্যবায় নাই পতন নাই, সুখশান্তিময় পথ। অন্যপথে পতনরূপ অশনিপাতের ভয় যথেষ্ট আছে। ভক্ত, বিড়ালশিশুর মত কাঁন্দিয়াকাঁদিয়া ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করে। সে তাহার প্রাণনাথের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী। ত্যাগই ধর্ম্মের মূল, সে প্রথম হইতেই তাহাই আশ্রয় করে। "বৈরাগ্যমেবাভয়ং" একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। সুতরাং ভয়শূন্যতা প্রেমের একটী কোণ কল্পনা করা যাইতে পারে। উহার আর একটী কোণ প্রতিদান স্পৃহা রাহিত্য। উহার আর একটী কোণ প্রেমই একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত দিয়া, এমন কি প্রাণ দিয়াও যদি প্রাণেশ্বরের প্রীতি জন্মে সেও সুখের, এতাদৃশপ্রেমই গোপীদিগের হইয়াছিল। তাহা মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। পামরেরা সে প্রেম বুঝিতে অক্ষম। ও তাহার বিকৃতভাব গ্রহণে তৎপর।

অবিচ্ছিন্ন আসক্তির সহিত ভগবানের দিকে হৃদয়ও মনের অবিরত ভাবই মানব হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ ভগবৎ প্রেমের বিকাশ। আর সকল প্রকার ভক্তিই এই ভক্তির সোপান মাত্র। যখন মনুষ্য হৃদয়ে রাগানুগাভক্তি স্থান পায়, তখন তাঁহার নিকট সমস্তই অনাবশ্যক মনে হয়। কিন্তু ভগবানকে এরূপ ভাবে ভালবাসা খুব সহজ কাজ নহে। সাধারণ মানবীয় প্রেম, যেখানে প্রতিদান পায় সেখানেই উহা বৃদ্ধিপায়, না পাইলে উদাসীনতা আসিয়া প্রেমের স্থল অধিকার করে। অন্যস্থানেই প্রতিদান শূন্য প্রেমের বিকাশ

দেখা যায়। উহাকে পতঙ্গের বহ্নির সহিত ভালবাসার সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। পতঙ্গ, বহ্নিকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পতঙ্গের স্বভাবই ঐরূপভাবে ভালবাসা। প্রেমের জন্য যে ভালবাসা তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, পূর্ণ ও নিঃস্বার্থ। যেখানে প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। উহা কেবল দোকানদারীতে পরিণত হয় মাত্র। যতদিন আমাদিগের হৃদয়ে ভয় মিশ্রা ভক্তি থাকে ও তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য কোনরূপ বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততদিন হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। বরপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে হয়ত প্রার্থিব্যক্তি ভগবানের উপাসনা করেনা। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসেন প্রেমাস্পদ বলিয়া। ঐরূপ ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি কহে। প্রেমের আর একটী গুণ এই যে হৃদয় হইতে ভয় দূর করে। যে, ভয়ে ভয়ে ভগবানের উপাসনা করে, সে মনুষ্যাধম। তাহারা মনে করে, তাঁহার উপাসনা না করিলে তিনি শাস্তি দিবেন। দণ্ড ভয়ে উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। যতদিন মনে কোনরূপ ভয়ের লেশমাত্র হৃদয়ে থাকে, ততদিন প্রেমবিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? প্রেম স্বভাবতঃই সমুদয় ভয় নাশ করিয়া ফেলে। মনে করুন, একটী স্ত্রী পথে দাঁড়াইয়া কুকুর ডাকিলেই ভয়ে তিনি সন্নিহিত গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু সঙ্গে থাকে, আর একটী সিংহ তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই স্ত্রী, শিশুপ্রেমের জন্য সিংহ মুখে স্বয়ংই প্রবেশ করিতে নির্ভয়ে প্রস্তুত হন। ভয় ও প্রেম দুইটী বিপরীত ভাবাপন্ন। যাঁহারা ভগবান্‌কে ভাল বাসেন, তাঁহারা কখনই ভগবানকে ভয় করেন না। যে কোনরূপ-মনুষ্যই হউক না কেন, সবাই নিজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে ঈশ্বর মনে করে। যে যে প্রকৃতির লোক, সে তাহার হৃদয়ের আদর্শকে বাহিরে স্থাপন করিয়া তাহার নিকট মস্তক অবনত করে। নিজের সর্ব্বস্ব দিব, কিন্তু কিছুই চাহিব না ইহাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ। মানবীয় ভাষায় প্রেমের সর্ব্বোচ্চ স্বতন্ত্র আদর্শের পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। অত্যুচ্চ মানব কল্পনায়ও উহার অনন্ত পূর্ণতাও সৌন্দর্য্য অনুভবে অক্ষম।

তথাপি সর্ব্বদেশের প্রেম ধর্ম্মের নিম্ন উচ্চ উভয় অবস্থায় উপাসকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ অনুভব করিতেও উহার নামকরণ করিতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্তভগবৎ প্রেমের

স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মানব ভগবৎ বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ণ কেবলমাত্র আমাদের ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইতে পারে। সমুদয়জগৎ আমাদিগের নিকট অনন্ত যেন সান্তভাষায় লিখিত মাত্র। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান্ ও তাঁহার প্রেমের উপাসনাবিষয়েলৌকিকপ্রেমেরঅলৌকিক শব্দ সমূহ ব্যবহার করেন। পরাভক্তির কয়েকজন ব্যাখ্যাতা পরাভক্তির কয়েকটী বিভিন্ন উপায় বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বনিম্নতম অবস্থাকে শান্তভক্তি কহে। শান্তভক্ত, ধীর, শান্ত, নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চ অবস্থা—দাস্য। এ অবস্থায় মানব নিজেকে ঈশ্বরের দাস মনে করে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ। তাহার পর সখ্য, এইভাবে মানব ঈশ্বরের নিকট অকপটভাবে বন্ধুর ন্যায় হৃদয় খুলে হৃদয়ের সমস্ত ভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করে। মনে হয়, যদি আমরা সখার নিকট সমস্ত গুপ্তভাব ব্যক্ত করিতে পারি তাহা হইলে তিনি মঙ্গল করিতে পারেন। এ অবস্থায় ভক্ত যেন তাঁর ক্রীড়ার সহায়। যিনি প্রত্যেক পরমাণু বিন্দুতে লীলা করেন, তিনিই ভক্তের লীলাসহচর। তার পরের অবস্থাকে বাৎসল্য প্রেম কহে। উহার উদ্দেশ্য আমাদের ভগবানের ধারণা হইতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-ভাবগুলি দূর করা।

সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য বাপ, মা, শতশত বার শরীর পরিত্যাগে প্রস্তুত। তাঁহাদের এক সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্র জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত। যে সকল সম্প্রদায়, ভগবান্ অবতার হন, বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই বাৎসল্য ভাবের উপাসনাই স্বাভাবিক। মানুষে প্রেমের এই স্বর্গীয় আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার নাম মধুর উহাই সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে উচ্চ। জগতের সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর উহা স্থাপিত আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্ব্বোচ্চ। এই মধুর প্রেমে ভগবানকে পতিরূপে চিন্তা করা হয়। জগতে আর পুরুষ নাই, আমরা সকলে স্ত্রী। কেবলমাত্র তিনি পুরুষ আছেন তিনিই আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্পাধিক পরিমাণে খেলা করিতেছি মাত্র, ভগবান্ই একমাত্র তাহাদের লক্ষ্য। তবে হতভাগ্য লোকে সদা প্রবাহিত প্রেমের সেই অনন্ত সমুদ্র জানে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শাসকের সহৃদয়তা। বঙ্গের গবর্ণর লর্ডরোনাল্ডসে মহোদয় কলিকাতার ওয়ার্কিংম্যানস্ ইনষ্টিটিউটে পঞ্চশত মুদ্রা দান করিয়াছেন। ধন্যবাদ।

পণ্ডিতের পরলোক গমন। ধুবড়ী ধর্ম্মসভার পূর্ব্বতন আচার্য্য পণ্ডিত মোহিনীমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ সপ্ততিবর্ষবয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। দুঃখের কথা।

উপাধি গৌরব। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড সিংহ মহোদয়কে Doctor of Laws উপাধি প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, উহা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি। লর্ডসিংহ মহাশয়কে এই উপাধি প্রদান করায় বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়েরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

সেবাশ্রম। ফরিদপুরের বাজিৎপুরে একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাশ্রয়গণকে আশ্রয় প্রদান ও রোগার্ত্তের সেবা করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য মহৎ। সুতরাং সফল হইলেই সুখের কথা।

যুবরাজের আগমন। যুবরাজ সম্ভবতঃ ২০শে ডিসেম্বর বম্বে বন্দরে অবতরণ করিবেন। বম্বে হইতে দিল্লী যাইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভিত্তি স্থাপন করিবেন। দিল্লী হইতে সামন্তরাজগণের রাজ্য সমূহ পরিদর্শন করিয়া ১৭ই জানুয়ারী কলিকাতায় আগমন করিবেন। তাঁহার আগমন পথ নিরাপদ হউক্।

নূতন র‍্যাঙলার্। লাহোরের শ্রীযুক্ত বি, ডি, পুরী বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে র‍্যাংলার হইয়াছেন। সুখের কথা।

'বহুরূপ' তারা-পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ।

মে, ১৯২০ খৃঃ অঃ।

বহুরূপ তারার অবস্থান।	নাম।				পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।
০০১৭২৬	ধ্রুবমাতা	রাশির	T.	তারা	২২১৬	৮·৬
০৬০৫৪৭	ব্রহ্ম	,,	SS.	,,	১২০৯	১১·৫ অপেক্ষা ছোট।
০৭০১২২৯	মিথুন	,,	R.	,,	০৮০৯	১১·০ ,, ,,
০৭২৭০৮	শুনী	,,	S.	,,	১৪০৯	১০·১
০৭৪৯২২	মিথুন	,,	U.	,,	১৮০৯	১২·৩ অপেক্ষা ছোট
০৮১১১২	কর্কট	,,	R	,,	০৭০৯	৬·৯
০৮৪৮০৩	হ্রদসর্প	,,	S.	,,	০৭০৯	১০·৩
০৮৫০০৮	,,	,,	T.	,,	১৭০৯	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
০৯৪২১১	সিংহ	,,	R	,,	১২১০	৭·৭
১০৩৭৬৯	সপ্তর্ষি	,,	R.	,,	০৬১০	১০·২
১২৩১৬০	,,	,,	T.	,,	০৮১০	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
১২৩৪৫৯	,,	,,	RS	,,	০৮১০	১১·২
১২৩৯৬১	,,	,,	S.	,,	০৮১০	৮·৩
	,,	,,	S.	,,	১৮০৯	৮·৪
,,	,,	,,	S.	,,	২৬০৯	৮·৫
১৩২৪২২	হ্রদসর্প	,,	R	,,	১৪০৯	৯·৬
১৫১৫২০	তুলা	,,	S	,,	১২১১	৯·৮
,,	,,	,,	S	,,	১৭০৯	১০·২
১৫১৭৩১	উত্তর কিরীট	,,	S.	,,	০৯০৯	১০·৫
১৫৪৪২৮	,, ,,	,,	R.	,,	১৪০৯	৬·৪
১৫৪৬১৫	সর্প	,,	R.	,,	০৮০৯	৬·৭
১৬২১১৯	হরকুলেশ	,,	U.	,,	১১১০	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
১৬৩১৩৭	,,	,,	W.	,,	১১১১	১১·০ ,, ,,
১৬৩২৬৬	তক্ষক	,,	R.	,,	১৫১০	৭·৭
,,	,,	,,	R	,,	২৫১০	৮·০
১৭০২১৫	সর্পধারী	,,	R.	,,	১৫১০	৮·৬
,,	,,	,,	R.	,,	২৫১০	৮·৪
১৭৫৫১৯	হরকুলেশ	,,	RY.	,,	১৬১০	১০·২
১৮০৫৩১	,,	,,	T.	,,	১৫১০	১১·২
১৮৪২০৫	গরুড়	,,	R.	,,	১৬১১	৫·২
১৮৪৩০০	গরুড়	,,	নূতন	,,	১৫১২	৮·৩
১৯৩৪৪৯	বক	,,	R.	,,	১৮১১	১১·২
১৯৪০৪৮	বক	,,	RT.	,,	১৮১১	১০·৯
১৯৪৬৩২	বক	,,	Chi.	,,	১৬১২	৯·০

বকরূপ তারার অবস্থান।	নাম।				পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।
২০০৯৩৮	বক	রাশির	RS	তারা	২২১৫	৭·৮
২০১৪৩৭	বক	,,	P.	,,	২২১৫	৪·৬
২০৩৮৪৭	বক	,,	V.	,,	২২১৬	১০·০ অপেক্ষা ছোট।
১০৪৪০৫	কুম্ভ	,,	T.	,,	২২১৬	১১·০
২১০৮৬৮	শেফালী	,,	T.	,,	২২১৬	৭·৯
২১৩৮৪৩	বক	,,	SS.	,,	১৫১২	৮·৪
,,	,,	,,	SS.	,,	১৬১২	৮·২
,,	,,	,,	SS.	,,	১৯১১	৮·৪
,,	,,	,,	SS	,,	২২১৬	১০·১
,,	,,	,,	SS.	,,	২৫১২	১১·৩

০২১৪০৩ তিমি রাশির O. তারা ৫ জুলাই, ০৭২৭০৮ শুনী রাশির S. তারা ১৪ই জুলাই, ১৯৪০৪৮ বক রাশির RT. তারা ২০ জুলাই, ১৯৪৬৩২ বক রাশির Chi. তারা ২৯ জুন এবং ২০৩৮৪৭ বক রাশির V. তারা ৫ জুলাই, তারিখে তাহাদের উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইবে।

সাঙ্কেতিক অঙ্ক গুলির ব্যাখ্যা :—

অবস্থান, ০০১৭২৬ = তারাটীর বিষুবাংশ ০০ ঘণ্টা ১৭ মিনিট এবং ক্রান্ত্যংশ ২৬ ডিগ্রী উত্তর (Right Ascension 00. hours 17. minutes and declination 26. degrees north of the Equator.)

নাম, ধ্রুবমাতা রাশির T. তারা = তারাটী ধ্রুবমাতা রাশির একটী তারা, এবং তারা-চিত্রে (Map of the sky) ইংরাজি T. অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত। উহার ইংরাজি নাম T. Andromedae যে তারার অবস্থানের নিম্নেরেখাযুক্ত তাহার ক্রান্ত্যংশ বা Declination দক্ষিণ অর্থাৎ তারাটী বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত বুঝিতে হইবে।

এই সঙ্কেত অবলম্বনে এবং তারা চিত্রের সাহায্যে আকাশে তারাটী সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়।

পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়, ২২১৬ = মে মাসের ২২শে তারিখে রাত্রি ১৬ ঘণ্টার সময়ে অর্থাৎ রাত্রি ৪টার সময়ে তারাটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এই সাঙ্কেতিক অঙ্ক যদি ০৮০৯ হয় তবে বুঝিতে হইবে যে মে মাসের ৮ই তারিখে রাত্রি ৯ ঘণ্টার সময়ে অর্থাৎ রাত্রি ৯টার সময়ে তারাটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষের হিসাবে একদিনের দিবা মধ্যাহ্ন হইতে পর দিনের দিবা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত একদিন ধরা হয় এবং ০০ হইতে ২৪ ঘণ্টায় উহার সময় নির্দ্দেশ করা হয়।

আপেক্ষিক স্থূলত্ব, ৮·৬ = পর্য্যবেক্ষণকালে তারাটী অষ্টম শ্রেণীর তারা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল এবং নবম শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা হইতে দশ ভাগের চারিভাগ অধিক উজ্জ্বল ছিল, অতএব তারাটীর উজ্জ্বলতা ৮·৬।

R. G. Chandra.

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টারীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩২৭ সাল। ১৮৪২ শকাব্দ।

চাতক।

কহে চাতক জলদে,
জল দে—জল দে—জল দে
বড় দুঃসহ পিপাসা!
তীব্র দহন এ হৃদে
বারি দে—বারি দে—বারি দে
কত ভুঞ্জিব নিরাশা?
ঊর্দ্ধ গগন চাহিয়া
র'য়েছি নয়ন স্থাপিয়া
পিতে সলিল মধুরে,—
তুচ্ছ তড়াগ সরিতে
পারে কি শীতল করিতে
বিনা পরাণ বঁধুরে?
প্রাণে আছিল ভরসা
আসিবে আজিরে বরষা
ল'য়ে জলদ-অম্বরে,
আজি পে'য়েছি নিদয়ে

দে ধুয়ে দে ধুয়ে দে ধুয়ে
তৃপ্তি জাগা'য়ে অন্তরে।
ওহে পুলকবর্দ্ধক,
জ্বলিয়া গিয়াছে পালক
কণ্ঠে না সরে সুভাষ,
বক্ষে পোষিয়ে আশারে
তোমাতে পে'য়েছি আগারে
মোরে না কর নিরাশ!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

সৃষ্টির বিকাশ।

যে দিন বিশ্বনিয়ন্তার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে, অনন্তশূন্যে বিচরণশীল নীহারিকা-পুঞ্জ, বিশৃঙ্খলার আবর্ত্ত ভেদ করিয়া সুসংযত নিয়মাবদ্ধ এই পরিদৃশ্যমান সৌরজগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই দিন হইতে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া, কত পরিবর্ত্তন, কত বৈচিত্র্যময়ী ঘটনাপরম্পরা, কত ঘাত-প্রতিঘাতের পর আমাদের আবাসভূমি এই পৃথিবীতে প্রথম জীবনের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা প্রথম চেতনার আভাস প্রদান করিয়াছিল, তাহার ধারণা করা যায় না। জীবজগতের সেই সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশের অন্তর্নিহিত বিশ্বশক্তি ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমের উৎপত্তির কারণ হইয়াছে। আজ আমরা বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তমসাচ্ছন্ন সুদূর অতীতযুগের অন্ধকাররাশি অপসারিত করিয়া, পরপর ধারাবাহিকরূপে অবস্থা হইতে কিরূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি। যে বিশ্বরেণু (Electron) ঐশ শক্তিবলে সঞ্জীবিত হইয়া ত্রিবিধ পদার্থ উৎপাদন করিয়াছে, তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষ আলোচনার বিষয়ীভূত। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহের মৌলিক উপাদান একই পদার্থ (protoplasm)। একটী অতিসামান্য বিষয় হইতে এই অদ্ভুত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

খেজুরের রস কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিলে বা অধিকক্ষণ ঘরে থাকিলে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐরূপে আঙ্গুরের রস, বেদনার রস, তালের রস—চিনিসংযুক্ত যে কোন প্রকৃতিলব্ধ দ্রবপদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ঐ সকল স্বচ্ছ দ্রবপদার্থে আবিলতা দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমশঃ ফেন উৎপন্ন হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে এবং এক প্রকার চূর্ণ পদার্থ পাত্রের তলায় পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল পদার্থের সাধারণধর্ম্মের বৈপরীত্য সংঘটিত হয়। সুস্বাদু, গন্ধবিহীন, উপাদেয় স্নিগ্ধগুণাত্মক ঐ তরল পদার্থ, ক্রিয়া-বিশেষের ফলে উগ্র অপ্রীতিকর-গন্ধবিশিষ্ট, কটুস্বাদযুক্ত, মাদকতাধর্ম্মাক্রান্ত একপ্রকার তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই পচনক্রিয়ার (Fermculation) সঙ্গেসঙ্গে যে একপ্রকার বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হইতে থাকে, উহা বায়ুসম্ভূত নহে, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত কার্ব্বণিক্ এসিড্-নামক এক প্রকার গ্যাস হইতে উহা উৎপন্ন হয়। ঐ গ্যাসের প্রাণনাশিকা শক্তি আছে এবং উহা অতি সহজেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে। যদি এই মাদকতাগুণ-বিশিষ্ট তরল পদার্থকে পুনঃ পরিশ্রুত করা যায়, তবে বিশুদ্ধ তেজস্কর মদ্য (Spirit of wine) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কত যুগযুগান্তর ধরিয়া এই ঘটনা মানুষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বৈদিকযুগে "সোমরস"-নামক মদ্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল জানিতে পারা যায়। দ্রাক্ষারস হইতে ঐ প্রকার মাদকদ্রব্য উৎপন্ন হইত, তাহাও জানা যায়। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে এই দ্রব্যের অল্পবিস্তর ব্যবহার আছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানুষ এই দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, এবং এই অদ্ভুত পচন-ক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু এই প্রকার অবস্থান্তর ঘটিবার কারণ কি এবং ইহার ফলে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের বিশেষ ধর্ম্ম কি—এসম্বন্ধে কেহই কিছু অনুসন্ধান করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত পচনক্রিয়াসম্ভূত সমুদয় প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতের উৎপত্তির নিদানভূত ঐ ফেনপুঞ্জের মধ্যে যে কত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করিতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রায় তিনশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে (১৬৮০ খ্রীঃ অঃ) লিউএন্হোক্ (Leeuwenhock) নামক জনৈক হলাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই ফেন-

পুঞ্জের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে তিনিই ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঈপ্সিত বিষয়ের গবেষণার পথ সুগম হইয়াছিল। তিনি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা ঐ ফেনপুঞ্জ পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, ঐ কর্দ্দমাকার ফেনিল পদার্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকাময় এক প্রকার দ্রব্যের সমষ্টি মাত্র। উহাদের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে তাহা ধারণা করা কঠিন। এক ইঞ্চিকে দুই সহস্র ভাগ করিলে যে অংশগুলির যে পরিমাণ হয়, ঐ কণিকাগুলির আয়তন তাহা অপেক্ষা বৃহৎ নহে। তিনি আরও স্থির করেন যে, একপ্রকার তরল পদার্থের মধ্যে এই ক্ষুদ্রতম কণিকাময় পদার্থগুলি পুঞ্জীকৃত অবস্থায় অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

এই ঘটনার পর প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ে আর কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। অষ্টাদশশতাব্দীর প্রারম্ভে কাগ্নিয়ার্দ ডিলাটুর (Cagniard dela tour) নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত আরও উন্নত-প্রণালীতে প্রস্তুত ও ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐ ফেনপুঞ্জের পরীক্ষায় নিযুক্ত হন এবং এক অতি অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করেন। তিনি দেখিতে পান যে, ঐ ফেনপুঞ্জস্থিত ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট কণিকাগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদ্জগতের পরিবর্দ্ধনশীলতা-রূপ সাধারণ-ধর্ম্মাক্রান্ত। দৃশ্যতঃ স্বতঃ-সঞ্জাত ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলি শীঘ্রগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্টাবয়ব হইলে আশ্চর্য্যনিয়মে তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া আর একটী কণিকা পুষ্পাকারে বহির্গত হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। উহা আবার বর্দ্ধিতায়তন হইলে মূল কণিকাটীর অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় ঐ প্রকারে নূতন কণিকার উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। শর্করাসংযুক্ত দ্রব পদার্থ এইরূপে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইতে থাকে এবং যতক্ষণ উহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হয়—ততক্ষণ এই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ভাসমান ফেনপুঞ্জের ন্যায় পাত্রের তলদেশে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত। উদ্ভিদজগতের যে সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ ক্রম-বিকাশ-শক্তি-বলে ওক (Oak), অশ্বত্থ, দেবদারু প্রভৃতি মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, উপর্য্যুক্ত ফেনপুঞ্জ-মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম কণিকাগুলি সেই পরিবর্দ্ধনশীল মৌলিক অংশ অর্থাৎ উদ্ভিদ্ অণু ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহাও সত্য যে শর্করা-সংযুক্ত দ্রবপদার্থই উহার আবাসস্থল।

প্রত্যক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর কিছুদিন ঐ উদ্ভিদ অণু সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। অষ্টাদশশতাব্দীর শেষভাগে ফ্যাব্রণি-(Fabroni) নামক একজন রসায়ণ-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আবিষ্কার করেন যে, ঐ অণুগুলি একটী গুলিয়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। উহাদের বাহিরের আবরণ দারুময় পদার্থে নির্ম্মিত এবং কার্ব্বণ্, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ এবং নাইট্রোজেন্ উহার মূল উপাদান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই চারিটী উপাদান দ্বারা প্রাণি-শরীরও গঠিত। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দৃশ্যতঃ সহজ-ভাবাপন্ন এই ক্ষুদ্রতম অণুগুলির গঠনপ্রণালী অতিশয় জটিলতাপূর্ণ এবং ইহারা উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মৌলিক অংশের সমবায়ে উৎপন্ন পদার্থ-বিশেষ।

জগতে যে কোন মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমসাময়িক পণ্ডিতদলে বা লোকসমাজে সমাদরে গৃহীত হয় নাই। লোকের ধারণার অতীত বিষয় বলিয়া হউক, অথবা প্রচলিতবিশ্বাসবিধ্বংশী জ্ঞানবিপ্লবকারী মতের সমর্থন করা সমীচীনতার পরিচায়ক নহে বলিয়াই হউক, নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সহজে লোকে অনুমোদন করিতে চাহে না। তাই যে আবিষ্ক্রিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণিতত্ত্বের নিদান-স্বরূপ এবং যাহা উক্ত উভয় বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—তাহার বিষয় বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত রসায়ণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন। তাঁহারা স্থির করেন যে, যদিও ঐ সূক্ষ্মতম কণিকাগুলি উদ্ভিদ্‌জাতীয় ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি তাহাদের প্রধান উপাদান প্রাণিজপদার্থে গঠিত। আমাদের রক্ত বা মাংসপেশী বা ডিম্বের প্রধান উপাদান যে জাতীয় পদার্থ, উহাও সেই প্রটীন্-(Protin) জাতীয় পদার্থে গঠিত; এবং ঐ জাতীয় পদার্থই প্রাণিশরীরের মূল উপাদান।

যখন ফরাসীদেশীয় রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাভোসা (Lavoisier) অখণ্ডনীয়-যুক্তি-বলে পদার্থের অবিনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, তখন শর্করা রূপান্তরিত হইয়া কি কি পদার্থে পরিণত হয় এবং ঐ ক্রিয়াবিশেষে উৎপন্ন পদার্থগুলি হইতে সমুদয় শর্করার হিসাব পাওয়া যায় কিনা—তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, ও ফলে ইহা জান

গিয়াছিল যে, শর্করা রূপান্তরিত হইয়া মদ্য, কার্ব্বণিক্ এসিড, সাক্‌সিনিক্ এসিড্ (Succinic), গ্লিসারিন্ উৎপন্ন হয়, আর এই চারিটী পদার্থের ওজনের সমষ্টি, যে পরিমাণ শর্করা পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল—প্রায় তাহার ওজনের সমান। একশতভাগের মধ্যে কেবল একভাগ শর্করার কোন সন্ধান বা হিসাব পাওয়া যায় না।

এই ঘটনার পরে দুইটী বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল। শর্করার এই রূপান্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে ঐ উদ্ভিদ অণুর সাহায্য কতদূর কার্য্যকারী এবং যখন পূর্ব্বোক্ত চারিটী দ্রব্যের পরিমাণ শর্করার পরিমাণের প্রায় সমান, তখন এই উদ্ভিদ-অণু-সমষ্টিগঠিত ফেনপুঞ্জ কোথা হইতে আসিল?

বিখ্যাত জার্ম্মাণ্‌বৈজ্ঞানিক হেল্‌ম্‌হল্‌থ (Helmholz) প্রথম বিষয়টী সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। অতিশয়সূক্ষ্মচর্ম্মগঠিত তলদেশযুক্ত একটী পাত্রে ঐ ফেনপুঞ্জ রাখিয়া তিনি ঐ পাত্রটী শর্করাযুক্ত পচনশীল কোনপ্রকার সিরাপ বা রসে স্থাপন করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একপ্রকার তরল ভাসমান কণিকা বা অণুর (Forula) সমষ্টি লইয়া ফেনপুঞ্জ গঠিত। পাতলা চর্ম্মের সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঐ তরল পদার্থ অনায়াসেই বাহির হইয়া রসের সহিত মিশিতে পারে, কিন্তু ঐ কণিকাগুলি উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারেনা। সুতরাং যদি ঐ কণিকাগুলির দ্বারা শর্করার রূপান্তর সাধিত হয়, তবে এইস্থলে সেই পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না। পরীক্ষার ফলে বাস্তবিকই জানা গিয়াছে যে, ঐ অবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

যখন এই অণুগুলি দ্বারাই ঐ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তখন উহারা ঐ রস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, যদি শর্করাসংযুক্ত রস অগ্নিসংযোগে ফুটাইয়া লইয়া একটী বোতলে রাখা যায় এবং এই বোতলের মধ্যে কোনপ্রকার বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তবে কিছুতেই ঐ পচনক্রিয়ার আরম্ভ হয় না এবং ঐ ফেনপুঞ্জ উৎপন্ন হইতে পারেনা। সুতরাং এই সূক্ষ্মতম অণুগুলি সর্ব্বদা বায়ুতে ভাসমান রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাদের প্রাণ আছে। উত্তাপ-সংযোগে ইহারা মরিয়া যায় এবং জীবিতাবস্থায় ইহারা শর্করাযুক্ত রসের সহিত মিশ্রিত হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপান্তর সংঘটন করে ও বিভাগপ্রবণতা-ধর্ম্মানুসারে বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই সূক্ষ্মতম কণিকাগুলি কি প্রকারে এই আশ্চর্য্য রূপান্তর সংসাধন করে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং আজিও সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। ক্যাভ্রণি, পাস্তুর্, লাইবিগ্ প্রভৃতি মনীষিগণ ঐ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন—উহারা শর্করার কতক অংশ খাইয়া ফেলে এবং শর্করার অণুগুলিকে এরূপ শক্তি দান করে যে তাহারা পূর্ব্বোক্ত অবস্থান্তর সংঘটিত করিতে ক্ষম হয়। কেহ বলেন যে, বিভক্ত হইয়া নূতন অণু উৎপন্ন হইতে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহারই সাহায্যে এইপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যিনি যাহাই মত প্রকাশ করুন না কেন, এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের আজিও সুমীমাংসা হয় নাই।

আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিজ্জাতীয় পদার্থের শরীর কতকগুলি কোষসমষ্টি মাত্র। ঐ কোষগুলির গঠন ও উপাদান উল্লিখিত ফেনপুঞ্জস্থ কণিকাদিগের গঠন ও উপাদানের সদৃশ এবং ঐ সকল কোষমধ্যস্থিত পদার্থের উপাদানও উহাদের অনুরূপ। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে যাবতীয় প্রাণিশরীরেরও মূল উপাদান ঐ একই-প্রকার পদার্থে গঠিত। পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরের ন্যায় প্রটীন্‌জাতীয় পদার্থ (Protoplasm) ফেনপুঞ্জস্থ কণিকাদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দিগের মূল উপাদান যখন ঐ একই পদার্থ, তখন ইহা অনুমান করা যায় যে, যদিও বাহ্য আকার ও লক্ষণে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উহাদের মৌলিক উপাদান একই পদার্থ। পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, কেবল কোষগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞান-বলে আজকাল পরমাণুকে আরও সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত করা যাইতেছে এবং সেই সূক্ষ্মতম অংশ (Electrlon) তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য বা কাষ্ঠখণ্ড যাহা হইতেই উৎপন্ন হউক্ না কেন—সর্ব্বপ্রকার-ভেদাভেদবর্জ্জিত একই পদার্থ। কেবল সংখ্যা ও গতির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গঠিত করে। প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন-বিষয়ে তাহাদের কোষগুলি তদনুরূপধর্ম্মাক্রান্ত।

এই বিষয়ের আলোচনা হইতে শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক পরমকল্যাণকর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া মানবের মহোপকার সাধন করিতেছে। চিনির সরবতে যদি সূচ্যগ্রপরিমিত পূর্ব্বোক্ত ফেনিল পদার্থ সংযুক্ত করা যায়, তবে

ক্রমশঃ পচনক্রিয়ার আরম্ভ হয়, ফলে চিনির রস মদ্যে পরিণত হয়। সূক্ষ্মদর্শী শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই ঘটনা হইতে অনুমান করেন যে, এই ফেন-পুঞ্জের অতি ক্ষুদ্রতম কণিকা দ্বারা যেমন অল্পসময়ের মধ্যে পচনক্রিয়ার সাহায্যে এই সকল অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, ঐ প্রকারে কোনপ্রকার জীবাণু বা উদ্ভিদ অণু দ্বারা সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগের বিস্তার সাধিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অনেক পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন যে, এমন অনেক প্রকার রোগ আছে, যাহাদের উৎপত্তি ও বিস্তার সূক্ষ্ম জীবাণু বা উদ্ভিদ অণু দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই মতের (Germ theory of diseases) পোষকতা করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ গবাশ্বাদির অনেক ভীষণ সংক্রামক রোগের নিদান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহা দ্বারাই শারীর-বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ কার্‌বাঙ্কল (Carbuncle) রক্তামাশয় (Dysentery) বসন্ত (Small pox) কলেরা (Cholera) প্লেগ (Plague) প্রভৃতি অশেষ-বিধ রোগের উৎপত্তিকারক জীবাণু বা উদ্ভিদ অণু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং গ্লাণ্ডার্স (Glanders) এন্‌থ্রাক্স (Anthrax) সীপ্ পক্স (Sheep pox) প্রভৃতি ভীষণ পশুরোগের নিদান আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ অবগত হইলে, তাহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অথবা কারণ দূরীভূত করা কঠিন নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের সমবেত চেষ্টার ফলে তাই আজ শারীরবিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে; তাই আজ মানুষ স্পর্দ্ধার সহিত প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। মানুষ যেদিন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারিবে, জগতের ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় দিন হইতে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। সেই পুণ্যদিন হইতে একটা সুগভীর শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে। কবির আশ্বাসবাণীর সহিত আমরা কি সুর মিলাইয়া বলিতে পারিনা "আসিবে সেদিন আসিবে।"

শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই।

ভক্তিকথা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

মানুষ নির্ব্বোধের ন্যায় মানবরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অন্ধভাবে মনুষ্যের প্রতি যে প্রেম

প্রয়োগ করা যায়, উহা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, অশান্তি আনয়ন করিবে। "আপাতবিষয়ারম্যাঃপর্য্যান্তপরিতাপিনঃ॥" বিষয়মাত্রেই প্রথমে রমণীয় বোধহয়, কিন্তু পরিণামে পরিতাপ নিশ্চিত, সুতরাং আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমের প্রতিই প্রয়োগ করিতে হইবে। যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা নাই, প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পঁহুছে, যেন উহা সেই প্রেমের অনন্ত সমুদ্রে পঁহুছে। "একটী জলবিন্দু পর্ব্বত গাত্র হইতে পতিত হইয়া সমুদ্রে না যাওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। উহা সমুদ্র হইতে সমুত্থিত, আবার সমুদ্রেই মিলিবে। জীবও অনন্ত চিৎ হইতে মায়াবশে বদ্ধ, আত্মবিস্মৃত, সেও প্রেম সমুদ্রে মিশিবে, ইহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। সে বুঝুক বা না বুঝুক, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সে যে, প্রেমসমুদ্র অভিমুখে ছুটীতেছে, তাহা নিশ্চিত! সেইজন্যই কোন পার্থিব আনন্দে তৃপ্তি মিটে না। খদ্যোতালোকে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়না, পিপাসা মিটে না। তীব্রমদিরাপানে ক্ষণকালের জন্য পুত্রশোক, অপগত হয় বটে, কিন্তু উহা একবারে অপগত হয় না। মোহাবসানে আবার মনে জাগরূক হয়।

আপাতরম্যবিষয় সুখে ক্ষণকালের জন্য মনকে আসক্ত করিয়া রাখা হয় মাত্র, কিন্তু, কিছুতেই অতৃপ্তি মিটে না। বিকারের পিপাসা, অনন্ত জলধির জলেও নিবৃত্ত হয় না। রোগ প্রতীকার না হইলে পিপাসা মিটে না। ভবরোগ যাতনায় সবাই কাতর, বৈদ্যরাজ সুচিন্তা বলে অত্যুত্তম ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাও সুলভ, সেই ঔষধটী কি? "হরিনামামৃতমৌষধং মহঃ।" একমাত্র অমৃতস্বরূপ হরিনামই সেই ভবরোগেরঅমোঘঔষধ। হে ভক্তবৃন্দ! আপনারা হৃদয়ক্ষেত্রে হরিনাম বীজ রোপণ করুন, এবং তাহাতে ভক্তিবারি সেচন করিতে থাকুন, যদি সেই বৃক্ষে অমৃতফল ফলে, তবে তাহা যিনি ভক্ষণ করিবেন, তাঁহার আর কখনও যমযাতনা ভোগ করিতে হইবে না। এই সংসারে আসিয়া মানব যদি অবশভাবেও একবার সেই ভবভয়ভঞ্জনমধুসূদনের মধুরনাম প্রাণভরে কীর্ত্তন করে, তবে অপরভয়ের কথা দূরে থাক, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ের হেতু যম ভীতিও সদ্য দূরীভূত হয়। নামের অচিন্ত্যশক্তি, কলিকলুষদূষিতচিত্ত মানবগণ বিশ্বাস করে না। বিষের কৃমির বিষপানেই মহানন্দ, সে অমৃতের স্বাদ কি বুঝিবে? সাধুরূপী ভগবান্ যাঁহার প্রতি করুণাকণা নিঃক্ষেপ করেন, কেবল সেই সে অমৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। আর অপরে হাটে আসিয়া কোলাহল করিয়া চলিয়া যায়।

ছোট ছোট সংসারের পুতুলে কি সুখ আছে? অনন্ত আনন্দজমাট সারকেই আমাদিগের অন্বেষণ করিতে হইবে। ভগবান্‌ই সেই আনন্দের জমাট বাঁধা। আমাদিগের প্রবৃত্তি ভাবাদি সবই যেন তাঁর সমীপে যায়। উহা তাঁহারই জন্য সৃজিত। উহারা যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, তাহাহইলেকুৎসিতরূপ ধারণ করিবে। যখন উহারা ঠিক্ তাহাদের লক্ষ্যস্থলে পঁহুছায়, তখন অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্য্যন্ত অন্যরূপ ধারণ করে। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই প্রেমের যোগ্য। এই মানুষ হৃদয় আর কাহাকে ভাল বাসিবে? তিনি পরমসুন্দর-মহৎ সৌন্দর্য্য স্বরূপ-মহত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্যতীত জগতে ভালবাসার পাত্র আর কে হইতে পারেন? তিনি আমাদিগের একমাত্র প্রেমাস্পদ। যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়। কে আর তখন জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার হওয়া, নির্ব্বাণ এসব তখন কোথায় চলিয়া যায়। এই ঈশ্বর প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে আর কে মুক্ত হইতে চাহে? তখন ধন, জন, বিদ্যা, যশঃ রাজত্ব সমস্তই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে স্রোতের বিপরীত দিকে যান। জগৎ তাহাকে পাগল বলে। কিন্তু সমুদয় জগৎ একটী বাতুলালয়! কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত। কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ মুক্তি বা স্বর্গের জন্য উন্মত্ত। যখন সুখের জন্যই আমরা সবাই পাগল, তখন অখণ্ড অনন্ত সুখ-স্বরূপ, ভগবানের জন্য পাগল হওয়াই সঙ্গত। অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখে যত বৈরাগ্য আইসে ততই মঙ্গল। কামনা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া চিত্তকে তদভিমুখী করিতে হইবে, নচেৎ প্রকৃত প্রেমোদয় হইবে না। কামনা বা ভয় থাকিতে কখনই প্রেম জন্মে না। তাঁহাতে প্রকৃত প্রেম জন্মিলে আর বাহ্যানুষ্ঠান কিছুই আবশ্যক করে না। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা কিনা অথবা রক্ষা কর্ত্তা কিনা ইহা জানিয়া কোন ফল নাই, তিনি আমাদের প্রাণের আরাধ্য-দেবতা ইহা জানিয়া হৃদয়ে উপাসনা করা আবশ্যক। যখন সমস্তবিষয় ত্যাগ করিয়া মানব ভগবানের জন্য উন্মত্ত হয় তখনই মানুষ ভগবান্‌কে যথার্থ ভাল বাসিয়া থাকে। সকল ধর্ম্মেই অসাধুলোক যথেষ্ট থাকিলেও কতগুলি ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁহাদের ঈশ্বরের গুণগানশ্রবণে চক্ষুতে প্রেমাশ্রুর আবির্ভাব হয়। প্রেমোদয় মানব স্বতই হৃদয়ে স্বসংবেদ্য অখণ্ড

আনন্দ আস্বাদ করিতে সমর্থ হয়। তখন সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সে তাহার প্রার্থিতসুখ নিরবচ্ছিন্নভাবে আস্বাদ করিতে থাকে। ভক্তির আদর্শ অবশ্য চৈতন্যময় বা আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহার পথ জড়ের ভিতর দিয়া। আর এই জড়ের সহায়তা অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব জড়-জগতে যাহা কিছু আধ্যাত্মিকতালাভে সহায়তা করে, সেই সবগুলিকে লইতে হইবে। যাহাতে জড়ভাবাপন্ন মানব ক্রমোন্নত হইয়া আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন হইতে পারে। যদি জড় মন্দিরনির্ম্মাণদ্বারা মানব ভগবান্‌কে অধিক ভাল বাসিতে পারে, খুব ভালকথা। ভগবানের প্রতিমা গঠন দ্বারা যদি সে এই প্রেমভক্তির সহায়তা পায়, তবে, সে যদি চায়, আশীর্ব্বচন সহকারে তাহাকে বিংশতিটী প্রতিমা পূজা করিতে দাও। যে কোন বিষয়ই হউক, যদি উহা ধর্ম্মের চরমলক্ষ্য বস্তুলাভে সহায়তা করে আর নীতি বিরুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ তাহা তাহাকে অবলম্বন করিতে দাও। ভক্তের সম্বন্ধে বিহিত উপাসনাপদ্ধতি সমূহের মধ্যে মনুষ্যের উপাসনাই শ্রেষ্ঠতম। বাস্তবিক যদি কোন পূজা করিতে হয়, তবে মনুষ্যের পূজা করাই ঠিক্। সাধারণ মানবের ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে চলেনা। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে, স্ত্রী, পুত্র পিতা, বন্ধু, আচার্য্য বা অন্যকোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষদিগের অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকতর আবশ্যক।

আলোকের স্পন্দন সর্ব্বত্রই থাকিতে পারে, অন্ধকারময় স্থানেও থাকিতে পারে। বিড়াল ও অন্যান্যজন্তু অন্ধকারেও দেখিতে পায়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি গোচর হইতে হইলে আমরা যে স্তরে রহিয়াছি, উহাকে সেই স্তরের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। আমরা নির্গুণ সত্তা সম্বন্ধে কথা কহিতে পারিবটে, কিন্তু যতদিন আমরা সাধারণ মর্ত্ত্যজীব, ততদিন আমাদিগকে কেবল মানুষের মধ্যেই ভগবদ্দর্শন করিতে হইবে। অতএব আমাদিগের ভগবৎ-ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতই মানুষী। সত্য সত্যই এই দেহ ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই মানুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে। যদিও উহার অন্তরালে অনেক বাড়াবাড়ি আছে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই উহার মেরুদণ্ড অটুট আছে। মানব এখন যেরূপ অবস্থাপন্ন, তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা না হইলেই ভাল

হইত। কিন্তু বাস্তবঘটনার প্রতিবাদ করাবৃথা। জড়মানবকে হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিতে হইবে। মানুষ চৈতন্য আধ্যাত্মিকত্তা সম্বন্ধে যতই বাগাড়ম্বর করুকনা কেন, এক্ষণে সে জড় ভাবাপন্ন। সেই জড় মানবকে হাতে ধরিয়া তুলিতে হইবে, যতদিন সে চৈতন্যময় না হয়। আজকালকার দিনে শতকরা ৯৯জন লোকের পক্ষে চৈতন্য কি তাহা বুঝান কঠিন। যে সঞ্চালিনী শক্তিগুলি আমাদিগকে ঠেলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর করিতেছে এবং যে ফলগুলি আমরা লাভ করিতে চাহিতেছি সেসমস্তই জড়।

সুতরাং আমরা জড়েরমধ্যদিয়া নাগিয়া স্বতন্ত্র কিছু ভাবিতে পারিনা। সুতরাং তাহা যদি আমাদের লক্ষ্যের অনুকূল হয়, তাহাতে নিন্দা কি? সর্ব্বত্র বিদ্যমান যেশক্তি সেই একই ঐশ্বরিকশক্তি। সুতরাং ভগবানকে সর্ব্বত্রবিদ্যমান জানিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। বুকে হাত দিয়া দেখ স্পন্দন অনুভব হইবে, সেই স্পন্দন সেই সঞ্চালিনীশক্তির স্পন্দন। চিৎ ও জড় ওতপ্রোতভাবে আছে বলিয়াই আমরা জড়ের ভিতর চৈতন্যের সাড়া পাই। মূর্খেরাই অজ্ঞেয়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া চৈতন্য জড়ের শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে। চিকেরঅন্তরালস্থিত-রমনীগণের ন্যায় তিনিনির্নিমেষচক্ষে আমাদিগকে দেখিতেছেন, আমরা অজ্ঞানান্ধ বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইনা। নিশ্চিত সত্য, অথচ দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বের নির্ণয়ে যদি যুক্তিতর্ক পরাস্ত হয়, তাহাতে কি বস্তুর অসত্তা সপ্রমাণ হয়। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ, অতীন্দ্রিয় বলিয়া বুঝিব-কি তাহা নাই? অতএব অনন্ত যদি সাগের মাপ কাটিতে মাপা নাযায়, তবে কি প্রমাণবলে বলিতে পারি যে, তাহা নাই। আমার মনেহয়, একখণ্ড মাংস মুখে করিয়া একটী পক্ষী যাইতেছিল। ঐ মাংসখণ্ড লোভে তাহার অপর একটী পশ্চাৎ ধাবিত হয়। পরে মাংসনিমিত্ত উভয়েদ্বন্দ্ব হয়, ঐসময় মাংসখণ্ড ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং অপর একটী পক্ষী তাহা লইয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করে। সেইরূপ তর্করসিকেরা শুষ্কতর্কের আস্বাদলইয়াই জীবন গত করেন, আর সাধকপুরুষ বস্তু লাভে চরিতার্থ হইয়া নীরব, শান্ত, স্থির থাকেন। অসৎ হইতে কখনও সত্তের উদ্ভব সম্ভব নহে। পরস্পর দুইটী বিরোধিভাব নাথাকিলে একতরের অস্তিত্ব অনুভব হয়না। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের সত্ত্বা অনুভব হয়না। দুঃখ নাথাকিলে সুখের হয়না। বিরহ নাথাকিলে মিলনের সুখ অনুভব হয়না। সেইরূপ সৎ নাথাকিলে অসত্তের অনুভব হইতে পারেনা। সুতরাং মূল এক সত্যবস্তু স্বীকার করিতেই

হইবে। তিনিই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তিনিসর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, কোথাও প্রকাশ, কোথাওবা অপ্রকাশ এইমাত্র পার্থক্য। তিনি আমাসবাকার প্রাণবল্লভ, আরাধ্য দেবতা। যার মন মজে তাঁর পায়, সেই তারে পায়, আর যে রাখে দূরে, অন্তরে থাকিয়াও তিনি তারদূরে। বিষয়পরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই হরিপরায়ণ হইতে পারেনা। বিশেষ বিষয় মদিরার এতই মোহিনীশক্তি, যে, যে একবার তাহার আস্বাদ লইয়াছে, আর তাহার নেশার ঘোরছুটেনা। এমন কি সূচিবেধ করিলেও সংজ্ঞা বোধ হয়না। মদিরার নেশায় যাহার হৃদয়ব্যাপ্তথাকে, সেহৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব স্থান পাইবে কোথায়? আমরা যাহাকরি, তাহা দেখাদেখি অভিনয় মাত্র। মনে মুখে কাজে এক না হইলে কখনই হরি মিলেনা। তুলসীদাস বলিয়াছেন "যাঁহা কাম, তাঁহা নাহি রাম, যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।" অর্থাৎ যেখানে বিষয় সেখানে হরি থাকেনা, যেখানে তিনি বিরাজমান তথায় বিষয় থাকেনা। কথাটী অত্যন্ত সত্য, ইলিসমাছের ঝোল, আর মুখে হরিবোল ইহা কখনও হইতে পারেনা। অর্থের জন্য, যশের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য, হরিভজন হইতে পারেনা। হরির জন্যই তাঁর সাধনভজন হইতে পারে। যদি কেহ মনে করেন, আমি সমস্ত জগৎটা বৈরাগী সাজাইতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে তিনি ভুল বুঝিবেন। যাহা সম্ভবনহে তাহার ইচ্ছা হইবে কেন? তবে শাস্ত্র, গুরুর উপদেশে দুই একজনও যদি ভগবদভিমুখী হয়, তাহাতে জগতের লাভ হইবে-না ক্ষতি হইবে? চিরদিন হীন হইয়া থাকিলে চলিবেনা, দুর্ব্বলতা কাপুরুষতার পরিচয় মাত্র। এখন আমাদিগকে পায়েবল করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। একদিন ভারত জগতের জ্ঞানগুরু ছিল, আবার ভারতকে আচার্য্যের পদে বসিতে হইবে। দৌর্ব্বল্য আলস্য দগ্ধ করিয়া বীরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ভিক্ষুকের আশা কখনও পূর্ণ হয়না, ভিক্ষাবৃত্তি নীচতা মাত্র। অতএব নিদ্রাত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উঠিতে হইবে। আকর্ষণ শক্তিবলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে তাঁহার অভিমুখে, আকর্ষণ করিতেছেন; আমাদিগকে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে হইবে। হাড়, চামড়া, রক্ত, মজ্জা প্রভৃতি মনুষ্য নহে, মনুষ্যত্ব উহার অভ্যন্তরে ঘুমাইয়া থাকে, উপযুক্ত কারণ ঘটিলেই বিকাশ পায়। সুতরাং বিবেকেহীন মনেকরা বিধেয় নহে।

আমরা দুই জগতে বাস করিয়া থাকি, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব এই উভয় জগতেপ্রায়সমভাবে উন্নতিকরিয়া

আসিতেছে। এখানেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয়, আর মানব প্রথমতঃ বহিঃ প্রকৃতি হইতেই সমুদয় গম্ভীর সমস্যার উত্তর লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। মানব প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে মহান্ ও সুন্দরের জন্য পিপাসানিবৃত্তির চেষ্টা পাইয়াছিল। উন্নত হিমালয় পর্ব্বত, অনন্ত জলনিধি, মেঘোরস্থিত সৌদামিনী, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যদর্শন করিয়া সে প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল এবং বিশ্বপতির মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন তাহার নিকট অন্য জগৎ প্রকাশ হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর। আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। এটী অন্তর্জগৎ, অন্তর্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রশ্নশত হইতে লাগিল, মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি হয়? কেহ বলিল মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ বলিল থাকে না। শেষে প্রকৃত উত্তর আসিল, যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই মানবাত্মার মধ্যে বর্ত্তমান আছেন। বস্তুর কখনও ধ্বংস হয়না, রূপান্তর হয় মাত্র, স্থূল সূক্ষ্মে পরিণত হয়। সুতরাং আত্মার নশ্বরতা শঙ্কা হইতেই পারে না। স্পন্দনশক্তিই প্রাণ, সেই একই শক্তি বিভিন্ন নামে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। নিজেকে জানেনা বলিয়াই মানব সতত মৃত্যু ভয়ে ভীত। স্বস্বরূপ জানিতে পারিলেই তাহার ভয় দূর হয়। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মত লইয়া শুষ্ক কলহ করিলে চলিবে না। যাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তাহাই করিতে হইবে। যেমন একই অগ্নি কার্য্যভেদে ভিন্ন ২ নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ উপাসক ভেদে উপাস্যের বিবিধ নাম হইতে পারে। তাহাতে কিছু যায় আসে না, গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারিলেই হইল। বৈচিত্র্যই জীবনীশক্তির মূল, যাঁহারা সব একাকার করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মানবকুলের শত্রু। ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবনস্বরূপ, যে মুহূর্ত্তে মানব সমাজ ধর্ম্মত্যাগ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই উহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। এমন কি চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। অতএব ধর্ম্মকেই দৃঢ়রূপে ধরিতে হইবে। অন্ধভাবেও অগ্রসর হইয়াও যদি মানব শান্তিপুরে যাইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি কি? তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত, যুগ যুগান্তর, এক মন্বন্তর হইতে অন্যমন্বন্তরপর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত তর্ক কর, তবু তাহা শেষ হইবে না, প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সুতরাং বৃথা জীবন গত না করিয়া সত্যবস্তু অন্বেষণ করাই সঙ্গত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে জলবিন্দু পর্ব্বতগাত্র বহিয়া নদীতে পড়িতেছে, সেও সমুদ্রে না গিয়া শান্ত হইবে না। সেইরূপ সমস্ত প্রাণ, প্রলয়ে সেই আদি সমষ্টিতত্ত

প্রাণে মিশিবে। আবার সৃষ্টি আরম্ভ হইলে তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সমুদ্রতরঙ্গবৎ এই সৃষ্টি একবার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, আবার পশ্চাৎপদ হইতেছে। উহাকেই সৃষ্টি ও লয় কহে। যাহাহইতে উৎপত্তি আবার তাহাতেই লয় ইহাই স্বাভাবিকরীতি। যতই যাহাহউক এই দৃশ্যমান জগৎ শূন্য হইতে পতিত হয়নাই। অসৎ হইতে যদি জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে, কোন বস্তুর আপেক্ষিক সত্ত্বাও স্বীকার করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

নিষ্কামকর্ম্ম ও গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় কয়েকটী শ্লোকের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইবে। গীতায় আছে—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মাকর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

অনুবাদ। কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে কদাচ যেন না হয়। কখনও কর্ম্মফলার্থী হইও না, সকাম কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

টীকা। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারোনজ্ঞাননিষ্ঠায়াম্", শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে সকল ব্যাখ্যাতৃগণ এইরূপ করিয়াছেন, তাহা মনোমত নহে। কারণ এখানে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারো নফলেষু", এই অর্থ অতি সুস্পষ্ট। নিস্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে যেন তোমার কদাচ অধিকার নাহয়। অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া ভগবৎ প্রীত্যর্থ ভগবন্নিয়োগে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিয়া যাও; কর্ম্ম করিয়া কখনও কর্ম্ম ফলাভিলাষী হইওনা; কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালনেইযেন তোমার কামনা পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্বোক্ত

ব্যাখ্যাতৃগণ "অকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে সঙ্গঃপ্রীতিঃ নিষ্ঠামাভূৎ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ কর্ম্ম দুঃখস্বরূপ বলিয়া কর্ম্মের অকরণে যেন তোমার প্রীতিনাহয়। ইহাঁরা সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসই প্রশস্ত মনে করিয়া থাকেন, এবং অর্জ্জুন অশুদ্ধান্তঃকরণ বলিয়া, ও কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জুনের তাত্ত্বিক জ্ঞানোৎপত্তির অযোগ্য অবিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্য হইবে বলিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, এই বলিয়া থাকেন। এইরূপ অর্থ করিলে "সঙ্গ" শব্দেরও সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়; কারণ কর্ম্ম অকরণে আবার সঙ্গ কি? সুতরাং ইহাঁদের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। "অকর্ম্মণি অপ্রশস্তে সকাম কর্ম্মণিতে সঙ্গ আশক্তির্মাস্তু" এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। কারণ এখানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সকাম কর্ম্মের নিষেধ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন।

যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণিসঙ্গং ত্যক্ত্বাধনঞ্জয়?
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বাসমত্বংযোগউচ্যতে॥ ৪৮

অনুবাদ। হে-ধনঞ্জয়, সঙ্গত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্মসকল কর; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।

টীকা। যোগস্থ—যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্রস্থিতঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগদ্বারা ব্রহ্মেযুক্ত হইয়া।

সঙ্গংত্যক্ত্ব—বিষয়াসক্তিংত্যক্ত্বা।

একদিকে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং অন্যদিকে ব্রহ্মেযুক্ত হইয়া কর্ম্মকরা সর্ব্বদা ব্রহ্মেযুক্ত হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাঁহার প্রেরণাতেই নির্দ্ধারিত হইবে; অধিকন্তু বিষয়াসক্তি রহিত হইলে, চিত্তবিক্ষেপের কারণ নাথাকা হেতু কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞান বা অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্যজ্ঞান রূপ মোহ উপস্থিত হইবেনা। তখন কর্ত্তব্য সকল কেবল তাঁহার প্রীত্যর্থই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে, বিষয় সংসর্গজা মোহ হইতে উৎপন্ন কোনও ক্ষুদ্র কামনাতৃপ্ত্যর্থ নহে। তখন বিষয়সঙ্গের অভাবহেতু কোনও কামনাই চিত্তে উদয় হইবেনা।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোসমোভূত্বা—কর্ম্মের সিদ্ধিতে হর্ষ এবং অসিদ্ধিতে বিষাদরহিত হইয়া উভয়ই তুল্যজ্ঞান করিয়া। যখন কোনও কামনাদ্বারা প্রেরিত না হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরের নিয়োগেই কর্ম্মকরা যায়, তখন যদি কোনও প্রতিবন্ধকবশতঃ সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত নাহয়, তাহা হইলে বিষাদ গ্রস্ত হইবার আবশ্যক নাই। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যভাবাপন্ন হইতে বলিয়াছেন

বলিয়া যে এখানে কর্ত্তব্য সাধনে শিথিল প্রযত্ন হইতে হইবে তাহানহে। তাহা হইলে, বা কর্ত্তব্যের অকরণে, প্রত্যবায় হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনে যথাসাধ্য যত্ন করা উচিত; তবে যদি বিঘ্নবশতঃ তাহা সিদ্ধ নাহয়, তাহা হইলে বিষাদগ্রস্ত হইওনা। সিদ্ধিতেও যেমন, অসিদ্ধিতেও তেমন নির্ব্বিকার থাকা উচিত।

সমত্বং যোগ উচ্যতে—কেবল ঈশ্বরারাধনা বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে যদি চিত্ত সমভাবে নির্ব্বিকার থাকে, তাহাহইলে বুঝিতে হইবে যে চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ ধারণের উপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং চিত্তের ঐরূপ সমত্বই উহার পরমেশ্বরৈকপরতাসূচিত করিয়া থাকে।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। হে ধনঞ্জয়, নিষ্কাম কর্ম্মযোগোদ্ভবজ্ঞানযোগ অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট। তুমি নিষ্কাম কর্ম্মযোগোদ্ভবব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিতে শরণ লও, যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী তাহারা কৃপণ।

টীকা। কর্ম্ম—ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়মান এবং জন্মমরণাদির হেতুভূত কাম্যকর্ম্ম।

বুদ্ধিযোগাৎ—নিষ্কামকর্ম্মযোগোৎপন্না পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মসহযোগ। তাহাহইতে কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট। বুদ্ধৌ—ঐ পরমাত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে। এই বুদ্ধি দ্বারাই পরমাত্মতত্ত্ব অধিগত হয়। যথা শ্রুতিঃ—"দৃশ্যতেত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" "তীক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শিগণ দেখিয়া থাকেন।" ইহা নিষ্কামকর্ম্মযোগ হইতে সমুৎপন্ন এবং ইহাই পরিপক্ক হইলে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। এই বুদ্ধিতেই শরণ; আশ্রয়, অর্থাৎ মোক্ষরূপ অভয় প্রার্থনা কর।

অপরপক্ষে, যাহারা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কাম্যকর্ম্ম করে, তাহারা কৃপণ অর্থাৎ অনাত্মজ্ঞ। শ্রুতি বলিতেছেন,—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" হে গার্গি, এই অক্ষরকে যে না জানিয়া এই লোক হইতে পরলোকে গমন করে সে কৃপণ।"

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মযুক্ত ব্যক্তি এই জন্মেই পাপপুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব যোগে উদ্যুক্ত হও। যোগ কর্ম্মের কৌশল হইতেছে। (অথবা যোগসুকৌশল কর্ম্ম হইতেছে)।

টীকা। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল করেন, তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের ফল ব্রহ্মেই অর্পিত হওয়াতে তৎকর্ম্মজাত পাপপুণ্যময় ফল তাঁহারা এই জন্মেই ত্যাগ করেন। "পাপ পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করেন," এই কথায় প্রকাশ পাইতেছে যে পাপকর্ম্মের দুঃখময় ফল যেরূপ বন্ধন, পুণ্য কর্ম্মের সুখময় ফলও সেইরূপবন্ধন স্মৃতি বলিতেছেন,—

"যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥"

"লৌহময় পাশে যেমন বন্ধন হয়, স্বর্ণময় পাশেও তেমন বন্ধন হয়। সেইরূপ অশুভ কর্ম্মেজীব যেমন বদ্ধ হয়, শুভ কর্ম্মেও তেমনিই বদ্ধ হয়। সুতরাং সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই মোক্ষের প্রতিবন্ধক হওয়াতে মোক্ষকামি সাধক উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগে উদ্‌যুক্ত হও। তাহাহইলে তোমার আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হইবে। যোগকর্ম্মের কৌশল হইতেছে। কারণ যোগ যুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে না, অথচ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া পরমাত্মাতে চিত্তাভিনিবেশ হওয়াতে মোক্ষলাভ হইবে।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদংগচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১॥

অনুবাদ। বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ নিশ্চয়ই কর্ম্মজ ফলত্যাগ করিয়া এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, সেই অনাময় মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা। সকামকর্ম্ম হইতে জাত ইষ্টানিষ্ট ফল হইতেই দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম্মযোগোৎপন্ন ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত মনীষিগণ কেবল মাত্র ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফলত্যাগ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের আর জন্মরূপ বন্ধন হয় না। ইহজন্মেই তাঁহারা জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অন্তিমে মোক্ষাখ্য বিষ্ণুর অভয়পদ অভেদভাবে প্রাপ্ত হন।

যদাতে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসিনির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥

যখন তোমার বুদ্ধি দেহাদিতে আত্মা বুদ্ধিরূপ মোহময় গহন দুর্গ অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে

টীকা। কখন তুমি বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিবে, তাহা এখানে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। যখন অনাত্মবস্তুতে আত্মাধ্যাসমোহ ত্যাগ করিয়া তোমার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইবে, তখন যে সকল শাস্ত্র শ্রুত হইয়াছে বা শুনিতে হইবে, তাহাদের প্রতি বৈরাগ্য হইবে ও তত্তৎ শাস্ত্রোল্লিখিত কর্ম্মফলের প্রতিও বৈরাগ্য হইবে। কারণ আত্মলাভ হইলে অন্য কোনও ক্ষুদ্র বস্তুর আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যে সকল শাস্ত্রে সকামকর্ম্মসকল বিহিত হইয়াছে তৎ সমুদয় ত তুচ্ছ বোধ হইবেই, এবং নদী উত্তীর্ণ হইলে যেমন আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রও তখন নিষ্প্রয়োজন হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে যখন এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন জীব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে অধিগত করিয়া মোক্ষাখ্য বিষ্ণুর পরমপদ লাভে অধিকারী হয়।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩॥

অনুবাদ। নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণে তোমার বুদ্ধি এক্ষণে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া পরমাত্মায় স্থির থাকিবে তখন যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

টীকা। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না-শ্রুতি, অর্থাৎ নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের ফল শ্রবণ করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধির এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিতে ২ তাঁহারই কৃপায় তিরোহিত হয়। স্মৃতি বলিতেছেন,—

"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
সজহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥" (ভাগবত)

"যখন সাধক কর্ত্তৃক আত্মস্বরূপে ভাবিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তখন ঐ সাধক লোকব্যবহার ও বেদোক্ত সকামকর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিত মতি ত্যাগ করেন।"

নিশ্চলা—বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্টা।

অচলা—পরমাত্মাতেই স্থিরা।

সমাধৌ—সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমাত্মা।

যোগম্—জীবাত্মাপরমাত্মার ঐক্যসাধকবিবেকজ্ঞান।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, তোমার দেহাদি অনাত্ম

বস্তুতে আত্মাভিমান তিরোহিত হইলে, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধি নিস্তরঙ্গসলিলবক্ষের ন্যায় স্থির হইবে; তখন স্বপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব স্বরূপে বিরাজমান হইবেন। এইরূপ অবস্থা হইলে তুমি যোগ লাভ করিয়া সেই বিষ্ণুর পরমপদমোক্ষলাভ করিবে। এক্ষণে পরমাত্মা জীবাত্মা ও দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার, এই তিনের তত্ত্ব উপমা দ্বারা বুঝা যাউক। আকাশে স্বমহিমায় বিরাজিত ঐ পূর্ণচন্দ্র পরমাত্মস্থানীয়। ঐ নির্ব্বাতনিস্তরঙ্গহ্রদ গর্ভে প্রতিফলিত চন্দ্র প্রতিবিম্ব জীবাত্মার স্থানীয়। আর তরঙ্গায়িত হ্রদগর্ভে প্রতিফলিত সহস্রখণ্ডে বিভক্ত চঞ্চল চন্দ্রপ্রতিবিম্ব অহঙ্কার স্থানীয়। ঐ তরঙ্গায়িত হ্রদবক্ষঃ নিস্তরঙ্গ হওয়ার ন্যায়, বিষয় সঙ্গহেতু চঞ্চলবুদ্ধি যখন বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া স্থির হয়, তখন ঐ স্থিরচন্দ্র প্রতিবিম্বের ন্যায় স্থিরবুদ্ধিতে আভাসিত জীবাত্মাও অহঙ্কার মল ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে বিরাজমান হন, এবং তখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মায় লক্ষ্য হয়। চন্দ্রকে ছাড়িয়া চন্দ্রপ্রতিবিম্বের যেমন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মারও যে পৃথক সত্তা নাই, তাহাও তখন জ্ঞান হয়। এইরূপ হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যসাধনরূপযোগলাভ করিয়া সাধক স্থিতপ্রাজ্ঞ হন।

ক্রমশঃ।

শ্রী——

আদিম আর্য্যনিবাস।

অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্ত এই যে "ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির আদিম নিবাসস্থান নহে। ঋগ্বেদে দস্যু, দাস, অসুর, রাক্ষস আদি যে সমস্ত অনার্য্য ও অসভ্য জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, আর্য্যেরা ভিন্নদেশ হইতে আগমন করতঃ ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন যে আর্য্যেরা পূর্ব্বে মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন, আবার তিলক প্রভৃতি

মনীষিগণ বলিতে চান যে আর্য্যেরা উত্তর মেরু হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করিলে, আর্য্যগণ যে ভিন্নদেশ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। ঐতিহাসিক প্রবর এল্ ফিন্ ষ্টোন্ বলেন—

"It is opposed to their (Hindu's) forcign origin that mither in the code of the Manu, nor, I believel, in the vedas, nor in any book that is certainly older than the code, is there any allusion to a prior residence, or to a knowledge of more than the name af any country out of India. Encu my thology goes no further than the Himalayan chain, in which is fixed the habitation of the gods."

অর্থাৎ কি মনুস্মৃতি, কি বেদ, কোন পুস্তকেই আর্য্যজাতি যে বিদেশ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন. তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। হিমালয়ের পরপারে আর্য্যজাতির দেবদেবীরও কোন আবাসস্থান ছিল এমন কোন উল্লেখও নাই।"

ডাক্তার জে, ম্যুর লিখিয়াছেন—

"I must, however, begin with a candid admission that, so far as I know, none of the Samskrit books, nct even the most ancient, contain any district reference ar allusion to the forign origin of the Indians."

অর্থাৎ আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি যে আর্য্যজাতি যে বিদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে তাহার বিন্দুমাত্র সংকেত পাওয়াযায়না।

কুজর নামক জনৈক ফরাসী ঐতিহাসিক বলেন—

"If there is a country on earth, which can justly claim the honouwr of having been the cradle of human race, or at least the sune of primitlve civilization...... that country assurendly is India."

অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যেদেশ ন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যজাতি ও প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তিস্থান বলিয়া গৌরবের অধিকারী হইতে পারে তবে নিঃসন্দেহে সেদেশ ভারতবর্ষ।

লুই জেকলিয়ট নামক জনৈক ঐতিহাসিক বলেন—

"India is the world's cradle; thence it is that the common mother ... bequeathed as the legacy of her language, her moral, her literatnre and her religion.

অর্থাৎ ভারতবর্ষ সংসারের জন্মস্থান। ভারতবর্ষ জগতের জননীরূপে বিশ্বসমাজকে ভাষা, নীতি, সদাচার; সাহিত্য প্রভৃতি দান করিয়াছেন।"

এখন কথা হইতেছে যে, যদি তর্কের খাতিরে মানিয়াই লওয়া গেল যে আর্য্যজাতি ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তবে বিশাল ভারতের কোনস্থান তাঁহাদের সূতিকাগৃহ ছিল সেইটিই বিচার্য্য। অনেকে অনুমান করেন সরস্বতী নদীর প্রান্তভাগই আর্য্যজাতির আদিম নিবাসস্থান। এবিষয়ে ঋগ্বেদের শ্রুতিতে, স্মৃতিতে বহুপ্রমাণ রহিয়াছে। সরস্বতী বৈদিক ভাষায় অত্যন্ত পবিত্রনদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ সরস্বতীকে সপ্তসিন্ধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নদী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ সরস্বতীর প্রান্তভাগে মনুষ্যের জীবনাভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। বৈদিক পণ্ডিতগণের মত এই যে, প্রকৃতি সরস্বতীরই চতুষ্পার্শ্ব হইতে জীবসৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, সরস্বতী-স্রোতে বহুশতাব্দী যাবত চেষ্টার ফলে প্রকৃতি জীবসৃষ্টি করিতে সক্ষমা হন। ঋগ্বেদে বলেন—

"হে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ুংষি দেব্যাম্ (ঋগ্বেদ ২—৪১—১৭) অর্থাৎ হে সরস্বতি, তুমি দেবীরূপ, সমস্ত প্রাণী তোমা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হয়।

যখন সমস্ত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেনি তখন তাহাদের নিবাসস্থল ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য ভূমির দরকার হয়। ঋগ্বেদে ৬–৬১–৬ লিখিতেছে "উত ক্ষিতিভ্যোবনীরবিন্দঃ" অর্থাৎ হে সরস্বতি ? তুমি মনুষ্যদের জন্য ভূমি দান করিয়াছ। এই সমস্ত কারণে সরস্বতী আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক নদীতমে, অম্বিতমে, দেবীতমে ইত্যাদি গৌরবসূচক শব্দে সম্বোধিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের অন্য একস্থলে সরস্বতীর মাহাত্ম্যবর্ণনচ্ছলে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ভাবার্থ এই "হে সরস্বতি আমাদের যশ ও প্রতাপ বাড়াও, তোমার দুগ্ধ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না, প্রসন্নতার সহিত আমাদের মৈত্রী ও সেবা স্বীকার কর, আমাদিগকে তোমার নিজের পার্শ্ব হইতে অন্যত্র যাইতে দিও না।

উপরোক্ত উদ্ধৃত সূক্তাবলী হইতে ইহাই প্রকটিত হইতেছে যে আমাদের প্রাচীন আর্য্যগণ জানিতেন যে সরস্বতীর প্রান্তেই মানবের আদি জন্মভূমি। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" যাহাদের মূলমন্ত্র তাহারা সরস্বতীকে "দেবীতমে" আখ্যায় আখ্যায়িত করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে সরস্বতী কোন নদী বিশেষের নাম নহে। উহার অন্য কোন যৌগিক অর্থ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে যখন দেখিতে পাই যে সংযুক্তপ্রান্ত ও পঞ্চানদ প্রদেশের নদীসমূহের নাম পরিস্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে যখন সরস্বতীর নাম ও দেখিতে পাই তখন সরস্বতীকে নদী ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারি না। ঋগ্বেদীয় সূক্তের এই—"হে গঙ্গে, যমুনে, সরস্বতী শুতুদ্রি (Sutbj) পরুষ্ণী (Ravi) আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। হে মরুদ্বৃধে, অশ্বিনী (Chauab) বিতস্তা (Jhelum) আর্জি কিয়ার সহিত (Bias) আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তোমরা কুভা (কাবুল) গোমতী (গোমল) প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র হইতে ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় আর্য্যেরা প্রথমতঃ গঙ্গা হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাবুল হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন নাই। যদি তাহা হইতেন তাহাহইলে কুভ্কুভা বা কাবুলের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ থাকিত, গঙ্গার নাম থাকিত না। যে বস্তু মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম মানুষ সর্ব্বাগ্রে সেই নামই উল্লেখ করে। শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রে আগে মা তারপর বাপ তদন্তর ভাই ভগ্নীর নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে; কদাচ মামা, খুড়ীর নাম আগে উচ্চারণ করে না।

ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ বেগাজিন ঋগ্বেদকে Book of books অর্থাৎ পুস্তকাধিরাজ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মহামতি মোক্ষমুলার ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The veds, I feel convinced, will occupy scholars for ceuturies to come and will take and maintain for wer its positiou as the ancient of books in the library of mankind,"

অর্থাৎ বেদ মনুষ্যজাতির পুস্তকালয় মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মিঃ ইলিয়ড্ হিন্দুদিগের চারি যুগের বিষয়ে লিখিতেছেন ঃ—

"To such antiquity, the Mosaic creation is but as yesterday, and to such ages the life of Methu selah is no more than a spain." অর্থাৎ ঋগ্বেদের সহিত তুলনা করিলে মুসার বর্ণনা কল্যকার ঘটনা বলিয়া প্রতীতি হয়। আর বৈদিকযুগের সম্মুখে মেথুশীলার জীবন অল্পকালের ঘটনা বলিয়া মনে হয়।

অতএব ঋগ্বেদের সদৃশ প্রাচীনতম গ্রন্থে অন্যান্য বৃহদায়তন নদীর পরিবর্ত্তে সরস্বতীর উল্লেখ দেখিয়া ইহাই কি ধারণা হয় না, যে আর্য্যগণ সরস্বতীরই প্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এখন প্রশ্ন হইতেছে আর্য্যগণ সরস্বতীর প্রান্ত ত্যাগ করিয়া কোন্‌দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন? আর্য্যগণ যজ্ঞাদিকর্ম্মে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা সরস্বতী প্রান্ত হইতে অগ্নিআদি যজ্ঞীয় সম্ভার লইয়া সদানীরা নদী পর্য্যন্ত আগমন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার উল্লেখ আছে। আরও ঋবেদে আরও লিখিত আছে যে "অগ্নে ত্বা পূর্বমনযন্" অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি পূর্ব্বদিকে আর্য্যদিগকে লইয়া গিয়াছে। আবার "আপংপুনঃ" ঋগ্বেদের এই সূক্ত হইতে প্রতীতি হইতেছে যে সদানীরা হইতে আর্য্যগণ পুনয়ার সরস্বতি প্রান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদন্তর তাহারা পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণদেকে গমন করেন।

ঋগ্বেদ ব্যতীত মহাভারতেও সরস্বতি প্রান্তে যে সৃষ্টিক্রম আরম্ভ হয় তাহার উল্লেখ আছে।

মহাত্মা মনু ঋগ্বেদের "যোনিং দেবকৃতং" বাক্যের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তা, আর্য্যবর্ত্ত ও ম্লেচ্ছদেশের সীমা বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশকেই তিনি দেবনির্ম্মিত দেশ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের সীমা নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—"সরস্বতি দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই দেবনির্ম্মিত। ইহাকেই ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে।"

আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—দেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র বিদ্যমান, সেই দেশকেই বিবুধগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।

ম্লেচ্ছদেশের সীমা নির্ণয় প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন "ইহা ছাড়া আর যাহা তাহাই ম্লেচ্ছদেশ।" ইহা বিচারের বিষয় যে যদি আর্য্যগণ ভারতে বিদেশী হইতেন তাহাহইলে মনু "ম্লেচ্ছদেশস্তুতঃপর" কখনও বলিতেন না। দেবনির্ম্মিত

দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত আখ্যা দেওয়ায় প্রতীতি হইতেছে যে ব্রহ্মাবর্ত্তেই সৃজন-কর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমে জীবসৃষ্টি আরম্ভ করেন। এবিষয়ে Royel Asiatic jownalএ মিঃ কর্ব্বিন নামক জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—

——"From these considerations it follows that theie is not sufficient foundation for the hypothesis that the ancient Aryans, Indians, or Hindu, entered India proper form, some external region ; on the contrary, the facts above delimated point to the conchision that the rise progress, advance in the arts and civilization of those remarkable heople, are the growth of their own land, developed during the course of long ages and communicated to other nations,

অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যগণ যে অন্য দেশ হইতে এদেশে আগমন করিছেন একথা কোন প্রকারেই বলা যায় না। পরন্তু ইহাই ধারণা হয় যে আর্য্যগণের উত্থান, উন্নতি ও শিল্পকলার উন্নতি এদেশে হইয়াছে এবং এদেশ হইতেই তাহাদের সভ্যতা অন্যদেশে বিস্তৃত হইয়াছে।

অন্য একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন—

—"The in fluence of that civilization, worked out thousands of years agoin India, is around as and aboutes luery day of our lives. It pervedes luery corner of the clvilized world. Go to Amenca you find there, as in Europe the influence of that civilization, which came originalhy from the banks of the Gauges.

অর্থাৎ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে যে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কার্য্যাবলীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত রহিয়াছে। তুমি আমেরিকায় যাও, ইউরোপের ন্যায় তুমি সেখানেও যে সভ্যতা প্রথমে গঙ্গারতট হইতে বিকাশিত হইয়াছিল সেই সভ্যতা দেখিতে পাইবে।"

আর্য্যদিগের আদিম নিবাসস্থল ব্রহ্মাবর্ত্ত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এস্থলে আমি সোমযজ্ঞ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। মহাত্মা তিলক বলেন যে সোমযজ্ঞ অতি প্রাচীনযজ্ঞ। ঋগ্বেদেও সোমকে "যজ্ঞস্য পূর্ব্বঃ" অভিধা দেওয়া হইয়াছে। "জনিতামতীনাম্" অর্থাৎ বুদ্ধির উৎপাদনকারক ও "দস্নং

দধান আত্মনি করিষ্যন্ বীর্য্য" অর্থাৎ বলবীর্য্য প্রদায়ক বলিয়া "পিতা দেবানাং" অর্থাৎ সোমরস দেবতারা পান করিতেন বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে। "সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষঃ" অর্থাৎ সোমের উৎপত্তি মুজ্জাবত পর্ব্বতে। মহাভারত "গিরিহি ভবতঃ পৃষ্ঠে মুঞ্জবান্নাম পর্ব্বতঃ" এই শ্লোকের দ্বারা মুঞ্জাবত পর্ব্বতকে হিমালয়ের পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত বলিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঋগ্বেদ কুরুক্ষেত্রেস্থিত শর্যনাব নামক স্থানকে সোমের উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে সোম ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও উৎপন্ন হইত না। বৈদিক অথবা অবৈদিক কোন গ্রন্থেই মধ্যএশিয়া বা উত্তর মেরুতে যে সোম উৎপন্ন হইত ইহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আধুনিক পারসী ও ইরাণী সম্প্রদায় প্রাচীন আর্য্যজাতিরই সন্তান। ইহারা আর্য্যজাতিরই সহিত আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিত এবং একই ভাষায় কথোপকথন করিত। কারণ শব্দশাস্ত্রবিদগণ স্থির করিয়াছেনযে, সপ্তসিন্ধু, হোম, অহুর মজই ইত্যাদি শব্দ যাহা জেন্দভাষায় লিখিতআছে তাহা সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু, সোম, অহুর মেধাবী কথারই অপভ্রংশ মাত্র। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতভেদের জন্য পারসীক সম্প্রদায় আর্য্যজাতি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। কোন কোন পারসীক যজ্ঞকর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তখন উভয় জাতিতে সংগ্রাম বাধে। ফলে পারসীকগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইরাণ দেশে পলায়ন করে। আর্য্যেরা এই বিপক্ষদিগকে অসুর, রাক্ষস, দাস, কৃষ্ণত্বক, কৃষ্ণযোনি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেন। এই প্রমাণ হইতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে আর্য্যেরা ইরাণ বা অন্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই।

"স্কুল, কলেজের প্রচলিত ইতিহাস" পড়িলে জানাযায়, যে আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিম দিকহইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন ভারতের আদিমনিবাসী ছিল কোল, দ্রাবিড়, ভীল, তুরণীয় জাতি। এই অসভ্য জাতিদিগকে পরাজয় করিয়া আর্য্যেরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরাজিত অসভ্য জাতিকে আর্য্যেরা অহুর, দস্যু, রাক্ষস ইত্যাদি আখ্যাপ্রদান করেন।" আমার মনে হয় স্কুল-কলেজের ইতিহাস প্রণেতৃগণের ইহা একটী অমার্জ্জনীয় ত্রুটি, প্রথমে দস্যু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করা যাউক। "দস্যবো অনুষ্ঠাতৃণামুপক্ষপয়িতার শত্রবঃ।" অর্থাৎ যজ্ঞকারীদিগের শত্রুই দস্যু।

"দাসাঃ কর্ম্মহীনাঃ শত্রবঃ।" মহাভারতে শান্তিপর্ব্বেও দাসশব্দের অর্থে যজ্ঞাদি কর্ম্মহীন শূদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্বতঃই প্রতীতি হয় যে শূদ্রশব্দ পরাজিত ব্যক্তিবাচক শব্দ নহে, পরন্তু কর্ম্মহীন শত্রুবাচক। মনু কাম্বোজ অধিবাসী আর্য্যকে পর্য্যন্ত দস্যু শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতেও লিখিত আছে "দস্যুনাং নিষ্ক্রিয়ানাংচাক্রিয়ো হন্তুমর্হতি।" ইহাতেও যজ্ঞাদি ক্রিয়ারহিত মনুষ্যকে দাস বলা হইয়াছে। এইকারণে দস্যু আর দাস কর্ম্মহীন হওয়ায় কালক্রমে "অনার্য্য" নামে অভিহিত হইয়া ভিন্ন এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বৈদিককালে আমাদের আর্য্যগণ আপনাদের ব্যতীত অন্য কোন ভিন্ন জাতিকে ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া জানিতেন না। এই কারণে তাহারা দস্যু ও শূদ্রজাতিকে কোথাও আদিম অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কেবলমাত্র কর্ম্মহীন বা শত্রু শব্দে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন।

কোন কোন বিদ্বান্‌ব্যক্তির মত এই যে বর্ণব্যবস্থা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বাস হয় যে ভারতে প্রাচীন কালে অসভ্যজাতির বাস ছিল, উহাদিগকে আপনাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক রাখিবার জন্য বর্ণব্যবস্থা উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনকালে বর্ণভেদ ছিল সত্য, কিন্তু বর্ণভেদ ছিল না। প্রাচীনকালে যে প্রকারের বর্ণভেদ ছিল তাহার অর্থ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বর্ণভেদের অর্থ রঙ্গভেদ মনে করেন। বর্ণ শব্দ বৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বৃ ধাতুর অর্থ পছন্দ করা। মনুষ্য আপনাপন রুচিপূর্ব্বক বিশেষ ২ বৃত্তি পছন্দ করিয়া লইয়াছিল; কেহ বাণিজ্য করিতে লাগিল, কেহ সেনাবিভাগে প্রবেশ করিল, কেহ কৃষিকার্য্য করিতে লাগিল, ইত্যাদি। যদি বর্ণ অর্থে রঙ ধরিতে হয় তবে চারিবর্ণের মনুষ্য চারিপ্রকার ভিন্ন ২ রঙ্গের হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আর্য্যদের যে ভিন্ন ২ রং ছিল এবং সেই হেতু তাঁহাদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যদি আর্য্যেরা ভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিতেন তাহা হইলে ভারতের আদিম অধিবাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত নদী, পর্ব্বত, নির্ঝর ইত্যাদির নামও কিছু না কিছু তাঁহাদের আপন ভাষাতে নামকরণীকৃত হইত। মহাবীর সেকেন্দারের সময়ে ভারতে আগত গ্রীকগণ ভারতের নদীওনগরসমূহের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আপন ভাষাতে বিপাশাকে বিপৈসিক, চন্দ্রগুপ্তকে

ছাণ্ড্রাকোটাস্ পাটলিপুত্রকে পোলিপোতা ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছিলেন। যদি আর্য্যগণ সত্য সত্যই ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আগমন করিতেন তাহাহইলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতির নামের কিছু পরিবর্ত্তন দেখাযাইত।

রাক্ষস শব্দ ও ভিন্নজাতিবাচক নহে। উহা একটি শক্রবাচক শব্দ মাত্র। বাল্মিকিরামায়ণে লিখিত আছে—"পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষির্জনয়ামাস রাক্ষোরূপং দশগ্রীবম্" ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে পুলস্ত্যের সন্তান হইলেও রাবন কর্ম্মহীন হওয়ায় রাক্ষস সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

অনার্য্য শব্দও ভিন্ন জাতিবাচক নহে। যাহারা আর্য্যদের সমতুল্য সদাচারী ছিল না তাহাদিগকেই অনার্য্যনামে অভিহিত করা হইত। একই রামায়ণে রাবণকে অনার্য্য ও কৈকয়ীকে অনার্য্যাখ্যাপ্রদান করা হইয়াছে এক্ষণে আর্য্যজাতির সভ্যতার বিকাশ কিরূপে হইয়াছিল সেইবিষয়ে আলোচনা করা যাইক। আর্য্যগণ নব নব দেশ ভ্রমণ ও তাহারা স্বীয় করতলগত করিতে অত্যন্ত অভিলাসী ছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা উত্তর মেরুতেঁই যাত্রা করেন। যখন উত্তর মেরুতে যাত্রা করেন। তখন উত্তর মেরু মনুষ্যের বাসোপযোগী ছিল। উত্তর মেরু হইতে আর্য্যগণ গ্রীস্‌দেশে গমন করেন, কুকুটেলর প্রভৃতি একথার জাজ্জল্যমান সাক্ষী। মহামতি মোক্ষমুলার বলেন যে, আয়র্লণ্ডেও কিছুদিন আর্য্যগণ বাস করিয়াছিলেন। কেননা "আয়র" শব্দ আর্য্যশব্দেরই অপভ্রংশ। আমেরিকাতেও প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির যে সমস্ত লুপ্তচিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে কোলমৈন সাহেব বলেন যে মধ্য আমেরিকাতেও আর্য্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সকলে জানেন যে মেকিসকোর অধিবাসীরা হাতীর শুঁড় ও মনুষ্যদেহধারী দেবতাকে পূজা করিতেন। এই হস্তিশুণ্ডসমন্বিতদেবতা আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আবার পেরুর অধিবাসীরা রামসীতার যুগলমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ যে কেবল ভারতবিজয় সূচক তাহা নহে, ঐ যজ্ঞ সমগ্রপৃথিবীতে হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করিয়াছিল। ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত হিন্দু মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হইয়াছে তাহাতে সেখানেও যে একসময়ে হিন্দুর আধিপত্য বিদ্যমান ছিল না একথা কে বলিতে পারে? এইরূপে প্রাচীনকালে হিন্দু সাম্রাজ্য যে সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

তাহার এত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান সংকুলান হওয়া সুকঠিন। বস্তুতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সমগ্র বিশ্বজগতের ইতিহাস। যিনি জগতের প্রাচীনইতিহাস শিখিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে ভারতের ইতিহাস পড়িতেই হইবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

লঙ্কা বিজয়।

তৃতীয় সর্গ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শুনি শতশ্লেষউক্তি ভাঙ্গিলনা ধ্যান
কিম্বা খুলিলনা আঁখি ক্ষণেকের তরে
লঙ্কেশের, অতঃপর করি টানাটানি
বাহুধরি, আরম্ভিল সম্ভাষণ আদি
সবেগে, কিন্তু হে কবে? নেত্রাঘাতে টলে
গম্ভীর অতল স্পর্শ অকূল জলধি।

এইবার রাক্ষসের বিরাট সেনপু
ঢুকিতে লাগিল সবে ঢগয়ে যেমতি
দলে দলে ভীম রোলে ভীমরোলচয়
অকস্মাৎ হেরি পান্থ প্রাণান্ত করাইয়া
কেহবা চিবুক ধরেকরে টানাটানি
সবলে, আঁচড়ে তনু কামড়ে কেহবা
ঘন ঘন, লম্ফ দিয়া স্কন্ধ ধরে কেহ
মহাহর্ষভরে, কেহ উঠে শীর্ষ দেশে
ধ্যানমগ্ন নীরবের, কেহবা আক্রমে
সবিক্রমে গ্রীবাদেশ, কেহ কাড়ি ক্রোধ
সজোরে আঘাতে শিরে, গিরিশূল যেন

অসংখ্য অশনি পাত যুগপৎ হয়ে
বিশ্বত্রাসী প্রতিধ্বনী করয়ে সৃজন
ঘন ঘন; অবিরাম সে বিবর মাঝে।

চন্দন চর্চ্চিত দেহ কেহ ভাসাইল
অবিশ্রান্ত প্রস্রাবের গৈরিক নিস্রাবে;
বিষম দশনাঘাতে কেহ বিদারিল
কমনীয় বপুপ্রান্ত, কেহবা ছিঁড়িল
প্রখর নখরে, আহা বহিলেক তায়
শত ধারে শোণিতের বৈতরিনী নদী।
অজিন, সিন্দুর, পুষ্প তুলসী চন্দন
বিল্বপত্র, ধূপ, ধুনা, হবি গঙ্গোদক
কুশাসন, কোষাকুশী নিক্ষেপিল দূরে
কেহ আসি দীপাবলী ফুৎকার করিয়া
নিভাইল, হোমকুণ্ড কেহবা ডুবালে
ভাঙ্গিল মঙ্গল ঘট পদাঘাতে কেহ।

আতপ তণ্ডুল আদি নৈবেদ্য নিকর
ছড়াইল তাড়াতাড়ি করি হুড়পাড়
আর আর প্রয়োজন আয়োজন যত;
পালাইল শুক্রাচার্য্য প্রমাদ গণিয়া
ত্যজিয়া দাক্ষিণ্য, দয়া, দক্ষিণার আশা।
এত কষ্ট এত দুঃখ এত নির্যাতন
তবু কিন্তু ভাঙ্গিলনা মহাধ্যান হায়
রাবণের হেরি, হেন একাগ্রতা তার
সন্ত্রস্ত বানরকুল; করে বলাবলি
না পারি করিতে যদি লণ্ড ভণ্ড আজি
এ কুকাণ্ড পাষণ্ডের, খণ্ড খণ্ড হব
রাঘবের সঙ্গে, পুনঃ পশিলে সংগ্রামে।

ছুটিল সুগ্রীব বীর রক্তিম নয়নে
রক্ষ অন্তঃপুর পানে; অনিন্দ্যসুন্দরী

শায়িতা শয়ন কক্ষে মন্দোদরী সদা
শশধর বিনিন্দিতা শত সতিনী সহিত।
ভাঙ্গিল চরণাঘাতে সুবর্ণ তোরণ—
নিমিষে; পশিয়া পুরঅন্তঃপুর মাঝে
সাপটী ধরিল মন্দোদরীর চিকুর;
আকর্ষিল বাহুদ্বয় চমকিল সবে
ভয়ে বিকম্পিত প্রাণে, তস্কর হেরিয়া
অকস্মাৎ গৃহমাঝে ব্যতিব্যস্ত যথা
গৃহস্থ, ভয়ে অজ্ঞান অসাড়,
কাঁদে রাণী করযোড়ে মিনতি করিয়া
সে বীরের কাছে, হায় ছাড়াইতে কর।
শুনিলনা তবু মন্দোদরীর রোদন
লয়ে গেল আকর্ষিয়া হড় হড় করি
বিষম বল প্রয়োগে, চলিল মহিষী
সঙ্গে আকর্ষণ বলে, যায় যথা পশু
অনিচ্ছায় বধ্যভুমে ঘাতকের কাছে
কত যে কাঁদিল রাণী স্মরি মেঘনাদ
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীরবাহু আদি
মহারথিগণে তার উদ্ধার করিতে।

কেহনা আসিল কিম্বা কেহনা করিল
একটু আপত্তি আসি এ বিপত্তি কালে।
ভুজঙ্গম কবলিত দর্দ্দুরেরমত
কাঁদিল কর্ব্বুরজায়া ধিক্কারী লঙ্কেশে।
রাবণের সন্নিধানে লয়ে মহাবীরে
আরম্ভিল নির্যাতন ইচ্ছামত সবে
খুলিল কবরী কেহ ছিড়িল কাঁচলি
উলঙ্গ করিল অঙ্গ বসন খুলিয়া;
ব্রীড়ান্বিতা সঙ্কুচিত ঢাকে কুচদ্বয়ে
করদ্বয়ে; কিন্তু রাখে কর আকর্ষিয়া,
কেহ ছিড়ে মুক্তামালা আরক্ত নয়নে

সজোরে কেহ বা করে প্রহার নিয়ত,
উচ্চৈঃস্বরে লঙ্কেশ্বরী করে হাহাকার
তবু নাহি ভাঙ্গিলেক রাবণের ধ্যান
কিম্বা ক্ষণমাত্র ; আঁখি নাহি উন্মীলিত।

প্রহৃতা মহিষী হায় কঠোর ভাষায়
সম্বোধি লঙ্কেশে শেষে পরুষ বচনে
কহিতে লাগিল, ওহে কি মন্ত্র জপিছ
আপন নাশিতে! তুমি দেখিছনা চেয়ে
করিছে বানর দল কি দশা আমার।

হা ধিক তাহার, যেই অক্ষম সতত
শত্রুর পীড়ন হতে কলত্র রক্ষিতে
তুমি না শমন জয়ী বাসব বিজেতা,
ভুবন কম্পিতা নাকি তোমার প্রতাপে
থর থর! ধিক্ ধিক্ বীর গর্ব্বে তার
বর্ব্বর, দুর্ব্বল যেই রিপুর সমীপে।
হে কর্ব্বুরকুল কালি ? ধ্যানে রত তুমি
হেথা আমি নিগৃহীতা বানরের করে।

এইবার লঙ্কেশের ভঙ্গ মহাধ্যান
হইল খুলিল আঁখি, বিংশতিভাস্কর
উদিল সহসা যেন মধ্যাহ্ণ আকাশে
খরতর কড়মড়ি দশননিকর
কহিল বর্ব্বর কুল ছাড় মতিধারে
নতুবা পাঠাব ওরে শমনসদনে
এখনি ; ছুটিল সবে হাসিতে হাসিতে
উল্লসিত মনে করি স্বকার্য্য সাধন।
বিবরিয়া এ অদ্ভুত ঘটনা নিচয়
নির্য্যাতন নিপীড়ন অপমান আদি
মহিষী ও রাবণের, প্রভুর সমীপে
বিরাম লভিল সুখে শ্রীরাম শিবিরে।

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

পাগলের প্রাণের দান।

কত দিবসরজনী অধীরকাতরপ্রাণ, কেঁদে আকুল হয় তোমার কারণে, কত অপরাধে অপরাধী হরি হে! যেন তোমার চরণে আধপ্রাণখানি লয়ে পড়ে আছি একা আমি এ মরুপ্রান্তরে। তোমার করুণা প্রসাদে আর্দ্রচিত্ত প্রকৃতি, উষার অরুণ কিরণরাগে, সুরভিকুসুমদামে তোমার রাতুল চরণ বিভূষিত করে। নয়নকল্প পল্লব প্রান্তগলিত নীহার বারিতে যেন তোমার চরণসরোজ বিধৌত করে। নিশাবসানে কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুজনছলে যেন তোমার অপার মহিমা গান করিতে থাকে। উচ্চচূড় ভূধরকুল, যেন তোমার প্রেমে বিগলিত হয়ে নির্ব্বিচ্ছেদে গলিতে থাকে। তোমার করুণা কণা, জীবনে অনন্তমুহূর্ত্তে, তোমার আহ্বান শান্তিময় আশ্বাস। আমি কাঙ্গাল ভিখারী, তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, আমি তোমায় আর কি উপহার দিব? একবিন্দু অশ্রু উপহার তোমার চরণে দিতে এসেছি। কাঙ্গালের তুচ্ছ ভক্তি উপহার গ্রহণ কর, আমি চরিতার্থ হইব, না লও পুনরায় কাঁদিয়া ফিরিয়া যাব।

কেন তুচ্ছ পার্থিব প্রণয়ের জন্য কাঁদা? কেন বিরহ মিলনে হর্ষ বিষাদ? শ্রীচরণরাজীর সঙ্গী হইতে পারি নাই বলে সার্থক রোদন করি নাই। তুমিই আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার এজীবনে স্বজনবন্ধু, তুমিই আমার হৃদয়রঞ্জন। স্বার্থমাখা জগতের নিকট কাঁদিয়া কিফল আছে? অধিকন্তু লোকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করে। অগণ্য নরমুণ্ড বলি দিয়া কতনারীর বৈধব্য যাতনা প্রদান করিয়া মহীপতি, স্বীয় স্বার্থসাধন করেন। অর্থ ভিন্ন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কলত্র সবাই পরাঙ্মুখ হন। এজগতে খাঁটী বলিতে যেন কিছুই নাই। বাহ্যজগতে অন্তঃজগতে সর্ব্বত্র কৃত্রিমতাময়। সমস্তই দোষগুণে মিশ্রিত, সমস্তই দুঃখ পরিণামী। তাই, তোমার করুণা, তোমার ভালবাসা যখনই মনে হয় তখনই আমার নয়ন অশ্রুময়হার গাঁথিতে থাকে। হা হতভাগ্য জীবন! হা মূঢ় হৃদয়! কেন তুই প্রেমসিন্ধু দয়াময় হরিকে ভুলে বিচেতন হয়ে আছিস্? কেন তুই জীবনের জীবন প্রাণের আরাধ্য দেবতা, একমাত্রবন্ধু দীনবন্ধুকে বিস্মৃত হয়ে রইলি? ধূলিখেলায়, বিরহমিলনে, হর্ষশোকে চিত্ত আর নাহি ধায়, তুমি আনন্দঘন, তুমি সচ্চিদানন্দ, তোমার সেই আনন্দে আমায় মিশাইয়ালও; যেন আমি তোমার চরণ—

সরোজমধুব্রত হয়ে সতত প্রেমমকরন্দ বিন্দু পান করিতে থাকি। এস এস হৃদয়রাজাপতি, হৃদয় সিংহাসনে এস, দেখাদাও প্রাণজুড়াও মোর্। তুমি জীবনসখা, আমার তৃষিত মনপ্রাণ সতত তোমাকেই চাহে। তুমি বিনে দুঃখ নিবারণ করিতে আর কে পারে। তুমি আমার এজীবনের একমাত্র ভরসা, তুমি আমার ভবসিন্ধু পারের কর্ণধার।

বাসনাবিহীন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও যখন তোমার গুণ শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন না, তখন, যে হতভাগা তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়, হায়? সেই প্রকৃত আত্ম-ঘাতী। আত্মঘাতীর নিস্তার নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহার পক্ষে দুস্তর নরক। মৃত্যুর অপর নাম কাল, কাল ভয়ে সবাই ভীত, কিন্তু, হে কালবরণ? যেজন তোমার শরণ লয়, তাহার কখনই কালভয় ভীতিপ্রদর্শন করিতে পারে না। এমন প্রাণী নাই যে, কালভয়ে ভীত নহে, কিন্তু, যেজন সতত তোমায় শরণ করে, তাহার মরণে কি ভয়? কিভয় তার্ মরণে, যেজন মরণহরণ চরণ স্মরণ করে?

তুচ্ছরূপাদি বিষয়ের মিলন বিরহে, কত সুখ দুঃখ পেয়েছি, মিলনে কত আনন্দ, বিরহে ঘোর বিষাদ, কত কান্না। যাহা নিমিষে মিলায়, যাহা স্বপ্ন রাজ্য, যাহার স্থিতি, চণ্ডশিখীশিখা তুল্য, তাহার জন্য বৃথা অশ্রুপাত করেছি। এখন বুঝেছি, সে ইন্দ্রজালের নট তুমি, তুমিই সেই অভিনয়ের নেতা। আমার জীবন লও, মন লও, আমায় লও আমার আমিত্বটুকুও লও, আমার অভিমান পশুগুলি স্বরূপ গ্রহণ কর। হা প্রেমনিধি! হা দয়াময়! দেখ, দাস, তোমার বিরহে আজ ধূলাবলুন্ঠিত, তোমার অভয়চরণোপান্তে পতিত, ধর ধর একবিন্দু তপ্ত অশ্রু। দেখা দাও প্রভো। প্রাণ বাঁচাও, হায়! আমি আর তোমার অদর্শন যাতনা সহিতে পারি না। যদি বাহিরে দেখা না দাও তবে অন্তরমুকুরে দেখাদিয়ে প্রাণমন সুধাধারায় প্লাবিত কর। আর মায়ার কুহকে, দিগ্ভ্রমে ফেলিয়া প্রাণান্ত যাতনা দিওনা, এখানেই অভিনয়ের ইতি কর। তুমি ভক্তের প্রেমগুণে বাঁধা, ভক্তের জন্য কিনা করেছ? জগতে অনন্ত অদ্ভুতলীলা প্রচার করেছ। তুমি দুর্ব্বলের বল, তুমি সাধন হীনের বল, তুমি শেষের সম্বল, তুমিই সারাৎসার, তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তুমি মহৎ অপেক্ষা মহান্। তুমি ভক্তরাজ ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জটিল, গোপ, গোপী প্রভৃতি কত সেবকজনে অপার করুনা করেছ, আমি আজ শোকভরা অশ্রু বিন্দুলয়ে চরণতলে দাঁড়ায়েছি, দয়া কি করিবেন না দেব?

আমার পিতা তুমি, মাতা তুমি, বন্ধু তুমি. শোকে দুঃখে তোমার কাছে না আসিয়া কোথায় যাবু? স্নেহ, মমতা, দয়া, বাৎসল্য, তুমিই জানাইয়াছ, সেই সেইগুণের আধাররূপেও তুমি। বিশ্বচরাচর তোমার বিভূতি, তুমিই আধেয়, তুমিই জ্ঞান, তুমিই জ্ঞাতা। কখনও তোমায় পিতা বলিয়া কখন মাতা বলিয়া ডাকি, কখনও প্রভু বলিয়া ডাকি। হে বিশ্ব, বিশ্ববিদ্যালয়, তুমি শিক্ষা দাতা, তুমি শিখাও আমারে, আমি কিবলে তোমায় ডাকিব, কিবলে তোমায় চিনিব, যে বলশালী, সে সাঁতার দিয়ে পাথার পার হ'য়ে যায়, যে ধনী সেধন দানে জলযানে পার হয়ে যায়, আর যে কাঙ্গাল, তাকে নাবিক দয়া করে পার করে। আমি কাঙ্গাল, তুমি কি অধমে পার করিবে না? কাঁদিলেই যদি তোমায় পাইত, ডাকিলেই যদি তুমি দেখা দিতে, তাহাহইলে কতশত নরনারী তোমার নিত্যধামে বিরাজ করিত। কিন্তু, সবাই কাঁদিতে জানে না, সবাই ডাকিতে জানে না, তাই, সবাই তোমায় পায় না। মনের গুণে শিষ্য তরে যায়, কত গুরু পড়ে থাকেন। আমার এই প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে "হা প্রভো" বলে কাঁদিতে পারি। কাঁদিতে ২ একদিন অবশ্যই তোমার দয়া হবে। তাই, আজ আকুলপ্রাণে, ব্যাকুল হয়ে, কেঁদে একবিন্দু অশ্রুজলে তোমার চরণমূলে উপনীত হয়েছি।

পূর্ণসনাতন তুমি তোমার সৃষ্টজগতে। নাথ! ঘোর অতৃপ্তিকেন, বস্তুর গুণের সমগ্রতা বিধানে, অসম্পূর্ণতা কেন? সমগ্র জগৎ একটানা ভাবে চালিত হয় না কেন? এক হাসি দিয়াই জগৎগঠিত করা নাই কেন? হাসিকান্নায় মিশাইয়া জগৎ গঠিলে কেন? মিলনের সহধাত্রী বিরহ কেন, যৌবনে জরা কেন? মরণ জন্মের অনুগামী কেন? এই দারুণ বৈষম্য কি নাথ! তোমার ইচ্ছায় অপসারিত হয় না? শ্মশানে কি কুসুম ফুটে না? তুমি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি ইচ্ছাময়, সর্ব্বশক্তিমান, তোমার ইচ্ছায় যদি ভাঙ্গা গড়া না হয়, তবে তুমি জগদীশ্বর কেন? তুমি চক্রী, তোমার চক্র আমি বুঝিব কেমনে? ভালমন্দ, আবার নয়ন, দেখে, মন, বিচার করে। সে বিচার সঙ্গত কিনা তা জানিনা। হয়ত, আমার সে বিষয়ে ভুল হতে পারে। তাহার জন্য আমি তোমায় কিছু বলিতেছি না, তুমি অপার্থিব প্রেম সোহাগে আমায় পার্থিব সুখস্মৃতি ভুলাইয়া দাও, অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনা পরম্পরা বিস্মৃতি সাগরে ভাসাইয়া দাও, এক

তারার ন্যায় স্বচ্ছন্দগাভিমুখে সুখী করিয়া রাখ। আমার কেহ নাই, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই, প্রতিপদে তোমার করুণা বুঝিতে পারি, কেবল তোমায় দেখিতে পাই না। প্রাণের ব্যথা তোমায় কহিতে পারি না, তাই আমি এ অশ্রু উপহার তোমায় দিতে এসেছি।

আমার জীবন ক্ষুদ্র, কিন্তু আশা অনন্ত, অবিতৃপ্ত, অপরিসীম। আমার প্রাণ চায় আনন্দ সিন্ধুতে মিশিতে, কিন্তু যাবার তরণি তোমার তরি, মন তাহাই চাহে। তুমি যদি আমার অতৃপ্তটুকু অবধি বিলোপ করিয়া দাও, তবে সেও আমার মঙ্গল। আমি মনে করি, আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, সম্পূর্ণ পরতন্ত্র। আমার ইচ্ছায় কিছুই ঘটে না, জগতের কোন একটি বিষয় আমার ইচ্ছায় সিদ্ধ হয় না। আমার ইচ্ছায় আমি ধনী হইতে পারিনা, আমার ইচ্ছায় আমি সুখী বা সুস্থ হইতে পারি না, আমার ইচ্ছায় আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। আমি সর্ব্বতোভাবে কাল, সমাজ, রাজশাসন, শাস্ত্রীয় বিধি প্রভৃতির অধীন, সুতরাং আমার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? যাহা এক মুহূর্ত্তে সুখের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাই পর মুহূর্ত্তে দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়েন্দ্রিয় স্পর্শজন্য অনুভূতি, দুঃখেরই কারণ হয়। সুতরাং জগতে সুখদুঃখেরও ব্যবস্থা নাই। অবিতৃপ্তমন, যাতনায় অধীর হয়ে কেঁদে তোমার চরণতলে আশ্রয় লতে এসেছে, দয়াময়! তুমি আশ্বাস না দিলে কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা পূরিবে না। তুমি নির্ম্মম হইয়া থাক, আমি অশ্রুপ্রবাহে তোমার চরণ বিধৌত করিব। যতদিনে হোক্ না, তোমার দয়ার প্রতীক্ষা করিতে নিবৃত্ত হইব না। তোমার প্রেমসিন্ধুর একবিন্দুতে আমার যে তৃপ্তি, তাহা পার্থিব জগতের কিছুতেই নাই। যদি থাকিত, তাহাহইলে মহাপুরুষগণ অতুলকামিনীকাঞ্চন বিসর্জ্জন দিয়ে, কখনই কাঙ্গাল বেশে তীর্থে তীর্থে বিচরণ করিতেন না। তাই বলি নাথ! আর অতীত-ভবিষ্যৎ চাহিনা, এখন আমার এ অশ্রুময় আঁখি মুছাইয়া দাও, আমার প্রাণের যাতনা দূর কর। তুমি শান্তিময় আমি চিরশান্তিহীন, তুমি আনন্দময় আমি নিরানন্দ, তুমি শক্তিমান, আমি দুর্ব্বল, আমি কতদিন অসহায় একাকী তোমার করুণা পাবার আশে "হা দীনবন্ধো!" বলে কাঁদিতেছি। কান্না ব্যতীত প্রাণের ভার লাঘব হয়না, কান্না ব্যতীত কাহারও দয়ার উদয় হয়না, রোদন ব্যতীত হৃদয়ের সহৃদয়তা প্রকাশ পায়না। যে জীবনে কখনও কাঁদে নাই, তাহার হৃদয় নাই। যে শোকে অশ্রুপাত নাই, তাহা সাক্ষাৎকৃতান্ত স্বরূপ। কান্নাই

হৃদয়শীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। আর্দ্রীভূত হৃদয়ই অশ্রুবিন্দুরূপে পরিণত হয়। শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু ভেদে অশ্রু দুই প্রকার। আমরা তোমার প্রেমাদরেও অশ্রুপাত করি, দুঃখ পাথারে পড়িয়া নিস্তারের জন্য তোমারই নিকট অশ্রুপাত করি। তুমি দুঃখ বিমোচন কর বলিয়াই তোমার চরণমূলে অশ্রুবিন্দুপাত করি। তোমার কৃপাপাত্র নর কোন বিপদেই অবসন্ন হয়না প্রহ্লাদাদি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তোমার করুণাধারাই জননী হৃদয়ে প্রবাহিত, নাহলে জীব বাঁচিত কি? তোমার করুণাধারাসার আনন্দবিন্দু যাহা পার্থিবজগতে বিরাজমান তাহাকেই মানব স্বকৃতার্থ বোধ করে; তাই গোষ্পদে প্রণয়ী মানব সিন্ধুপানে অগ্রসর হয়না। নাথ! এদগ্ধপ্রাণ গোষ্পদেতৃপ্ত নহে সিন্ধুসমাগমে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পথ প্রদর্শক তুমি, কৃপাকরে অনায়াসেই দরিদ্রের মনোরথ পূরণ করিতে পার। আমার মনেহয় তোমায় পাবার অপর সাধনভজনবৃথা, যেগুণে তোমায় বাঁধা যায় তাহাই প্রকৃত সাধন।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী।

(যশোহরের প্রাচীন কৃত্তি কাহিনী)

জেলা যশোহরের কালেক্টারীতে ৯৩৭ নং খারিজা তালুক দেখা যায়; রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর নামে ঐ তালুক লেখাযায়, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে রামশরণ ব্রহ্মচারীও বলে। রামকৃষ্ণ গঙ্গারামপুরে বাস করিতেন। আমরা প্রাচীন কাগজপত্রে রামকৃষ্ণ ও রামশরণ ব্রহ্মচারী একই ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি। রামকৃষ্ণের বংশাবলীর চিহ্ন মাত্র আর নাই। রামশরণের ব্রহ্মনাথ নামে পুত্র ও ব্রহ্মময়ী নামে কন্যা ছিল; রামশরণ ব্রহ্মচারীর প্রতিবেশী ছিলেন রামবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার জ্ঞাতি ছিলেন। রামরুদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রামরুদ্রের কন্যা কালীতারা ও ব্রহ্মময়ী উভয়ে "সই" ছিলেন। ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী যৌবনে যোগী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মনাথের সংসারে কিছুমাত্র মমতা ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণ, গীতা, ও তন্ত্রে

তাহার অতিশয় আসক্তি ছিল ; প্রত্যূষে কুসুম চয়ন, তুলসী বিল্বদল সঞ্চয় ও ... আরাধনা জপ তপে ব্রহ্মনাথের সময় কাটিয়া যাইত।

বাসুদেবের ভগ্নি সুভদ্রার স্থায় ব্রহ্মময়ী ও ভ্রাতার অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। যৌবন মুকুল বিকাশ হওয়াও ব্রহ্মময়ীর বিবাহ হয় নাই। কালীতারাও ব্রহ্মময়ীর স্থায় কুমারী ছিলেন। ব্রহ্মনাথ কালীতারা ও ব্রহ্মময়ীকে সকলে যোগী ও যোগিনী বলিয়া জানিত। বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী পাত্র অনুপযুক্ত বলিয়া সম্বন্ধ ফেরত দিতেন। তাহাতে সকলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ ও নিন্দা করিত। রামরুদ্র ও রামশরণ সে কথায় দৃক্পাতও করিতেন না। প্রত্যূষে ফুল তোলা ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মময়ী ও কালীতারার একটী রোগ ছিল। এক দিবস শরতের উজ্জ্বল চন্দ্রমালোকে আকাশে ঈষৎ মেঘের সঞ্চার হওয়ায় এবং পাপিয়া ও কোকিলের মধুর সঙ্গীত বিশেষে, বৈরালের অমিয় পূর্ণ নিক্কণে, রজনী প্রভাত অনুমিত হওয়ায় ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী নিদ্রোত্থিত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং রজনী প্রভাত হওয়াই অনুমান করিলেন। ফুল তোলা সম্বন্ধে ব্রহ্মনাথ, ব্রহ্মময়ীর একটু বিদ্বেষী ছিলেন। কারণ ব্রহ্মময়ী যে ফুল তুলিতেন তিনি তাহা তাহার স্বহস্তে দিতেন। কালীতারা তাহা তাহার পিতাকে দিতেন। সুতরাং ব্রহ্মময়ীর চয়িতকুসুমে ব্রহ্মনাথের কোন উপকার হইত না বলিয়া ব্রহ্মময়ীর অজ্ঞাতে ব্রহ্মনাথ উঠিয়া ভোরে ভোরে ফুল তুলিতে যাইতেন। আজও ব্রহ্মনাথ তাহাই করিলেন। রামবল্লভ ও রামরুদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই বাটী ছিল। রামবল্লভের পূর্ব্ব পোতার ঘরের দক্ষিণের পার্শ্বে একটী বৃহৎ শেফালিকা ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছে যথেষ্ট ফুল ফুটিত। পাড়ার ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ঐ ফুলে পূজা করিতেন। কাজেই পাড়ার সমস্ত বালক বালিকারাই "আমি আগে ফুল তুলিব।" এই জেদে সকলেই ভোরে উঠিতে চেষ্টা করিত। কালীতারা ব্রহ্মময়ীও ফুল তোলার সম্পূর্ণ গ্রাহিকা ছিলেন। আজ ভোরে উঠিয়া ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী সেই জেদ বজায় রাখিতে সাজি লইয়া ঐ সময় ফুল তুলিতে গেলেন। শেফালিকা তলায় ফুল তুলিতে যাইয়া ব্রহ্মনাথ দেখিলেন তলায় সামান্য দুই চারিটি ফুল পড়িয়াছে। "সর্ব্বনাশী কালীতারা ও ব্রহ্মময়ী তবে বুঝি আগে আগেই ফুল গুলি তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।" ক্রোধে ব্রহ্মনাথের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মনাথ ক্ষণকাল স্তম্ভিতের স্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ; এমন সময় শরতের

শীতল বায়ু হঠাৎ বেগে বহিতে লাগিল। অমনি ঝর ঝর করিয়া বৃক্ষ হইতে ফুল পড়িতে লাগিল। তখন ব্রহ্মনাথ বিস্মিত হইয়া অমনি শেফালিকা গাছে উঠিয়া ঝাঁকি দিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রচুর ফুল মাটিতে পড়িল। ব্রহ্মচারী তাড়া-তাড়ি বৃক্ষ হইতে নামিয়া আহ্লাদ সহকারে ফুল তুলিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন পাড়ার অপর বালক বালিকারা এখনও ফুল তুলিতে আইসে নাই। "পোড়ার মুখী কালীতারা ব্রহ্মময়ী এখনও ঘুমিয়া আছে, তবে আজ আর একটী ফুলও কাহাকে লইতে দিব না।" এই আহ্লাদে আটখানা হইয়া ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী একমনে ফুল তুলিতে লাগিলেন। এইরূপে ফুল তুলিতে তুলিতে তাঁহার দৃষ্টি ইতঃস্তত পড়িল। ব্রহ্মনাথ দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে ব্রহ্মময়ী ও কালীতারা ফুল তুলিতেছে। তখন ব্রহ্মনাথ বলিয়া ফেলিলেন, "পোড়াঁর মুখীরা, তোরা জানলি কেমন ক'রে? যে আমি এত ভোরে আসিয়া ফুল তুলিতেছি?" ব্রহ্মময়ী ও কালীতারা ঈষৎ হাস্য করিল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। এদিকে ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী রাগে গর্ গর্ করিয়া তীব্র হস্তে ফুল তুলিয়া যেমন সাজি পুরিতে লাগিলেন, অমনি কালীতারা ও ব্রহ্মময়ী তাহার অজ্ঞাতে অলক্ষিতভাবে তাহা অপহরণ করিতে লাগিল। বারম্বার ব্রহ্মনাথ এইরূপে তাঁহার সাজি খালি দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মময়ী ও কালীতারাকে গালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যাদ্বয় তাহার একটী কথারও উত্তর দিলেন না। ক্রমে ব্রহ্মনাথের স্বর গগন ভেদী হইতে লাগিল। তখন রামবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার স্ত্রীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তাহারা ব্রহ্মনাথের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। এত রাত্রে ব্রহ্মনাথ কেন চীৎকার করে, কি জন্য কাহার সঙ্গেই বা ঝগড়া করিতেছে জানিতে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রামবল্লভ দ্বার খুলিয়া একেবারে ব্রহ্মনাথের সম্মুখীন হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপ, ব্রহ্মনাথ এত রাত্রে ফুলতলায় কাহার সহিত কলহ করিতেছ?" তদুত্তরে ব্রহ্মনাথ কালী-তারার ও ব্রহ্মময়ীর ঘটনা সবিস্তর বর্ণন করিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন "কৈ বাপু তারা কৈ?" ব্রহ্মনাথ ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কালীতারা ব্রহ্মমুখীকে না দেখিয়া বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া তাহারা পলাইয়া গিয়াছে। তখন রামবল্লভ ব্রহ্মনাথের কথা শুনিয়া ইহাতে কোন গুঢ়রহস্য নিশ্চয় আছে স্থির করিয়া ব্রহ্মনাথকে লইয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং বলিলেন বাপু রাত্রি বেশী

আছে তুমি আমার বিছানায় শয়ন করিয়া থাক, প্রভাত হইবা মাত্র আমি তোমাকে তুলিয়া দিব, তুমি ফুল তুলিয়া বাটী যাইও"। প্রবীণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ব্রহ্মনাথ আর কোন আপত্তি না করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

রামবল্লভ এই অদ্ভুত গুঢ়রহস্য ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ রামরুদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘুম ভাঙ্গাইয়া উঠাইলেন, এতরাত্রে রামবল্লভ আমাকে কেন ডাকিতেছে এই বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রামরুদ্র দ্বারখুলিয়া রামবল্লভের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামবল্লভ শেফালিকার তলায় ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারীর সমস্ত কথা রামরুদ্রকে জানাইলেন। শুনিয়া রামরুদ্র গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কাশীতারা ঘুমিয়া আছে; তখন রামরুদ্রওরামবল্লভ ফিস্ ফিস্ করিয়া দুইচারিকথা বলিয়া একেবারে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণকে ডাকিয়া জাগাইলেন, রামকৃষ্ণ বাহিরে আসিয়া রামবল্লভের নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তখন ব্রহ্মচারী বিস্ময়ে চকিতের ন্যায় ঘরে গিয়া দেখেন যোগিনী ব্রহ্মময়ী যোগমায়ার কুহকনিদ্রাভোরে মাতা শকুন্তলাদেবীর ক্রোড়ে বিভোরনিদ্রায় অভিভূতা আছেন। এই বিস্ময়জনক ব্যাপার কি; তিনজনে তাহার রহস্য কিছুই ভেদ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ শেফালিকা তলায় গমন করিলেন। তখন রাত্রিও শেষ হইয়াছে। দৈয়ালগণ মধুর শিষ্ দান করিতেছে, পাখীসকল চতুর্দ্দিকে রব করিতেছে; উষার প্রদীপ্তরঞ্জিত রেখা পূর্ব্বাচলে ভাসিত আরম্ভ করিয়াছে। মৃদুমন্দ মলয়ানিলে শেফালিকাতলায় ঝর্ ঝর্ করিয়া শেফালিকা ফুল পড়িতেছে, রাশিকৃত ফুল তলায় পড়িয়াছে তাহাহইতে একটি ফুলও যে কেহ তুলিয়াছে তাহা বোধ করিতে পারিলেন না। অবস্থাদেখিয়া তিনজনে যাহার পর নাই চমৎকৃত হইলেন, এবং এ নিশ্চয় দৈবঘটনা ভাবিয়া পরস্পর আপনাপন বাটীঅভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঘটনা সম্বন্ধে সকলেই ক্রমে জানিতে পারিলেন; গ্রামের লোক কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কৌতুক প্রিয়া কামিনীমণ্ডলে এই কথা প্রকাশ হইবা মাত্র সকলেই "ওমা, একি দৈবের খেলা বলিয়া আপনাপন মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল, কেহ বলিল ও পরীদের খেলা, বিমান হইতে পরী আসিয়া কাশীতারা ব্রহ্মময়ীর রূপ ধরিয়া ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ বলিল। "বোন ও তা" নয়, বিদ্যাধরীর কাণ্ড" কেহ বলিল আমার জানা আছে অলকা হইতে আসিয়া যক্ষিনীরা

ঐরূপে ফুল তুলিয়া লইয়া থাকে। কেহ বলিল, অপ্সরীরা স্বর্গ হইতে আসিয়া ঐরূপে মালা গাঁথিবার জন্য ফুল তুলিয়া লইয়া যায়। এইরূপে গ্রামমধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, কৈলাস হইতে যোগিনীরা আসিয়া হরগৌরীপূজার জন্য ঐরূপ রোজ রোজ ফুল তুলিয়া লইয়া থাকে। এবম্বিধ নানাকথা হইল। যে হউক, রীতিমত প্রভাতসময়ে আবার ব্রহ্মনাথ উঠিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কালীতারা ও ব্রহ্মময়ীর এবং পাঁড়ার অন্যান্য বালকবালিকার সহিত ফুলতোলা-কার্য্য শেষ করিলেন। ঐ দিন হইতে ব্রহ্মনাথের মনে এক অভুতপূর্ব্ব ঐশভাবের উদয় হইল। তাঁহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরপ্রেমের ঢেউ খেলিতে লাগিল। সেইদিনাবধি ব্রহ্মনাথ সংসার-কার্য্যে আরও উদাসীন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে রামশরণ ও শকুন্তলার শাসনে কোন সময় সংসার-কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, কিন্তু ঐ দিন অবধি ব্রহ্মনাথের সংসার-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত উন্মনা হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বদা ঐ গভীর ব্যাপার লইয়া সমালোচনা করিতে২ তাঁহার হৃদয়ের বেগ উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় প্রবল হইতে লাগিল। একদিন ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী নিদ্রা-ঘোরে উঠিয়া সেই অমাবস্যার নিশীথে একাকী নবগঙ্গানদীর দিকে যাইতে লাগিলেন। রাজারাম চক্রবর্ত্তীর পর-পুরুষগণের নূতন নির্ম্মিত বাটীর পূর্ব্ব-ধারে নবগঙ্গানদীর তীরে "বাগ্‌গাড়ীয়া" নামক একটী স্থান আছে—ঐ স্থান গঙ্গারামপুরের মহাশ্মশান। এখনও ঐ বাগ্‌গাড়ীয়া-শ্মশানে গঙ্গারামপুরের অনেকে শবদাহ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী একেবারে গিয়া সেই শ্মশান-সৈকতে উপনীত হইলেন এবং দূর হইতে নদীর ঘোর বীচীমালা অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি গঙ্গে! তোমার এই অনন্তস্রোতে কত শত প্রাণী ভাসিয়া গিয়াছে; তুমি জায়গায় থাকিয়াই ত সেই হাসি-তরঙ্গের ঢেউ খেলাইতেছ; মা! তোমার অনন্তলীলা"। ব্রহ্মনাথ আবার বলিলেন, "হে শ্মশান! তুমি কত মানুষের শব দাহ করিয়াছ, তুমি ত চির-দিনই ঐ স্থানে আছ, সে সকল জীবাত্মার দেহপুঞ্জ তো তোমার ঐ সৈকতে লীন হইয়া গিয়াছে। আবার শব আসিবে, তুমি আবার দাহ করিবে। তোমার কি আশার আশ্বাসনীশক্তির ইয়ত্তা নাই?" বলিতে বলিতে ব্রহ্ম-নাথের নয়নাপাঙ্গে নীহারবিন্দুর ন্যায় বারিবিন্দু টুপটুপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। একধারা উদগত, অপর ধারা নির্গত—এই অবসরে ব্রহ্মনাথ দেখিলেন, মুণ্ডমালিনী ঘোরা করালবদনীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ দক্ষিণাকালীর ন্যায় কালীতারা দাঁড়াইয়া আছে, অসংখ্য শেফালিকা ফুল, ব্রহ্মময়ী, মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে। ব্রহ্মনাথকে দেখিবা মাত্র কালীমূর্ত্তি অদৃশ্যা হইলেন; তখন ব্রহ্মনাথ বুঝিলেন—কৈলাশবাসিনী ব্রহ্মময়ীই আমার ভগিনী ব্রহ্মময়ী এবং আদিবিদ্যা কালী ও কালীতারা একই বস্তু। তখন ব্রহ্মনাথ

কালীতারা ও ব্রহ্মময়ীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই অবধি ব্রহ্মনাথ, কালীতারা ও ব্রহ্মময়ীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাদিগকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই সময় হইতে ব্রহ্মনাথ সম্পূর্ণরূপে সংসারবিবেকী হইয়া উঠিলেন; ঘোর বৈরাগ্য-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রামশরণ ব্রহ্মচারীর বা শকুন্তলা-দেবীর শাসনে ব্রহ্মনাথ আর সংসার-ধর্ম্মে লিপ্ত হইলেন না। পর্ব্বত-নিঃসৃত নদীর বেগ কে সম্বরণ করিতে পারে? কিছুদিন পরে ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী, শেফালিকা-কুসুমচয়ন হইতে বাগ্‌গাড়িয়ার শ্মশানে সেই অমানিশার ঘোরা-যামিনীতে সেই ভীষণমূর্ত্তি কালীতারা ও ব্রহ্মময়ীর সংসার-খেলা সবিস্তর পিতামাতার নিকট বর্ণন করিলেন। কালীতারা ও ব্রহ্মময়ী তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত শুনিলেন। সেই দিন নিশীথসময় ব্রহ্মনাথ, কালীতারা ও ব্রহ্মময়ীর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। গ্রামের সমস্ত লোক দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। অবশেষে বহু সমালোচনার পরে স্থির হইল, ইঁহারা নিশ্চয়ই শাপ-ভ্রষ্ট, কি ভাবে আসিয়া মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এতদিনে শাপ মুক্তি হইয়াছে, ইঁহারাও উদ্ধার পাইয়া স্বস্থানে গিয়াছেন। তৎপর বাগ্‌গাড়িয়ার শ্মশানে ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারীর ও ব্রহ্মময়ী কালীতারা যোগিনীর কোমল দেহ যথাশাস্ত্র সকলে অনলে ভস্মীভূত করিলেন। আমরা বহু প্রাচীনের মুখে এই উপাখ্যানটী যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল পাঠকগণের নিকট তাহাই উপস্থিত করিলাম।

পুত্রকন্যাশোকাতুর রামশরণ ব্রহ্মচারী ও শকুন্তলা দেবী তদবধি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরও দৃঢ়ীভূত হইলেন। তদবধি রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রতি অমাবস্যার ঘোর নিশীথে বাগ্‌গাড়িয়ার শ্মশানে উপস্থিত হইয়া মুক্তিদায়িনী মুক্তকেশী কৈবল্যদায়িনী মুণ্ডমালিনী শ্মশানকালীর উপাসনা করিতেন। আমরা আরও শুনিয়াছি, তিনি কোনও ২ বহুল-যামিনীতে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইতেন—শবারূঢ়া লোলরসনা শ্মশানকালী শ্মশানে দাঁড়াইয়া আছেন, আর একজন উপাসিকা যোগিনী তাঁহার বিমলকোকনদরঞ্জিত পাদ-যুগলে শেফালিকাফুলের অঞ্জলিপ্রদান করিতেছে। সেই শব-দেহই তাঁহার পুত্র ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মচারী, করালবদনী কালীতারা এবং উপাসিকা ব্রহ্মময়ী। রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী যে নিশীথে বাগ্‌গাড়ীয়ার শ্মশানে এই মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে তিনি সামগানের সহিত সুর মিশাইয়া যে আধ্যাত্মিক গান গাহিয়াছিলেন, পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, :—

"কৈবল্যদায়িনী উমা কুণ্ডলিনী, শ্মশানবাস কেন ধরেছিস্?
তুই রাজার নন্দিনী, জগজ্জননী, এসে জনশূন্য স্থানে কেন রয়েছিস্?
তোর কৈলাসে রাজত্ব, কাশীতে রাজত্ব, সে সব বিলাশিনীতত্ত্ব কেন ভুলেছিস্,—
তুই ভিখারীর ঘরণী, ওমা ভব-ভিখারিণী, তাই রুধিরপান বুঝি করেছিস্।"

হ'য়ে রাজরাজেশ্বরী হলি দিগম্বরী, সেখানেত রাণী সেজেছিস্,
এসে বাগ্ গাড়ীর শ্মশানে, সুধা-শোণিতপানে, যো[illegible]
তুই কালীঘাটের কালী, ওমা মুণ্ডমালী, এসে শ্মশা[illegible]
ও মে তুই নিজে ব্রহ্মময়ী, আমার কন্যা ব্রহ্মময়ী, কি গুণে তারে মা করেছিস্ !!
তোর পুত্র—গণ আমার পুত্র ব্রহ্মনাথ, তারে কেন সঙ্গী করেছিস্ !
তুই নিজে রুদ্রদারা, রুদ্রকন্যা কালীতারা, তার রূপে কেন সেজেছিস্ !
এই ভবরঙ্গমাঝে একি অভিনব রঙ্গ—কি খেলা মা তুই খেলেছিস্,
তারা পদরেণু, জীবপরমাণু রেণু রেণু ক'রে তাই মেখেছিস্ ॥

ইহারপর রামশরণ ব্রহ্মচারী সস্ত্রীক কাশীবাসী হয়েন। আমরাও এই প্রাচীন সাধক জীবনের কথা এইখানে শেষ করিলাম।

শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞান মপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। অহং সর্ব্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (সম্যগন্তর্যামি-রূপেণ প্রবিষ্টঃ) (অস্মাৎ হেতোঃ) মত্তঃ (আত্মনঃ) (প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া) স্মৃতিঃ (ভবতি) (বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং) জ্ঞানং (ভবতি) অপোহনঞ্চ (তয়োরভাবশ্চ) (ভবতি) সর্ব্বৈঃ বেদৈশ্চ অহমেব (পরমাত্মা তত্তদ্দেবতারূপেণ) বেদ্যঃ (বেদিতব্যঃ) বেদান্তকৃত্ (লোকে শিষ্যেভ্যঃ আচার্য্যরূপেণ বেদান্তার্থপ্রকাশনকর্ত্তা অহমেব, জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ) বেদবিচ্চ (বেদার্থবেত্তাচ) (অহমেব) ১৫

বঙ্গানুবাদ। আমি সকল প্রাণীর দেহে জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট, আমা হইতে স্মৃতি ও জ্ঞান উদিত হয়, আবার সেই জ্ঞান ও স্মৃতির অভাবও আমার দ্বারাই হইয়া থাকে। বেদ সকলের দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য। আমিই আচার্য্যরূপে বেদান্তার্থ-প্রকাশক। আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা। ১৫

আলোচনা। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবানের সর্ব্বকর্তৃত্ব [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। ভগবান্ সর্ব্বপ্রাণীর হৃ[illegible] অন্তর্যামিরূপে অবস্থি[illegible] প্রাণিগণের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ে[illegible] স্মৃ[illegible] এবং [illegible] ইন্দ্রিয়সংযোগজন্য জ্ঞানের প্রকাশ করেন। জ্ঞানস্মৃতির বিলোপও তৎকর্তৃকই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভগবান্ই বেদসকলে তদুক্ত দেবতারূপে জানিবার বিষয়

এবং তিনিই বেদাচার্য্যরূপে বেদের অর্থ-প্রকাশক এবং বেদার্থ-পরিজ্ঞাতা। এতদ্দ্বারা ভগবান্ বুঝাইলেন যে, জীবের কর্তৃত্ব কিছুই নহে, সমস্তই ভগবান্ হইতে সম্পন্ন হয়। ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

সান্বয়ব্যাখ্যা। ক্ষরঃ অক্ষরশ্চ ইতি) দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে (সংসারে প্রসিদ্ধৌ) সর্ব্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তানি শরীরাণি) ক্ষরঃ (নশ্বরঃ পুরুষঃ) (অপরঃ অক্ষরঃ পুরুষস্তদ্বিপরীতঃ অবিনশ্বরঃ) কূটস্থঃ (কূটঃ রাশিঃ, শিলারাশিঃইবস্থিতঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ কারণস্বরূপঃ চেতনাস্বরূপঃ) (সতু) অক্ষরঃ (অবিনশ্বরঃ পুরুষঃ) ইত্যুচ্যতে। ১৬

বঙ্গানুবাদ। "ক্ষর" "অক্ষর" এই দুই পুরুষই ইহ সংসারে প্রসিদ্ধ। স্রষ্টার কার্য্যরূপ ভূতগণ ক্ষর অর্থাৎ নাশশীল এবং কারণরূপ মায়াধিষ্ঠিত পুরুষ অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী। অক্ষরপুরুষই কূটস্থ বলিয়া কথিত হন। ১৬

আলোচনা। ভগবান্ এই অধ্যায়ে আপন স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া তাঁহার ক্ষরভাব ও অক্ষরভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ৭ম অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে ভগবান্ তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতির যে পরিচয় দিয়াছেন, ক্ষর অক্ষরও তাহারই রূপান্তর ভাবমাত্র। ভগবন্মায়ার বিকাশস্বরূপ উৎপত্তি ও বিকাশশীল পদার্থ-মাত্রই ক্ষর। ক্ষর অর্থ নাশশীল এবং তদ্বিপরীত নির্ব্বিকাররূপে অবস্থিত কারণ-স্বরূপ অবিনশ্বর বস্তুই অক্ষর কূটস্থ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যোলোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর॥ ১৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। অন্যঃ তু (এতাভ্যাংক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ) উত্তমঃ (উৎকৃষ্টতমঃ) পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (বেদান্তেষূক্তঃ) সঃ অব্যয় ঈশ্বরঃ লোকত্রয়ং (ত্রিলোকীং) আবিশ্য (প্রবিশ্য) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ১৭

বঙ্গানুবাদ। আর এক উত্তমপুরুষ "পরমাত্মা" নামে অভিহিত হন। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রিজগৎ প্রতিপালন করেন, তিনি অব্যয় ও ঈশ্বর।

আলোচনা। সৃষ্টি ও সৃষ্টির হেতুভূত মায়া-শক্তির অতীত, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম অন্য পুরুষ "পরমাত্মা" নামে অভিহিত। তিনি ত্রিজগৎকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় ও ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু গীতায় খ্যাত পুরুষ তিন—ক্ষর অক্ষর এবং উত্তম। ক্ষর-পুরুষ সর্ব্বভূত, অক্ষর-পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ এবং উত্তমপুরুষ পরমাত্মা ভগবান্। ১৭

যস্মাত্ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। (এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনোনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি) যস্মাত্ (নিত্যমুক্তত্বাত্) অহং ক্ষরমতীতঃ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক-সংসাররূপ

অশ্বত্থাখ্যং অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাদপি (চেতনবর্গাদপি) উত্তমশ্চ (নিয়ন্তৃত্বাৎ) অতঃ (অতএব) লোকে বেদেচ পুরুষোত্তমঃ (ইতি) প্রথিতঃ (প্রখ্যাতঃ) অস্মি (ভবামি) ১৮।

বঙ্গানুবাদ। আমি ক্ষর হইতে অতীত, অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট, এজন্য লোকে ও বেদে আমার পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধি। ১৮

আলোচনা। ভগবান্ ক্ষর অর্থাৎ নশ্বর জড়পদার্থের অতীত এবং অক্ষর অর্থাৎ চেতনপদার্থ হইতেও উত্তম, এজন্য লোকে বেদে ও পুরাণে ভগবান্ "পুরুষোত্তম" বলিয়া খ্যাত। ১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
সসর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে ভারত (অর্জ্জুন) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিতঃনিশ্চিতমতিঃসন) যঃ পুরুষোত্তমং মাং জানাতি, স সর্বভাবেন (সর্বথা) মাং ভজতি। (ততশ্চ) সর্ববিদ্ (সর্বজ্ঞঃ) ভবতি। ১৯

বঙ্গানুবাদ। যিনি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্ববিদ্ ও সর্বজ্ঞ। ১৯

আলোচনা। পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে যিনি অবগত হইতে পারেন, সংসারে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারমুক্ত, তিনিই জীবন্মুক্ত। ১৯

ইতিগুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে অনঘ (নিষ্পাপ) ভারত (অর্জ্জুন) ইতি গুহ্যতমং (অতিগোপ্যং রহস্যং) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তং (যোঽপি কোঽপি) এতৎ (যৎ মদুক্তং) বুদ্ধা (জ্ঞাত্বা) বুদ্ধিমান্ (সম্যক্জ্ঞানী) কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ (কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ। এতদ্ধি জন্মসাফল্যমিতি।) ২০

বঙ্গানুবাদ। হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট এই যে অতি গুহ্যতম শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি আত্মজ্ঞানযুক্ত ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ২০

আলোচনা। ভগবত্তত্ত্ব জানাই সংসারের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃকার্য্য। এই অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার নাম পুরুষোত্তম-যোগ। যিনি ভগবদ্ভক্তি-জ্ঞানে এই পুরুষোত্তমযোগ ভক্তির সহিত শ্রবণ-মনন-ধারণ করিতে পারেন, তিনি ইহলোকে সংসারের অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। ২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সংকর্ম্ম। হুগলী—বিলসরা-গ্রামের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাবুর পত্নীর নামানুসারে চতুষ্পাঠীর নাম হইয়াছে "মহামায়াচতুষ্পাঠী"। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ইতঃপূর্ব্বে স্বগ্রামে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চিকিৎসালয়ে প্রাণদান, আর চতুষ্পাঠীতে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু সৎকর্ম্মই করিতেছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কংগ্রেসের সভাপতি। মাননীয় শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় মহাশয় কলিকাতার আগামী বিশেষ-কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হইবেন। যোগ্যপাত্রে সম্মান-দান সুন্দর ব্যবস্থা।

সৎসঙ্কল্প। মাগুরা-চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় একটী দাতব্য-চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠার্থে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হস্তে ৬ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সৎকল্প সুসিদ্ধ হউক।

'বহুরূপ' তারা-পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ।

জুন, ১৯২০ খৃঃ অঃ।

বহুরূপ তারার অবস্থান।		নাম।			পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।
০৮৪৮০৩	ক্ষুদ্রসর্প	রাশির	S.	তারা	০৮০৯	১১°০ অপেক্ষা ছোট।
০৯৪২১১	সিংহ	,,	R.	,,	১২০৮	৮৯
১০৩৭৬৯	সপ্তর্ষি	,,	R.	,,	১০০৯	১১°০ অপেক্ষা ছোট।
১২৩১৬০	,,	,,	T.	,,	১০০৯	১১°০ ,, ,,
,,	,,	,,	,,	,,	১৬০৯	১০°৯
১২৩৪৫৯	,,	,,	RS.	,,	১০০৯	১১°০ অপেক্ষা ছোট।
১২৩৯৬১	,,	,,	S.	,,	১০০৯	৮°৬

অবস্থান।	বহুরূপ তারার নাম।				পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।
১৩২৪২২	হৃদসর্প	রাশির	R,	তারা,	০৮০৯	৮·৯
১৫১৫২০	তুলা	,,	S.	,,	০৮১০	১০·৪ অপেক্ষা ছোট।
১৫১৭৩১	উত্তর কিরীট	,,	S	,,	০৮১০	১০·৭
১৫৪৪২৮	,,	,,	R.	,,	০৮১০	৬·৪
১৬২১১৯	হরকুলেশ	,,	U.	,,	০৯১০	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
১৬৩১৩৭	,,	,,	W.	,,	০৯০৯	১১·০ ,, ,,
১৬৩২৬৬	তক্ষক	,,	R	,,	০৬০৯	৯·৪
১৭০২১৫	সর্পধারী	,,	R.	,,	০৬০৯	৮·৪
,,	,,	,,	,,	,,	১৮১০	৮·৬
১৭৫[illegible]১৯	হরকুলেশ	,,	RY.	,,	০৯১০	১১·৭ অপেক্ষা ছোট।
১৮০৫৩১	,,	,,	T.	,,	০৮১১	১০·৮
,,	,,	,,	,,	,,	১৬০৯	৯·৬
,,	,,	,,	,,	,,	২৯১০	৮·৫
১৮৪২০৫	গরুড়	,,	R.		০৬১০	৫·০
১৮৪৩০০	,,	,,	নূতন	,,	০৯১১	৮·৬
১৯৩৪৪৯	বক	,,	R.	,,	০৬১০	১১·৪
,,	,,	,,	,,	,,	১৯০৯	১১·৮
১৯৪০৪৮	,,	,,	RT.	,,	০৬১০	৮·৪
,,	,,	,,	,,	,,	১৯০৯	৭·৮
,,	,,	,,	,,	,,	২৯১১	৭·৫
১৯৪৬৩২	,,	,,	Chi.	,,	০৯১১	৭·০
,,	,,	,,	,,	,,	১৯১১	৫·৮
,,	,,	,,	,,	,,	২৮১১	৫·৪
২০০৯৩৮	বক	,,	RS.	,,	১০১০	৭·৮
,,	,,	,,	,,	,,	১৯১১	৮·৩
২০১৪৩৭	,,	,,	P.	,,	১০১০	৪·৯
২০৩৮৪৭	,,	,,	V.	,,	১৬১০	১০·৮
,,	,,	,,	,,	,,	২৮১১	১০·৫
২১০৮৬৮	শেফালী	,,	T.	,,	১৬১০	৮·৬
২১৩৮৪৩	বক	,,	SS.	,,	১৬১১	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
,,	,,	,,	,,	,,	১৮১১	৮·৪
,,	,,	,,	,,	,,	১৯১০	৮·৩
,,	,,	,,	,,	,,	২২১০	৮·২
,,	,,	,,	,,	,,	২৫১০	৮·৩
,,	,,	,,	,,	,,	২৮১১	৮·৫
,,	,,	,,	,,	,,	২৯১১	৮·৬

০৪৫৫১৪ শশ রাশির R. তারা এবং ০৫৪৯০ কালপুরুষ-রাশির U. তারা ৩রা আগষ্ট, ০৭১০৪৪ অর্ণবযান রাশির L² তারা ১৩ আগষ্ট ০৮৭০০৮ ক্ষুদ্রসর্প-রাশির T তারা ২১ আগষ্ট ১১১১৬০ সপ্তর্ষি-রাশির T. তারা ৪ আগষ্ট ১৮০৫৩১ হরকুলেশ রাশির T. তারা ৭ আগষ্ট ২১৫৫০৭ কুম্ভ-রাশির T. তারা ৩১শে আগষ্ট তারিখে তাহাদের উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবে।

সাঙ্কেতিক অঙ্ক গুলির ব্যাখ্যা :—

বহুরূপ তারার অবস্থান, ০৮৪৮০ = তারাটীর বিষুবাংশ ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ও ক্রান্ত্যংশ ৩ ডিগ্রী উত্তর (Right Ascension 8 hours 48 minutes and declination 3 degrees north of the Equator.

বহুরূপ তারার নাম, ক্ষুদ্রসর্পরাশির S. তারা = তারাটী ক্ষুদ্রসর্প রাশির একটী তারা এবং তারাচিত্রে (Map of the sky) ইংরাজী S. অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত, উহার ইংরাজিনাম S. Hydrae, যে তারার অবস্থানের নিম্নে রেখাযুক্ত তাহার ক্রান্ত্যংশ বা Declination দক্ষিণ অর্থাৎ তারাটী বিষুব-রেখার দক্ষিণে অবস্থিত বুঝিতে হইবে। এই সংকেত অবলম্বনে এবং তারা-চিত্রের সাহায্যে আকাশে তারাটিকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়।

পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়, ০৮০৯ = জুনমাসের ৮ই তারিখে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে তারাটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এই সাঙ্কেতিক অঙ্ক যদি ১৬১১ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে জুন মাসের ১৬ই তারিখে রাত্রি ১১ ঘটিকার সময়ে তারাটী পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এইরূপ অঙ্ক যদি ২০১৫ হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ২০ জুন রাত্রি ১৫ ঘটিকার সময়ে অর্থাৎ রাত্রি ৩টার (১৫-১২=৩) সময়ে তারাটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে এক দিনের দিবা মধ্যাহ্ন হইতে পরের দিনের দিবা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত একদিন ধরা হয়, এবং এই সময় ০০ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়। দিবা মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন কোন স্থানের দর্শকের মস্তকোপরি মধ্যরেখায় উপনীত হয়, তখন সেই স্থানের সময়ের ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হয়। ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হইলেই ০০ ঘণ্টা গণনা করা হয়, তৎপরে প্রতি সেকেণ্ড, মিনিট ও ঘণ্টা গণনা করা হয়। কার্য্যের সুবিধার জন্য আমরা পাশ্চাত্যপ্রথায় ২৪ ঘণ্টার হিসাবে সময় নির্দ্দেশ করিতেছি, কিন্তু উহা কলিকাতার সময় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আপেক্ষিক স্ফুলত্ব, ১১'০ অপেক্ষা ছোট = পর্য্যবেক্ষণকালে তারাটী একাদশ-শ্রেণীর তারা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল ছিল। যদি সাঙ্কেতিক অঙ্ক ৮'৯ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তারাটী অষ্টমশ্রেণীর তারা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল এবং নবম-শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা হইতে দশভাগের একভাগ বেশী উজ্জ্বল ছিল অতএব উহার উজ্জ্বলতা ৮'৯।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টরী কৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯শ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।	শ্রাবণ।	১৩২৭ সাল। ১৮৪২ শকাব্দ।

ভিক্ষা।

(১)

রবি শশী তারা সাধি নিজ কাজ তোমারে সতত পূজিছে,
ভীমগরজনে মহাপারাবার তোমার মহিমা ঘুষিছে,
স্বন্ স্বন্ রবে সদা সমীরণ
আনন্দে তোমারে করিছে ব্যজন,
পিক কল-তানে প্রকৃতির সনে তোমারে সতত ডাকিছে,
মেঘ গরজিছে—বারি বরষিছে—তোমারই তরে কাঁদিছে।

(২)

উজলি কানন কুসুমনিকর তব পদে পড়ে ফুটিয়া,
নয়ন ধাঁধিয়া বিজলী চমকি চরণে পড়েগো লুটিয়া,
ফল-ভরে নত পাদপনিচয়
করে আবাহন সতত তোমায়,
কুলকুল স্বরে আকুল তটিনী তব তরে যায় ছুটিয়া;
তব আরাধনে রয়েছে শৈল সদা ঊর্দ্ধ শির তুলিয়া।

(৩)

আমি অচেতন আছি অনুক্ষণ তত দেখিয়াও না দেখিয়া,
তব কাজে মোরে কর নিয়োজিত আঁধারে রেখ'না ফেলিয়া,
মিছে কাজে দিন, রাত্রি যায় ঘুমে,
হে চিরপ্রকাশ! জাগালেনা চুমে—
অনুভূতি দাও প্রাণে, যেন বৃথা জীবন না যায় কাটিয়া,
তব কাজে কর নিয়োজিত, যেন আঁধারে না থাকি পড়িয়া!

শ্রীপশুপতি সরকার।

বামা ক্ষেপা।

ভগবান্ রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "পঞ্জিকাতে অনেক জলের বিবরণ আছে, কিন্তু সমস্ত পঞ্জিকাখানি নিঙড়াইলে এক ফোঁটাও জল পড়ে না।" ভগবানকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ অসংখ্যশাস্ত্রে নানা প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু শাস্ত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। ভক্তির ডোরেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারা যায়—ভক্তিতে ভক্ত ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করে। ভগবান্‌কে যে যে ভাবেই ভাবুক, যে যে নামেই ডাকুক, তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন— ভগবান্ ভক্তাধীন—ভক্তের দাস। কেহ বা তাঁহাকে "পিতা" বলিয়া ডাকে, কেহ বা তাঁহাকে "সখা" বলিয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করে, আবার কেহ বা "মা" "মা" বলিয়া তাঁহাতেই মাতৃত্বের আরোপ করে। সংসারে "মা" নামের মত এমন মনোহারি নাম বোধহয় আর নাই। "মা" বলিয়া ডাকিলে যেন সমগ্র প্রাণ অপূর্ব্ব পুলক-প্রবাহে নাচিয়া উঠে! কে জানে মা নামের কত মহিমা! অস্ফুটবাক্ সুকুমার শিশু মাতৃ-জঠর হইতে বাহির হইয়াই "মা" "মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে—বনের পশু ছাগ পর্য্যন্ত অন্তিমকালে "মা" "মা" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করে। এই জন্যই বোধ হয় সাধকেরা ভগবানের পিতৃরূপ অপেক্ষা মাতৃরূপেই অধিকতর তন্ময়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মাতৃরূপেই তন্ময় হইয়াছিলেন—'তারা তারা তারা' বলিয়া রাম-প্রসাদের দু'নয়নে ধারা বহিয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের নায়ক পাগল বামাচরণও মাতৃনামে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন।

সাধক বামাচরণের নিবাস ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের মল্লারপুর-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী- দ্বারকানদীর তীরে (তারাপুরগ্রামের নিকটবর্ত্তী) আটলানামক গ্রামে। ১২৪১ খ্রীস্টাব্দে সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়-নামক জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঔরসে বামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। বামাচরণেরা দুই ভাই ও দুই ভগ্নী; তন্মধ্যে বামাচরণই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। অতিশৈশবেই বামাচরণ ভগবদ্ভক্তির চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। মাটী ছানিয়া কালীমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া, ধূপ ধূনা নৈবেদ্য দ্বারা মৃণ্ময়ীমায়ের যে পূজার্চ্চনারপ্রবৃত্তি শৈশবে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল—পরিণতবয়সে সেই শৈশবের ক্রীড়াই ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া অকৃত্রিম সাধনায় পরিণত হইয়াছিল। বামাচরণের বাল্যকালে তাঁহার পিতৃদেব ইহলীলা সংবরণ করেন। তখন অশিক্ষিত বর্ণজ্ঞানরহিত বামাচরণ সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন অর্থোপার্জ্জনে বামাচরণের শৈথিল্য দেখিয়া, তাঁহার মাতা বলিলেন—"বাবা, তুমি দু'পয়সা উপার্জ্জন না করিলে, এতগুলি লোকে কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?" মায়ের কথা শুনিয়া বামাচরণ বলিলেন,—"মা, অন্নপূর্ণার রাজত্বে অন্ন বিনা কেহ কি মরিয়া যাইবে? "জীব দেছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি;" তুমি একমনে মা'কে ডাক, তিনি আমাদের অন্নবস্ত্র দেবেন!" এই ভাবে কিছুদিন অতীত হইল, বামাচরণ সংসারের অভাব অভিযোগের তীব্র যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া কেবল মাতৃনাম জপ করিতে লাগিলেন,—দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মা বলিলেন "বাবা, এমনভাবে আর ত সংসার চলে না! না খেয়ে ছেলেমেয়ে গুলি যে কাঠসার হ'লো!" মায়ের কথা শুনিয়া বামাচরণ পৌরোহিত্য করিবার জন্য বিদেশে প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক স্থানে দেবমন্দিরে পূজক ব্রাহ্মণের কার্য্যও করিলেন, কিন্তু বর্ণজ্ঞানরহিত বলিয়া কোনস্থানেই তাঁহার সুবিধা হইল না; অগত্যা বামাচরণ স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া আবার মাতৃনামে আত্মহারা হইলেন। দেখিয়া শুনিয়া পাড়াপ্রতিবেশীগণ বামাচরণকে "ক্ষেপা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল, তদবধি বামাচরণ "বামা-ক্ষেপা" নামেই খ্যাতিলাভ করিলেন।

"তারাপুরশ্মশানের বামাক্ষেপা" বলিলে বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতা বামাচরণকে চিনে। তারাপুর বীরভূমজেলার অন্তঃপাতী। তারাপুর তারামায়েরই নামে প্রসিদ্ধ। এই তারাপুরশ্মশানে তারামায়েরই চরণ-প্রান্তে বসিয়া বামাক্ষেপা তান্ত্রিক-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বলিয়াছি ত, বামাচরণ

বাল্যকাল হইতেই সংসারবিরাগী—সন্ন্যাসী। আটলা হইতে তিনি তারাপুরে আসিয়া প্রায়ই অবস্থান করিতেন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর এইরূপ আগমন তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল। বামাক্ষেপার বয়স যখন সবে আঠার বৎসর, তখন তিনি তারামায়ের "মোহান্ত"-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। ক্ষেপা পূর্ব্বে মাতৃবিয়োগের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। দ্বারকায় অবগাহন-কালে অকস্মাৎ হরিনামধ্বনি শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গে। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহারই মায়ের মৃতদেহ তারাপীঠের অপরপারে দাহ করিবার জন্য আনীত হইয়াছে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একবার গর্ভধারিণী মায়ের অন্তিমদশা দেখিবার জন্য ক্ষেপা সেই উত্তালতরঙ্গময় দ্বারকায় তখনি ডুব দিলেন। নদীতে যেমন স্রোত, যেমনি ঘূর্ণাবর্ত্ত। এপার-ওপারের সকলেই মনে করিল, বামাচরণ বুঝি আর উঠিবে না। কিন্তু বিশ্ব পালয়িত্রী ব্রহ্মময়ী মা যাহার সহায়, তাহার আবার ভয় কিসের? বামাচরণ নির্ব্বিঘ্নে অপরপারে উপস্থিত হইয়া মাতৃ-শব পৃষ্ঠে করিয়া পুনরায় দ্বারকায় ঝম্পপ্রদান করিলেন। এবার সকলেই বামাচরণের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। কেহ বা পাগলের জন্য "হায় হায়" করিতে লাগিল, আবার কেহ বা "বেশ হ'য়েছে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বলিয়া পাগলের পাগলামীর অশেষ নিন্দাবাদ করিয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু একি! বামাচরণ এবারেও নির্ব্বিঘ্নে মায়ের শব বহন করিয়া তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তারাপীঠের মহাশ্মশানে তারাদেবীর সাক্ষাতে বামার জননীর দেহ ভস্মীভূত হইল—বামা বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বামার শৌচাশৌচ নাই। পাগল যে, তা'র আবার শৌচই বা কি অশৌচই বা কি? পাগল পূর্ব্ববৎ তারাদেবীর পূজার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্ব্বে পাগল বাটী যাইয়া কনিষ্ঠ ভাই রামচরণকে বলিলেন, "ভাই, আশেপাশে যত ব্রাহ্মণ আছেন, সকলকেই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ ক'র্ত্তে হ'বে, যেন কেহ বাদ না যান।" পাগলের কথা শুনিয়া রামচরণ ও অন্যান্য সকলে হাসিতে লাগিল। অগত্যা পাগল নিজে যাইয়াই সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। শ্রাদ্ধের দিন ভারে ভারে ভোজ্যদ্রব্য মিষ্টান্ন, ঘৃত, ময়দা আসিয়া বামাচরণের বাটীর প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিল—সকলে দেখিয়া ত অবাক্! ব্রাহ্মণগণ কাতারে কাতারে ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় চতুর্দ্দিক্ মেঘাচ্ছন্ন হইল—বামাচরণ তাহা দেখিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের

পানে চাহিয়া রোরুদ্যমানকণ্ঠে বলিলেন—"মা, এইগুলি ব্রাহ্মণ-সন্তানের আহার কি হইবে না? তুই ত মা—আমার কোন কথাই অগ্রাহ্য করিস্ নাই। সত্যই যেন মা, ভক্তের করুণ-ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন—কোথা হইতে এক বাতাস আসিয়া মেঘরাশি উড়াইয়া লইয়া গেল—নিমেষে নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আকাশের চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইলেন।

সংসারে সাধুসন্ন্যাসী মাত্রকেই অল্পাধিক-পরিমাণে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। যবন হরিদাসের বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা কিছু নূতন নহে। বামাচরণের সাধুতায়—অলৌকিকসাধনায় যখন তাঁহার যশোরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন কতিপয় দুষ্টলোকে বামাচরণকে নির্য্যাতিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। বামাচরণ বাহ্যজ্ঞানরহিত ছিলেন,—সময়ে সময়ে তিনি মায়ের সম্মুখেই যোগাসনে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। এই অজুহাতে মন্দিরের কর্ম্মচারীরা চারিদিন যাবৎ বামাচরণকে বিন্দুমাত্র ভোজ্য বা পানীয় দিল না। এদিকে তারাপীঠের স্বত্বাধিকারিণী নাটোরের মহারাণী স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন মা তারাদেবী তাঁহাকে বলিতেছেন "আমি চারিদিন উপবাসী আছি।" মহারাণী পরদিন প্রত্যুষেই তারাপীঠে একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। উক্ত কর্ম্মচারী তারাপীঠে পৌঁছিয়া যখন শুনিলেন যে বামাচরণ চারিদিন যাবৎ উপবাসী আছেন, তখন তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ ভবিষ্যতে যে কেহ ক্ষেপাকে অশ্রদ্ধা কিংবা নির্য্যাতন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইবে; ক্ষেপা মায়ের মন্দিরে বাহ্যে করুন, প্রস্রাব করুন—কেহ সে জন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্র তিরস্কার করিতে পারিবে না, আর প্রতিদিন মায়ের পূজার পর অগ্রেই মায়ের ভোগ ক্ষেপাকে দিবে,—ক্ষেপা খাইলেই মায়ের খাওয়া হইবে।" বলা বাহুল্য, তদবধি আর কেহ ক্ষেপাকে নির্য্যাতন করিতে সাহসী হইত না।

বনের শৃগাল-কুক্কুর ছিল ক্ষেপার প্রধান সহচর। ক্ষেপা ডাক দিবা মাত্র চারিদিক হইতে শৃগাল-কুকু সকল ক্ষেপার সম্মুখে উপস্থিত হইত। ক্ষেপা তাহাদিগকে যখনই যে কাজ করিতে আদেশ করিতেন, শৃগাল-কুক্কুরেরা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তখনই তাহা পালন করিত। যতদিন ক্ষেপার কনিষ্ঠ সহোদর জীবিত ছিল, ক্ষেপা ততদিন ভক্তদিগের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া অক্ষম ভ্রাতাকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যুর পর কেহই তাঁহাকে

কিছু দিতে আসিলে, ক্ষেপা দূর করিয়া তাহা ফেলিয়া দিতেন। একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া বাবার নিকট বলিলেন যে "দেখুন আজকালকার সাধুসন্ন্যাসী মাত্রেই ভণ্ড,—এই কারণে আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি না।"

ক্ষেপা বলিলেন—"ভণ্ডামী হইতেও অকৃত্রিম সাধুতা আসে।" এই বলিয়া তিনি একটি গল্প বলিলেন। গল্পটী এই—"এক রাজার বাড়ীতে এক মেথর ও মেথরাণী বিষ্ঠাগার পরিষ্কার করিত। মেথরাণী অতি সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা ছিল। সে স্বামীর মুখ একটু মলিন দেখিলে একেবারে কাঁদিয়াই আকুল হইত। একদিন মেথর পায়খানা পরিষ্কার করিতে করিতে রাণীকে দেখিতে পায়। রাণীর সেই অসামান্যরূপ-লাবণ্যরাশি-দর্শনে মেথর এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, বাড়ীতে পৌঁছিয়া সে কেবল বলিতে থাকে—"এমন স্ত্রী যা'র সেই ভাগ্যবান্।" মেথরাণী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া রাণীর কাছে আসিয়া আপনার স্বামীর দুরাকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞাপন করে। রাণী মেথরাণীর কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "এতে আর আপত্তির বিষয় কি আছে? তোমার স্বামী যদি আমার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া সত্যই পাগল হইয়া থাকে, তবে যে ভাবেই হৌক্, তাহার আশা পূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য। দয়াই রাজধর্ম্ম। কিন্তু, তোমার স্বামীকে একটা কাজ করিতে হইবে। ছাইভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া রাজবাটীর নিকটে বসিতে হইবে। সন্ন্যাসী ভিন্ন পরপুরুষের মুখ আমি প্রকাশ্যে দেখিব কেমন করিয়া?"

মেথরাণী রাণীর কথা মেথরের নিকট যাইয়া বলিল। মেথর শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল। এতদিনে তাহার অভীপ্সিতফললাভ হইবে—এই চিন্তায় মেথরের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গে ছাই ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া রাজবাটীর সম্মুখে যাইয়া বসিল। পরদিন এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিবার নিমিত্ত শত শত লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলেই অতি ভক্তিভরে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ রাজার কাণেও এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর কথা প্রবেশ করিল, তিনিও স্বয়ং আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বন্ধ্যা রাণী গম্ভীর রাত্রে একাকিনী এই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার নিকট বরপ্রার্থনার জন্য রাজার নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে রাণীর কথায় সম্মতি দিলে রাণী সর্ব্ববিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সাক্ষাৎ অপ্সরীর ন্যায়

সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রমণীর যে মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া এক-দিন যোগিবর মহাদেবেরও যোগভঙ্গ হইয়াছিল, সেই মোহিনীমূর্ত্তি সম্মুখে পাইয়াও সন্ন্যাসীর চিত্তে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা আসিল না। রাণী বলিলেন, "এই যে আমি তোমার সম্মুখে এসেছি, তোমার যাহা ইচ্ছা আমাকে বল।" এইকথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিল "মা, তোমার জন্য আজ আমার দিব্য জ্ঞান হইয়াছে, আর আমার কোন ভোগ বাসনা নাই। সামান্য মেথর আমি, সারাদিন বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া আমার দিন যাইত। এই ভণ্ডামীতে যখন এত সম্মান, না জানি খাঁটি সন্ন্যাসী হ'লে লোক আমাকে কত সম্মান ক'র্বে"— এই বলিয়া সেই মেথর ভগবচ্চিন্তাতেই জীবন উৎসর্গ করিল, আর সে সংসারে লিপ্ত হইল না।"

উপস্থিত ভদ্রলোকগণ তদবধি আর কোনদিন সাধুদিগকে "ভণ্ড" বলিয়া উপহাস বা বিদ্রূপ করিতেন না।

বামা কালীনাম শুনিতে এত' মাতোয়ারা হইতেন যে বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া তিনি বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেন। একদিন রাত্রিকালে ঘোর দুর্য্যোগে একজন ভক্ত আসিয়া বামার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বামা তাঁহাকে একটি "মায়ের নাম" করিতে আদেশ করিলে তিনি গান ধরিলেন—

"এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে দু'নয়নে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে,—
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, আমি তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা।
দ্বিজ রামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে,
আঁখি অন্ধ দেখ্ না চেয়ে, মা যে তিমিরে তিমিরহরা।

এই গান যতই চলিতে লাগিল, বামাচরণ ততই তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া পাগল নিজেই গান ধরিলেন—

"ঈশানী পাষাণী কি মা হয়েছ অধীনের বেলা।
তারিতে তনয়ে কাতর, পা তোর দিতে হলি পাথর,
পিতার ধর্ম্ম রাখলি মা তোর, তাই আমায় করিলি হেলা।

এইরূপ নৃত্য গীত বামাচরণের নিত্যকর্ম্ম ছিল।

বামাচরণ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েন নাই, অথচ সমগ্র জগতের শাস্ত্র যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান ছিল। লোকের মনের কথা তিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতে পারিতেন। একদা এক জমিদার তারাপীঠে মায়ের চরণ-দর্শনার্থে আগমন করেন। তিনি যখন দ্বারকায় স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, বামাচরণও সেই সময় দ্বারকায় সাঁতার কাটিতে ছিলেন। ক্ষেপা সেই জমিদারের অঙ্গে জল ছিটাইয়া দেওয়ায় জমিদার রাগিয়া বলিলেন "তুমি কেমন লোক হে, দেখ্‌ছ না—আমি আহ্নিক কর্চ্ছি।" বামা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আহ্নিক না তোমার মাথা ক'চ্ছ, তুমি ত ভাব্‌ছ কবে কল্‌কাতা পৌঁছে মুরকোম্পানীর দোকান থেকে জুতা কিন্‌বে।" বলা বাহুল্য, জমিদার তখন সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। জমিদার একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বামার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মন্দিরে আসিয়া বামার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বামা জমিদারের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। তখন তিনি পাণ্ডাদের নিকট বামার প্রণামী টাকা রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

আশ্বিনমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে তারাপুরে মায়ের মন্দিরে মহাধূম হইয়া থাকে। এই দিনে নানা দিগ্দেশ হইতে অসংখ্য ভক্ত, সন্ন্যাসী, সাধু, মোহান্ত এইখানে সমবেত হইয়া গানবাজনা, ক্রয়-বিক্রয়, আলাপ-পরিচয় করেন। বামাচরণ কিন্তু নির্জ্জন-সাধনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া ইঁহাদের আগমনে একটু বিরক্ত হইয়া দূরে যাইয়া বসেন। আবার ভক্তগণ যেই উচ্চৈঃস্বরে গান ধরেন, বামাচরণ অমনি লম্ফ দিয়া তাঁহাদের মধ্যে পতিত হইয়া দু'বাহু তুলিয়া 'তারা তারা' করেন। এমনি ঐক শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে সমাগত সাধু ভক্তগণ গান করিতেছিলেন—

"আদর করে হৃদে রাখি আমার আদরিণী শ্যামা মাকে।
ওমন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে॥
(ওরে) কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি
(কেবল) রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন 'মা' বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুসঙ্গী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তেরই মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে ধন, সে কি অন্যের কাছে রাখে॥"

ক্ষেপা অমনি ছুটিয়া আসিয়া ভক্তবৃন্দের মধ্যে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। "বেঁচে থাক্‌রে শালারা" বলিয়া তিনি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। গায়কগণ একে একে ক্ষেপার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মায়ের ভোগ শেষ হইলে বামার ভোগ আরম্ভ হইল—বামা কুকুর-শৃগালের সহিত একত্র ভোজন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া সকল লোকে অবাক্ হইয়া রহিল।

বামাচরণ সর্ব্বদাই উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। কেহ কাপড় পরিতে বলিলে বলিতেন "আমার মা ন্যাংটা, বাপও ন্যাংটা, আমি কেন তবে ন্যাংটা থাকব না?"

বামাচরণ যোগবলে দূরের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ জানিতে পারিতেন। একবার তাঁহার জনৈক ভক্ত বাড়ীতে কন্যার কঠিন ব্যাধির কথা শুনিয়া শিবিকারোহণে তারাপীঠের মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। মায়ের মন্দিরের নিকট আসিয়া তিনি ভাবিলেন, যখন এত দূরই আসিয়াছি, তখন একবার পাগলের পদধূলি লইয়া যাই। বামাচরণ কোন দিন কোন ভক্তকে বিশেষ কোন আদর অভ্যার্থনা করেন না। কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিল বা না করিল ক্ষেপা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আজ কিন্তু তাহার বিপরীত হইল। মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া এবং তাঁহার ভক্তকে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত দেখিয়া বামাচরণ তাঁহাকে শতশত বার কিছু জলযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভক্তটী কন্যার পীড়ার সংবাদে এতদূর উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি পাগলের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না; পাগল শিবিকার পিছু পিছু আসিয়া তাঁহাকে নামাইয়া জলযোগ করাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ভক্ত তাহাতেও কাণ দিলেন না। পরিশেষে বাড়ী পৌঁছিয়া যখন দেখিলেন যে, তাহার কন্যাটী সংসার আঁধার করিয়া সে দিন দশ ঘটীকার সময় চলিয়া গিয়াছে, তখন পাগলের পাগ্‌লামীর কারণ বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

তারাপীঠের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোন কোন দিন অসুস্থ হইয়া বাড়ী গেলে বামার উপরই পূজার ভার পড়িত। বামা মন্ত্র জানিতেন না। ভাবে বিভোর বামা কখনও নাচিয়া, কখনও কাঁদিয়া, কখনও বা ধূলায় লুটিয়া মায়ের পূজা করিতেন। পুষ্প বিল্বপত্র সমস্ত একত্র করিয়া মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—"এই বেলপাতা লে মা! এই অন্ন লে, এই জল লে, এই বলিদান লে, এই ফুল লে, এই ধূপ লে।" পরিশেষে সর্ব্বভূতে ভগবানের সত্ত্বাদর্শী বামাচরণ মন্দিরের যাবতীয় কর্ম্মচারীর নাম করিয়া বলিতেন,

"এই গোমস্তা বাবা লও, নায়েব বাবা লও, পাণ্ডা বাবারালও, বেণী বাবা লও, রামবাবা লও, অমৃত বাবা লও, কাঁলাচাদ বাবা লও" এই বলিয়া প্রত্যেকের নামে একএকটি পুষ্প অর্পণ করিতেন। পাগলের এইরূপ পাগ্‌লামী দেখিয়া কেহই না হাসিয়া আত্মসংবরণ করিতে পারিত না।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বামাচরণ ভক্তদের সহিত বড় অমায়িক ব্যবহার করিতেন আর কেবল উর্দ্ধনেত্রে গান করিতেন—

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।
সত্যপথে মন, কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, যতনে অতিগোপনে।
সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তাহে করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ সে পান্থনিবাসী জনে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে।"

১৩১৮ সালের ৩রা শ্রাবণ বাঙ্গালীর পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিন। এই দিন মায়ের ছেলে সাধকচূড়ামণি বামাক্ষেপা নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যান। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজননীর অঙ্ক হইতে একজন তান্ত্রিক সাধকের সাধনা-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ক্ষেপা গিয়াছেন, কিন্তু আজও তাঁহার লীলাভূমি তারাপীঠ ভক্তের তীর্থপীঠ-রূপে পরিগণিত হইতেছে। যে মহামায়ার পদ-সিন্ধুতে বামার জীবন-বুদ্বুদ মিশ্রিত হইয়াছে, সেই মহামায়াকে যদি বাঙ্গালীভক্ত বামারই ন্যায় পাগল হইয়া উপাসনা করিতে পারে, তবেইত বামার প্রকৃত স্মৃতি-রক্ষা হয়। আজ এই পর্য্যন্ত ক্ষে'র কাহিনী লিখিয়া সাশ্রুনয়নে ক্ষেপার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম; জগদম্বা করুন, যেন বামার ন্যায় "মা" "মা" বলিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, সমুদয় জগৎকে দুইতত্ত্বে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে, জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্তুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনুসন্ধান বলে ঐ দুয়ের মধ্যেও একত্ব দৃষ্ট হইয়াছে। আকাশ ও প্রাণ একই তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণতত্ত্ব। যাঁহাকে মহৎ নামে অভিহিত করা যায়। দার্শনিক ভাষায় যাহা মন বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ, সেই মহত্তেরই কিয়দংশ। আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর সমগ্র জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর ব্যষ্টিতে যাহা হইতেছে তাহা সমষ্টিতেও ঘটিতেছে। আধুনিক শরীরবিধানশাস্ত্র প্রতিপদে মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইয়াছে দেখিয়া তাহারা ফাঁপরে পড়িয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা আমরা বরাবর জানি। হিন্দুবালককে প্রথমেই এই তত্ত্ব শিখিতে হয় যে, মন জড়পদার্থ, তবে উহা সূক্ষ্মতর জড়। তবে উহা আত্মা নহে; যেহেতু উহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আত্মাই মনকে নিজের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেন। আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সহকারে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কার্য্য করে। বৌদ্ধেরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল মনের জ্ঞানকে অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মার স্থানীয় মনে করেন। এবং জগৎ শূন্য হইতে উদ্ভূত, ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন। এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কি বুঝায়। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপাদান স্বরূপ। উহা মহত্তেরই অংশ স্বরূপ, বিভিন্ন অবস্থা সমূহের নাম মাত্র। যখন উহা শান্ত স্থির হ্রদের ন্যায় থাকে, তখন উহাকে অন্তঃকরণ কহে। আবার যখন উহাই ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় কোন বহির্বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখন একটা কম্পন উপস্থিত হয়, তখন উহার নাম, "মন" সংশয়াত্মক। তাহার পরই একটী প্রতিক্রিয়া হয়, উহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞানও বাহ্যজ্ঞান একত্র উদয় হয়। মনোহ্রদে আঘাত বহির্জ্জগৎ হইতেও আসিতে পারে, আবার অন্তর্জ্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। বাহ্যজগৎ হইতে আমরা আঘাত মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এমন কি, সেই আঘাতটীর অস্তিত্ব জানিতে হইলেও

আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়। যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজ মনের অংশ বিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে প্রেরণ করি। আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, উহা কিছুই নয়। আমাদিগের নিজ মন ঐ আঘাতের দ্বারা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকারপ্রাপ্ত মনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জ্জগতের বাস্তবসত্যতায় বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহাদিগকে এ কথা মানিতেই হইবে। মনে বিষয়ের প্রতিবিম্ব যে ভাবে পড়িবে, আমরা তাহাই দেখিতে পারি, তাহার অতীত যদি বহির্জ্জগৎ কিছু থাকে তাহা অজ্ঞেয়।

আমাদের দেহে ও মনে পরিবর্ত্তন হইতে থাকিলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্ত্তনীয়। আমাদিগের বস্তু বিষয়ক ধারণাসমূহ অপরিবর্ত্তনীয়। মানবের বিভিন্নশারীরযন্ত্র মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু? যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া পূর্ণ অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখনও এই একবস্তু হইতে পারে না; কারণ উহা পরিবর্ত্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখনও পরিণাম হয় না। যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় সংস্কার আসিয়া এক অখণ্ডভাবে পরিণত হয়, ইহাই আমাদিগের প্রকৃত প্রকৃত আত্মা। সমস্ত স্থূলজড় বা বাহ্যজগৎ উহার সহিত তুলনায় পরিবর্ত্তনশীল, তখন এই অপরিবর্ত্তনশীল বস্তুটী কখনই জড় হইতে পারে না। অতএব উহা অজড়, অবিনাশী ও অপরিণামী। আমাদের পদতল বিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম ও উচ্চতম সাধু পর্য্যন্ত সকলের ভিতর অনন্তশক্তি অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয়গুণই অনন্তপরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্য। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—ততঃ "ক্ষেত্রিকবৎ" কৃষক যেমন তাহার নিজ ক্ষেত্রে জল সেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন জলাশয় হইতে একটী প্রণালী কাটে, ঐ প্রণালীর মুখে একটী দরজা আছে, পাছে সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্র প্লাবিত করে, এই জন্য ঐ দরজা বন্দ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ দরজাটী খুলিয়া দিলেই জল নিজ শক্তিবলে উহার ভিতর প্রবেশ করে, জল প্রবেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের জলে পূর্ব্ব হইতেই ঐ শক্তি বিদ্যমান আছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনন্তশক্তি, অনন্ত-পবিত্রতা, অনন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার বিদ্যমান আছে, কেবল এই দ্বার, দেহরূপ

এই দ্বার—যাহা আমাদের স্বরূপের বিকাশ হইতে দিতেছে না, আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে, রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হইতে থাকে, ততই শক্তির বিকাশ হইতে থাকে, এই কারণেই আমরা পানাহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। হইতে পারে আমরা মূলতত্ত্ব বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি, যেমন আমাদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যদিও এ বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক তথাপি উহা আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, বাল্যবিবাহ যে সকল মূলভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে। যদি প্রত্যেক নর-নারীকেই অপর যে কোন নরনারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে সঞ্চরণ করিতে পায় তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে, আসুর স্বভাব, দুষ্ট প্রকৃতি সন্তান সমূহের উৎপত্তি হইবে।

একদিকে, প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশু প্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপরদিকে উহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এইরূপে সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারের বিশেষ ফল নাই। বরং কিরূপে সমাজ হইতে এই সকল দোষ নিবারিত হইতে পারে তাহাই চিন্তার বিষয়। আর যতদিন সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল, আমাকে-ও আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং বিবাহ বিষয় পাত্রী নির্ব্বাচনে সমাজের অধিকার আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহের পশ্চাতে এই সব ভাব ও তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে, আমি ইহাও বলিতে চাই, যে, মনু-মহারাজ কামোদ্ভব পুত্রকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই, যাহার জন্মমৃত্যু বেদের বিধান অনুযায়ী সেই সন্তানই আর্য্যপদবাচ্য। আজকাল দেশে এরূপ সন্তান অল্পই জন্মাইতেছে, এবং কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। সৎ আদর্শের বিস্মরণ বশতঃ এইরূপ অনেক বিষয়ই দোষে পরিণত হইতেছে। সুতরাং যাঁহারা ঋষি নির্দ্দিষ্ট পন্থা ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য-ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য সমাজকে পাশ্চাত্যভাবে গঠন করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা সমাজ ধ্বংস করিতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য সন্তান, ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই সমূলে বিনষ্ট হইবে। শাস্ত্রকারগণ অর্থ ও কামকেও ধর্ম্মেই পরিণত করিতে বলিয়াছেন। সুখ, শান্তি, উন্নতি, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব সমস্তই ধর্ম্মে। ধর্ম্ম হীন জীবন পশু জীবন

অপেক্ষা ন্যূন নহে, যাহা প্রাণে চায়, তাহার উত্তর ধর্ম্মে। আমি কে, মরিলে জীবের কি অবস্থা হয়, এই জগৎ সৃষ্ট কি অসৃষ্ট এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই ধর্ম্মের নিকট পাওয়া যায়। উহা নিত্যসাক্ষী সনাতন। ধর্ম্মের মূল, বেদ। ঈশ্বর বাক্য, অপৌরুষেয়। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বেদ বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে এমত নহে, উহা ভিতর হইতে বাহির আসিতেছে। উহা প্রত্যেক আত্মায় অবস্থিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে কেবল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে। তখনই তাহার ভিতর সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। এই মহানতত্বটী বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতর পূর্ব্ব হইতেই শক্তি অবস্থিত। হয় বল যে, উহা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বল যে, উহা মায়ার আবরণে আবৃত হইতেছে, ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে উহা পূর্ব্ব হইতেই ভিতরে অবস্থিত। হয় বল যে, সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বল যে, উহা মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে। প্রত্যেকের ভিতরে অনন্তশক্তি আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে শক্তি আছে, অতি ক্ষুদ্রতম মানবেও তাহা রহিয়াছে। এস্থলে বৌদ্ধদের সহিত মহাবিরোধ আরম্ভ। তাঁহারা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলে, দেহ একটী জড়স্রোত মাত্র। এইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এতদ্রূপ জড়প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, উহার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। উহার "অস্তি" অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটী দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্যে সংলগ্ন গুণরাশি কল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা শুদ্ধ গুণ স্বীকার করিয়া থাকি। যেখানে একটী কারণ স্বীকার করিলেই সমুদায়ের ব্যাখ্যা হয় সেখানে দুইটী কারণ স্বীকার করা ন্যায়বিরুদ্ধ। আর যে সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সে সকল মতই খণ্ডন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে, তোমার একটী আত্মা, আমার একটী আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্ একটী আত্মা আছে, তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। অবশ্য এ পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদের মত ঠিক, ইহা দেখা গিয়াছে। "এই শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছে, আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছে।

এখানে মুস্কিল এইটুকু যে, এই আত্মাও পরমাত্মা উভয়কেই বস্তু বলিয়া আর উহাদের উপর দেহ, মন প্রভৃতি গুণ স্বরূপে লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে।

এখন কথা এই কেহই কখনও বস্তু দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব যাঁহারা বলেন, এই বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি? ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী হইয়া বলনা কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। উহারা কেহই পরস্পরের সংলগ্ন নহে, উহারা মিলিয়া একটা বস্তু হয় নাই। সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায়, একটা আর একটার পশ্চাতে চলিয়াছে, উহা কখনও সম্পূর্ণ নহে। কখনই উহারা একটা অখণ্ড একত্ব গঠন করেনা। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গ পরম্পরা মাত্র। এই তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্ব্বাণ কহে। দ্বৈতবাদ, ইহার নিকট নীরব, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপী অথচ ব্যক্তি-বিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন। বৌদ্ধ বলেন জগৎ দুঃখপূর্ণ, যদি ইহা ঈশ্বরের কার্য্য হয়, তবে তাদৃশ ঈশ্বর আমরা চাহি না। দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন এইটির উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি। উহারা বিভিন্ন নহে। দ্রব্যগুণের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন প্রাকৃত ব্যক্তি হও, তবে তুমি শুধু গুণরাশিই দেখিবে। আর যদি তুমি মহাযোগী হও তবে কেবল দ্রব্যই দেখিবে। কিন্তু এক সময়ে উভয়কে দেখিতে পাইবে না। অতএব দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দ্রব্য যদি গুণ রহিত হয়, তবে একটা দ্রব্য মাত্রেরই অস্তিত্ব-সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পার, তাহাহইলে দেখিতে পাইবে যে, উহা মনে, আত্মায় আরোপিত মাত্র। অতএব অনন্তসত্তা একমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন আর সবই তাঁহার প্রকাশ। বৌদ্ধগণ ক্ষনিক বিজ্ঞান-গুণরাশি সম্পন্ন মনকে আত্মাস্থানীয় স্বীকার করে, তদতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেনা। বৌদ্ধেরা গুণ দেখিয়া মনকেই আত্মাস্থানীয় গণ্য করিয়াছিল। বস্তুতঃ দ্রব্য ও গুণে বিভিন্নতা নাই। ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সত্যতা বা অখণ্ডত্ব স্বীকার করা যায়না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সমুদায়বস্তুগতশক্তি একই শক্তির বিকাশমাত্র। সুতরাং এক অখণ্ড

অনন্তসত্তাই সমুদায়ের মূল কারণ ইহা নিশ্চিত। এই জগৎ যদি অবিরাম গতিপ্রবাহ মাত্রই হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। কারণ ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব হইতে পারে না, এই বাক্যটী স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্রজগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই নাই। চিন্তা, ভাব, মন, শরীর, জীব জন্তু সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহাহউক এখন সমগ্র জগৎকে একটী সমষ্টিরূপেধর। সমষ্টিস্বরূপে কি এই জগতের পরিণাম হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীনবস্তুর তুলনায়ই গতির ধারণাসম্ভব। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন পরিণামহীন। সুতরাং তখনই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নরূপে জানিতে পার। নামরূপ ভেদই মায়ার কার্য্য, মায়া দূরীভূত হইলে, নামরূপ তিরোহিত হইলে যে সত্যবস্তু থাকে তাহাই ব্রহ্ম। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

ত্বংস্ত্রীত্বংপুমানসি
ত্বং কুমারউতবাকুমারী,
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন-বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

তুমিই স্ত্রী তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমি সমগ্র জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে আর যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবে কেন?

(ক্রমশঃ)
শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ

লোকমান্য তিলকের জীবন ও কর্ম্ম।

গুণই সম্মানের নিদান। ভারতের কাব্যকুঞ্জের অমর কবি কোকিল বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একদিন জাতীয় বসন্তের এক মঙ্গলময় প্রভাতের শুভ মুহূর্ত্তে অমৃতময় ঝঙ্কারে কাননকন্দর নগর প্রান্তর বায়ু ব্যোম পূর্ণ করিয়া যে গান গাইয়াছিল—যে এক মহনীয় তথ্য ঘোষণা করিয়াছিল, সুপ্তিমুক্ত ভারতের

কোটি কোটি নরনারী উৎকর্ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূতপ্রাণে যে মহাবাণীর সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল—সে বাণীতে সভ্যই বিশ্বের একগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল—কবির সেই গান—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।" গুণই পূজার কারণ, বেশে বা বয়সে, জন্মে বা চর্ম্মে কিছু আসে যায় না। যেখানে সদ্‌গুণের পরিচয় পান, গুণপক্ষপাতী মানবমন সেইখানেই আকৃষ্ট হয়,—গুণীর সম্মুখে উদ্ধতগর্ব্বিতলোকের উন্নতমস্তক অজ্ঞাতসারে অবনত হইয়া পড়ে। মানুষ এই সত্যের অমর্য্যাদা করিতে পারে না।

আজ আমরা শোকসন্তাপদেশে যে পরলোকপথের পথিকের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিতে আসিয়াছি, তিনি নানাগুণের আগার ছিলেন, যে সকল মহান্‌গুণের সমাবেশে মানুষে দেবত্বের আরোপ হয়, সেই সকল গুণই তাঁহার পূজায় এ দেশবাসীকে আগ্রহান্বিত করিয়াছে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুলাই বম্বাইয়ের রত্নগিরিতে লোকমান্য মহাত্মা বালগঙ্গাধরতিলকের আবির্ভাব হয়। সেদিন তিলকের সংস্পর্শে রত্নগিরি উজ্জ্বল হইয়াছিল, আর তিলকের তিরোধানের পূর্ব্বে সূক্ষ্মদর্শিরা দেখিয়াছিলেন সমগ্র ভারতের ললাটদেশ তিলকে অলঙ্কৃত হইয়া সমুজ্জ্বল ও সুপবিত্র হইয়াছে।

মহাত্মা বালগঙ্গাধরতিলকের পিতা মনস্বী গঙ্গাধররামচন্দ্রতিলক সুশিক্ষিত, সদাশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও জনমান্য ছিলেন। মনস্বী গঙ্গাধররামচন্দ্রতিলক অঙ্কবিদ্যায় সুপণ্ডিত ও প্রাচ্যভাষার আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন। মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলকের বয়স যখন ষোড়শবর্ষ, তখন তাঁহার পিতা অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। পিতৃহীন বালগঙ্গাধর তিলক অবিচলিতচিত্তে বিদ্যার্জ্জনে কর্ত্তব্যসাধনে অটল রহিলেন। শত বজ্রপাত বক্ষপাতিয়া লইতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেননা—দুঃখে শোকে কাতর হওয়া, কর্ত্তব্যে আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করা, তাঁহার প্রকৃতিতে ছিলনা—সারাজীবন তিনি সেই অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

ষোড়শবর্ষ বয়সে বালগঙ্গাধরতিলক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষালাভার্থ ডেকান্‌ কলেজে প্রবেশ করেন। ইহার ৪ বৎসর পরে তিনি অনারের সহিত বি, এ, পাশ করেন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানশাস্ত্রের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া L. L. B. উপাধিলাভ করেন। কৃতকার্য্যতা সতীর ন্যায় তাঁহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া তাঁহাকে

...মন্দিরের গৌরবমঞ্চে স্থাপন করিয়াছিল। মহাত্মা তিলক অল্প বয়সেই ...র পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি পিতার ধনসম্পৎ ...নসম্পৎ প্রভৃতির সহিত গণিতনৈপুণ্য প্রাচ্যভাষানুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা সদা-...তা প্রভৃতি গহনা সম্পত্তি ও অধিকার করিয়াছিলেন। তিলক গণিত ...ল জানিতেন, পুরাতত্ব ভাল বাসিতেন, সংস্কৃতভাষাও বেদাদিশাস্ত্র ভাল ...সিতেন, মহারাষ্ট্রীয়ভাষা ও রাজভাষার চর্চ্চা ভাল বাসিতেন, কিন্তু তিনি ...সাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন জন্মভূমি ভারতজননীকে।

পাশ্চত্য প্রণালীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তিলক গড্ডালিকা প্রবাহের অনুসরণ করিলেন না। কিসে নিজের পারিবারিকস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইবে, কিসে নিজের অর্থাগম হইবে—এ সকল চিন্তা তাঁহার চিত্তে অধিকার বিস্তার করিতে পারিত না। তিনি নিজের ভাবনা তত ভাবিতেন না—ভাবিতেন দেশের ভাবনা। তিনি দেখিলেন দেশবাসীর মনের উপর দিয়া ক্ষুদ্রস্বার্থের ...কা বহিয়া যাইতেছে। উচ্চচিন্তা উচ্চভাব ত্যাগের আদর্শ ক্রমে বিলীন ...তেছে। মনুষ্যত্বের সঙ্কোচ ঘটিতেছে। তিনি স্থির করিলেন দেশের ...ণার্থে জ্ঞানের পথ ত্যাগের পথ মনুষ্যত্বের পথ দেখাইবেন। তিলক ...র বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া শিক্ষিত যুবকগণের জন্য মহৎ কার্য্য ...ত্র অধিকার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন শিক্ষার অভাবেই দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং জ্ঞান বিস্তারই শিক্ষিত যুবকগণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ কলেজ স্থাপন পূর্ব্বক শিক্ষা বিস্তারে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমতঃ এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করায় অনেকের নিকট উপহাস ও তিরস্কার উপহার পাইলেন, কিন্তু তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া উহাই পরমপুরস্কার জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সফলতার স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হইল। Poona New English School স্থাপিত হইল। ক্রমে সেস্থানে পুণ্যনগরীর পঞ্চ "পাণ্ডব" সম্মিলিত হইলেন। মহাত্মা বিষ্ণুকৃষ্ণ বিপলঙ্কর, এম্ বি নাম জোষী, ভি, এস্ আপ্তে, আগরকর্ এবং তিলক—কেবল বিদ্যালয় পরিচালনেই তৃপ্ত হইলেন না। দেশের "জন সাধারণ যাহাতে দেশের দশা জানিতেও বুঝিতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "কেশরী" ও ইংরেজী ভাষায় "Mahratta" সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বিষ্ণুকৃষ্ণ বিপলঙ্কর একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। মহাত্মা তিলকের

ওজস্বিনী লেখনীর সহিত বিপলঙ্কেরের লেখনীর সংযোগ মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। দেশের অভাব অভিযোগের কাহিনী কেশরী ও Mahratta ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণা 'কেশরী' ও Mahrattaর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। Poona New English School এর খ্যাতিপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহাত্মা তিলক বিদ্যালয় সংবাদপত্রের সাহায্যে ভারতের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিনে বিপলঙ্করের কর্ম্মজীবনের শেষ হইল। তিনি পরলোকে যাত্রা করিলে মহাত্মা তিলকের উপর অধিকতর কর্ম্মভার ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইল। অকুণ্ঠিতচিত্তে সে গুরুভার বহন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নূতন আসিয়া তাঁহাদের দলে যোগদান করিতে লাগিল। মনস্বী কেলকার, গোলে, গোখেল প্রভৃতি রত্নমালার পূর্ব্বোক্ত সদনুষ্ঠানে সম্মিলিত হই "দক্ষিণাপথে শিক্ষাসমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে poona English School কলেজে পরিণত হইল। কলেজের নাম হইল ফার্গু কলেজ। মহাত্মা তিলক ঐ কলেজে গণিতবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন, সংস্কৃত ও ভূতবিজ্ঞান শাস্ত্রও পড়াইতেন। অধ্যাপকতায় তিলকের কৃতিত্বপ্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষঅধ্যাপক তৎকালে বলিলেও চলে।

রাজনীতি ক্ষেত্রের অগ্নিপাত্রে যাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষিত হইবে, শিক্ষাক্ষেত্রের শান্তশীতলতাপসকুঞ্জে ঋষিজনের মত অনাবিল জীবন করিতে পারিবেন কেন? বিধাতার সে ইচ্ছা নয়, তাই তাহা হইল

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিলেন। সমিতির ত্যাগ করিলেন। 'কেশরী' ও Mahrattaর স্বত্বাধিকার পূর্ব্বেই তাঁহার হইয়াছিল। অধ্যাপকতা পরিত্যাগ ও সমিতিসংস্রব ত্যাগের মধ্যে তিলকের চরিত্রের ও মতের মূলমন্ত্র ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, তাই কথার আলোচনা করিব। সমাজসংস্কারবিষয়ক মতভেদই মহাত্মা এই সমিতি ও কলেজ সংস্রব ত্যাগের কারণ। মহাত্মা তিলক নিজের বিশ্বাসেরবিরুদ্ধকার্য্য করিতে জানিতেন না। যাহা সত্য বুঝিতেন তিনি কোটিকণ্ঠে প্রচার করিতেন, যাহা ন্যায্য ভাবিতেন তাহা লক্ষ্য করিতেন, যাহা কর্ত্তব্য বুঝিতেন তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন। অবস্থা তিনি জানিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বে এতই দৃঢ়তা ছিল, যে

কোনও পার্থিব শক্তির নিকট অবনত হইত না। নিজের প্রতি অবিশ্বাস তাঁহার ছিল না। মানবদেহভাণ্ডে যে ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার অসীমশক্তির লীলাতরঙ্গ চলিতেছে, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন, তাই তিনি নিজেকে ক্ষুদ্রহীন দুর্ব্বল মনে করিতেন না,—"নাত্মানমবমন্যেত" "নাত্মানমবসাদয়েৎ", এই আর্ষবাণী সর্ব্বদা তাঁহার কর্ণপথে ধ্বনিত হইত, তাই তিনি লক্ষলোকের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইতেন—সহস্র বিপৎপাতের অন্ধকারের মধ্যে নিজের প্রভায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত নিজের পথ দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহার এই আত্মপ্রত্যয় জীবনে কখনও শিথিল হয় নাই—তিনি এই স্বর্গীয়সম্পৎ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিরোভাবের মুহূর্ত্তেও তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই।

মহাত্মা তিলকের সমাজসংস্কারসম্বন্ধীয় মত বিশেষ মূল্যবান। তিনি বিবেচনা করিতেন যে সমাজসংস্কার সমাজশক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কশূন্য বৈদেশিকভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজশক্তিদ্বারা বাধ্যতামূলক বিধানের সাহায্যে সমাজের সংস্কার হইতে পারে না। ভারতীয় সমাজ অতি প্রাচীন, নানা সময়ের নানা বিপ্লবের নিদর্শন এই সমাজের গাত্রে বিদ্যমান। বহু সমাজের উত্থান পতনের সাক্ষী এই সমাজ। ইহাতে দোষ প্রবেশ করিতে পারে, তাহার সংস্কারের প্রয়োজনও থাকিতে পারে, কিন্তু যে চিকিৎসক তাহার শরীর সংস্থানের তত্ত্ব জানেন না, তাহার মর্ম্ম, গ্রন্থি, সন্ধি, প্রাণসঞ্চার পথ--সকলের যথাযথ সন্ধান রাখেন না, তাঁহাকে উহার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে আহ্বান করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তাহার স্বভাবের অনুকূল ভাবে তাহার ক্ষয়ের পূরণ ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধির অপনোদন দ্বারা সামঞ্জস্যস্থাপন করা যথার্থ সংস্কার। অন্তঃশক্তির জাগরণ বা স্বাস্থ্যলাভ না ঘটিলে কেবল বহিঃপ্রকৃতির সাহায্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা সংস্কার নহে, সংহার। সমাজ সংস্কার করিবে সামাজিকেরা, যে রাজা সে সমাজের সামজিক নহেন, তিনি তাহার সংস্কারের ন্যায্য অধিকারী নহেন। আমরা প্রয়োজন হইলে আমাদের সংস্কার প্রণালী রাজানুমোদিত করিয়া লইব, কিন্তু বাধ্যতামূলক রাজবিধিদ্বারা সমাজসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইব না—ইহাই তাঁহার মতের মূলকথা। এই মতের জন্যই Consuil Bill বা সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

শিক্ষক বা অধ্যাপকদিগের জীবনযাপন সম্বন্ধেও মহাত্মা তিলকের মত তাঁহার সহযোগিগণের সহিত এক ছিল না। তিলক মনে করিতেন, যাহারা শিক্ষাদানে ব্রতী হইবে, তাহাদের পক্ষে কঠোর ও পবিত্র জীবনযাপনই কর্ত্তব্য। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত সমধিক ফলপ্রসূ—ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার এ মতও সকলে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বিধাতার বিধানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের গুরুতরদায়িত্ব মস্তকে লইয়াই তিলক সমিতি ও শিক্ষাগার ত্যাগ করিলেন।

এই সময় হইতে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য তিনি বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত হইলেন, সংবাদপত্র পরিচালন, রাজনৈতিক আন্দোলন তাহার প্রধান কার্য্য হইল। তিনি আইনের ক্লাস্ খুলিয়া ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন, দক্ষিণাপথে তিনিই এই নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি দেশের ব্যবহারাজীবগণের গুরুস্থানীয় ছিলেন. তিনি অবসরে নানা বিষয়ের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে International Congress of Crvuliabcish এর অধিবেশন হইল, তখন মহাত্মা তিলক উক্ত সমিতিতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ঐ প্রবন্ধই তাঁহার অমূল্যগ্রন্থ Orion, ঐ গ্রন্থে তিনি বৈদিকসভ্যতা সৃষ্টির আবির্ভাবের ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত করেন। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইউরোপীয়প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বিমুগ্ধ হন। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাকে আধুনিকতার অপবাদ দিয়া যাঁহারা পদ-দলিত প্রদান করিত আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের সেই দুষ্কার্য্যের ভ্রমপ্রদর্শনের জন্যই বোধ হয় ভগবান্ মহাত্মা তিলককে গণিত বিশারদ করিয়াও বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী করিয়া গড়িয়াছিলেন। একভাবে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে বিশেষত্ব এই যে যাঁহারা এই প্রতিক্রিয়াযজ্ঞে পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছিলেন মহাত্মা তিলক তাঁহাদের মধ্যে একজন অত্যধিক শক্তিশালী।

মহাত্মা তিলকের রাজনৈতিক জীবন ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি Bombay Proviniuiel Confernceএর কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন।

অতঃপর মহাত্মা তিলক, জাতীয়শক্তির উদ্‌বোধনের প্রধান সহায় বীর-পূজার প্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত নিপুণভাবে

আলোচনা করিলেন, তাঁহার ধারণা হইল—পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের জীবন ও কীর্ত্তিকথার আলোচনায় জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি পায়। মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর জীবন ও কর্ম্ম তাহাদিগকে অবসাদ ও অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়া আত্মনিষ্ঠ করিতে পারে। তিনি ভাবিলেন মানুষের স্বভাবিক অধিকার সম্বন্ধে যখন স্পষ্ট জ্ঞান বা দৃষ্টি ধারণার স্ফূরণ হয় না, তখন তাহাকে যদি বলা যায়, "তোমার অতীত অন্ধকার, বর্ত্তমানেত কিছু দেখিতেছি না, বল দেখি, তোমার ভবিষ্যৎ কেমন? সে ভীত হইয়া পড়ে—তাহার ভাবিতে সাহস হয় না যে ভবিষ্যতে তাহার কিছু মঙ্গল থাকিতে পারে। কিন্তু যদি অবসন্নমানুষকে বুঝান যায় যে "তোমার অতীত বড় উজ্জ্বল বড় গৌরবময় ছিল—কিন্তু বর্ত্তমানে তুমি অধঃপতিত, তোমার ভবিষ্যৎ কেমন হইবে জান কি?" সে আশায় বুক বাঁধিয়া বলে "অতীত যখন ভাল ছিল, তখন যে দোষে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, তাহার পরিহার করিতে পারিলেই ত আবার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারিবে। ভবিষ্যতের মঙ্গল সে অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। সেভাবে, যাহা ছিল তাহা আবার আসিতে পারে।

যাহা একদিন হইয়াছে, তাহা আবার হইতে পারে। ইতিহাসে ত একই ঘটনার পুনরাবৃত্ত দেখিতে পাই। তবে আমি নিরাশ হইব কেন? এই ভাব মনে রাখিয়া জাতীয়গৌরববোধ জাগাইবার জন্যও মানুষের অধিকার বুঝাইবার জন্য মহাত্মা তিলক শিবাজী উৎসবের উদ্‌যোগ করেন। 'কেশরী'তে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে অত্যল্পকালমধ্যে ২০০০৲ মুদ্রা সংগৃহীত হইল। রায়গড় দুর্গে শিবাজীর সিংহাসনারোহণের দিনে মহাসমারোহে উৎসব হইল, মহারাষ্ট্রীয়নরনারীর প্রাণে নবীনপ্রাণোদনজাগিয়া উঠিল,—আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের স্ফূরণ আরম্ভ হইল।

কিয়ৎদিন পরে দেশে দুর্ভিক্ষরাক্ষসের ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইল। দুর্দ্দিন একাকী আসে না, প্লেগও দেখা দিল। অগণ্যনরনারী প্লেগের বিকট কবলে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইতে লাগিল। এই সঙ্কট সময়ে তিলক প্রাণপণে গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া দেশবাসীর জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। তিনি অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয়ের জন্য বহু দোকান স্থাপন করিলেন, যেখানে অনাহার আর্ত্তনাদ সেইখানেই তিলকের অনুচরগণ দেবদূতের মত লোকের দুঃখদূর করিতে অগ্রসর হইল। মহাত্মা তিলক, হিন্দুপ্লেগ

হাঁসপাতাল খুলিয়া বহুসংখ্যক দুঃস্থ প্লেগরোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে তাঁহার কার্য্য বেশ সাফল্যলাভ করিল, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিলেন।

মহাত্মা তিলক কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত বিশেষভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত অধিবেশনেই যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য নেতার ন্যায় কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থনাদি করিতেন, কিন্তু আবেদন নিবেদনেই রাজনৈতিক-সাধনার শেষ হয়, জন্মভূমির ঋণ পরিশোধিত হয়, মনুষ্যের স্বাভাবিক অধিকার সম্মানিত হয়—ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। মহাত্মা তিলক যত কথা বলিতেন তাহা অপেক্ষা কার্য্যে করিতেন অধিক। তিনি বক্তৃতার চাকচিক্যে ভাষার আড়ম্বড়ে লোকমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন না। তিনি যাহা বলিতেন সেগুলি তাঁহার প্রাণের কথা, আর এমনই দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সহিত সেগুলি তিনি বলিতেন, যে তাহা শ্রোতার হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে ভাবে মত্ত করিয়া তুলিত, কিন্তু চপল করিত না। তিলক পরপদাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া চলিতে জানিতেন না। অভ্যন্তর হইতে তাঁহাকে অলক্ষ্যে এক মহতীশক্তি চালাইত, তিনি তাহারই ইঙ্গিতে চলিতেন। তিলক দশম-কংগ্রেসের অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকপদ স্বীকার করিয়া সমস্ত কার্য্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজ-সংস্কার সমিতির অধিবেশনের সহিত কংগ্রেস মণ্ডপের সম্বন্ধস্থাপন প্রীতিকর বিবেচিত না হওয়ায় তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ দেখা যায়। যশোলিপ্সা প্রতিপত্তিপ্রত্যাশা থাকিলে কখনই ঐ সম্মান ত্যাগ করিতে পারিতেন না। আলোচনা করিলে মনে হয় তিনি যেমন কর্ম্মী ছিলেন তেমনই ত্যাগী ছিলেন। তাঁহার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। তাঁহার জীবনে প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু গ্রহণ ছিলনা, তিনি কর্ম্মে ধর্ম্মে লোকসেবায় দেশসেবায় আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, যশ, মান, ধন কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। যাহা অযাচিত লাভ আসিয়াছে তাহা দিয়াছেন দেশের সমাজের সেবায়।

মহাত্মা তিলক ধূপশলাকার মত বিপদের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া ত্যাগের সুগন্ধ সম্ভারে আকাশ বাতাস মধুময় করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিগ্রহ দেখিতে পাই, কিন্তু তিনি বোধ হয় দেখিতেন উহা অনুগ্রহ, চন্দন যদি

ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্ষীণ হইয়া না যায়, ধূপশলাকা যদি পুড়িয়া পুড়িয়া আপনা বিলাইয়া না দেয়, তাহাহইলে কি অপরের সুগন্ধ সম্ভোগ ঘটে, আত্মত্যাগ ভিন্ন কে কবে পথপ্রদর্শক হইতে পারে, কে কবে দশের কার্য্য করিতে পারে? তিলকের জীবনে কারাদণ্ড ও ঐ জাতীয় নিগ্রহ অনেকবার হইয়াছিল। প্রথমে যখন কোলহপুরের মহারাজার ষ্টেটের কারবারীর অসদ্ ব্যবহারের কথা তীব্রভাবে তিলকের পত্রে সমালোচিত হয়। তখন মানহানির অভিযোগে তিলক কারাদণ্ড লাভ করেন, ঐ কারাদণ্ডের ফলে তাঁহার প্রভাব প্রতি-পত্তি বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার দেশবাসী বুঝিয়াছিলেন তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে সাহসী। তাই রাজদণ্ডের সঙ্গে ২ তিনি দেশের আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। পরে শিবাজী উৎসবের সময় 'কেশরী'তে যে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত মিঃ র‍্যাণ্ড ও কাপ্তেন আয়ৰ্ষ্ট সাহেবের হত্যার সম্বন্ধ করিয়া রাজপুরুষগণ রাজদ্রোহ অপরাধে তিলককে কারাদণ্ড প্রদান করিলেন, পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর ও উইলিয়ম্ হাণ্টার তিলকের 'ওরায়ন্' পাঠ করিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ তিলকের কারাদণ্ডে ব্যথিত হইল। তাঁহারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তিলকের জন্য দয়া ভিক্ষা করিলেন, তিলকের পাণ্ডি-ত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির আগ্রহ অবগত হইয়া মহারাণী তিলকের মুক্তি প্রদানের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিলককে স্বীকার করিতে হইল—তিনি কার্য্যে, কথায় ও লেখায় এমন কিছুই করিবেন না, যাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের বিরক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। এই কারানিবাসের অবসর সময়ে মহাত্মা তিলক এক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থের নাম The arctil Home in the Vidas অর্থাৎ বেদে আর্য্য-গণের উত্তর মেরু সন্নিহিত স্থানে বাসের বিবরণ। মহাত্মা তিলক প্রাকৃ-তিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্বে মেরু সন্নিহিত স্থান মানবের বাসযোগ্য ছিল। আর বেদ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে বেদে উত্তর মেরুর প্রদেশের এমন অনেক বর্ণণা আছে, যাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। ইহা হইতে তিনি স্থির করিতে চাহেন যে বেদের বহুমন্ত্র ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। তাৎকালিক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাই উহাতে আছে। বেদের বর্ণনায় বুঝাযায় উহা অতীতের বর্ণনা নহে, তাঁহারা তাঁহাদের সেই বর্ত্তমানেই ঐ সকল

দেখিতেছিলেন" লিখিয়াছেন। তিলকের এই গ্রন্থ ভারতের গৌরবস্তম্ভ-রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। সুতরাং ঐ গ্রন্থের জন্য তিনি যে সময়ের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিগ্রহের দিন, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে উহা ভগবদনুগ্রহের সময়, সন্দেহ নাই। দক্ষিণাপথের ভূম্যধিকারী বাবা-শ্রীমহারাজ মৃত্যুকালে স্বীয় সম্পত্তির পরিচালনভার তিলক ও অপর কতিপয় ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া যান। তৎপরে তাঁহার পত্নী মহাত্মা তিলকের উপর প্রতারণা, অন্যায়রূপে ধনাপহরণ প্রভৃতি অভিযোগ আরোপ করিয়া আদালতে বিচার প্রার্থনা করেন। এই মোকর্দ্দমার সংস্রবে তিলক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; কিন্তু উচ্চতর-ধর্ম্মাধিকরণের সুক্ষবিচারে তিনি মুক্তিলাভ করেন। আর একবার দেশে যখন "স্বদেশী-আন্দোলনের" প্রবল প্লাবন উপস্থিত, সে সময় পথভ্রষ্ট কতিপয় যুবক "বোমা"-রচনা ও তাহার অপব্যবহার করিয়াছিল। সেই সময় 'কেশরী'তে 'বোমা'ব্যবহার বিষয়ে এক আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিলক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ব্যাপার অবগত ছিলেন না, প্রবন্ধটী তাঁহার লেখনীপ্রসূতও নহে, তথাপি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে তিনি ঐ প্রবন্ধের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। বিচারে তিলক স্বয়ংই স্বপক্ষ সমর্থন করেন। বিচারফলে তাঁহার উপর ৬ বৎসর দ্বীপান্তরবাস ও সহস্রমুদ্রা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। তিলক স্মিতমুখে 'বিধাতার দান' জ্ঞান করিয়া সে আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন। শেষে দ্বীপান্তরবাস রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্মদেশের মান্দালয়-কারাবাসে পরিণত হয়। এই সুদীর্ঘ কারাবাসের অবসরে তিলক 'গীতারহস্য' প্রণয়ন করেন। গীতারহস্যে তাঁহার স্বাধীনচিন্তার পরিচয় প্রচুর। ঐগ্রন্থে মানবতত্ত্বের বিশ্লেষণ, জীবন-মরণের যথার্থ ধারণা, মানবাত্মার স্বাধীনতার বিবৃতি—এক নূতনভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কারাগার ভারতবাসীকে এই অমূল্যসম্পদ্ দিয়াছে। "ব্রহ্মে" অবস্থান—তাঁহার ব্রহ্মে অবস্থানই বটে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা তিলক মুক্তিলাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তিনি স্পষ্টভাষায় দেশবাসীর নিকট তাঁহার রাজনৈতিক মত প্রকাশ করেন। তাঁহার উপর পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহের অপবাদ আরোপিত হওয়ায় অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে তিনি বুঝি প্রকৃতই রাজদ্রোহী। এই ভ্রান্তির মূলচ্ছেদের আশায় ও রাজনৈতিক বিশেষ কারণে তিনি নিজের মত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি যাহা 'সত্য' ন্যায্য

ও কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহাই করিতেন। অপরে তাহার উদ্দেশ্য অন্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার বাক্যের কূট অর্থ করিতে পারেন,—এইরূপ প্রমাণ তিনি বহু ক্ষেত্রে পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কাজেই তাঁহার এরূপ সরল-মত-প্রকাশের প্রকৃত প্রয়োজন অল্প ছিল না। তিনি জানাইয়াছিলেন—তিনি ভারতের পক্ষে ইংরেজসংস্রবচ্ছেদ কল্যাণকর মনে করেন না। একাকী একটী রাজ্য স্বাধীনতা পাইয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারে না, অন্যজাতির সহিত তাহার বন্ধুত্বস্থাপনের প্রয়োজন হয়। যদি তাহাই হয়, তবে এই দীর্ঘকালপরিচিত জাতির সম্বন্ধই সমধিক প্রার্থনীয়। তিনি যে রাজনৈতিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন, সেই মঙ্গল স্বাধীনতা। যেমন ইংলণ্ডে ইংরেজ স্বাধীন, অথচ ইংলণ্ডে রাজা আছেন, কিন্তু ইংরেজগণের প্রতিনিধিরাই রাজশক্তিকে ঊর্দ্ধে রাখিয়া দেশশাসনের সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন করেন, ভারতের জনগণও তদ্রূপ ভারতের শাসনযন্ত্র-পরিচালনের অধিকার লাভ করুন্—ইংলণ্ডের রাজা—রাজবংশীয়গণ ভারতের রাজা থাকুন, কিন্তু ইংরাজমাত্রের সহিত ভারত-বাসীর জেতাজিত, প্রভুভৃত্য, শাসকশাসিত সম্বন্ধ থাকিতে পারিবে না—ইংরেজ ও ভারতবাসীর তুল্য অধিকার থাকিবে—ফলতঃ ভারতবর্ষ বৃটিশসাম্রা-জ্যের অন্তর্গত অন্যতম স্বাধীনরাজ্যরূপে পরিগণিত ও পরিচালিত হইবে—ইহাই তাঁহার কামনা ছিল। বর্ত্তমানে দেশে যে দায়িত্বপূর্ণ-শাসন-প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতেছে, সেই দায়িত্বপূর্ণশাসনের পূর্ণপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি এই মত পোষণ করিয়া কখনই রাজদ্রোহী বলিয়া তিরস্কৃত হইতে পারেন না!

মহাত্মা তিলক রাজনীতিক্ষেত্রের অবতার ছিলেন। ভারতে যেমন ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের অবতার অনেক আসিয়া লোক-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তেমনি রাজ-নীতিক্ষেত্রের অবতারও অনেক আসিয়া গিয়াছেন। তিলক তাঁহাদেরই শ্রেণীর একজন। সুরাট-কংগ্রেসের দুর্ঘটনার পর অনেক খ্যাতনামা রাজনীতিবিৎ যে তিলককে সর্পক্ষত অঙ্গুলীর মত কংগ্রেস হইতে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন, বিধাতার বিধানে সেই তিলকই কিয়দ্দিন পরে কংগ্রেসের ও হোমরুল-লীগের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইয়া বসিলেন। কি শক্তি যে তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনার অধীন নহে; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, মহাত্মা তিলক সাধারণ মানব ছিলেন না, অসাধারণ ছিলেন। অসাধা-রণতাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, সুতরাং সাধারণের মানদণ্ডে তাঁহাকে মাপিতে

গেলে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা ত নাইই, বরঞ্চ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কাই আছে। মহাত্মা তিলক ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বম্বেপ্রেসিডেন্সির নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ধারাবাহিক বক্তৃতায় দেশবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার সুমীমাংসা শুনাইয়াছিলেন। ঐ বর্ষেই তিনি "মহারাষ্ট্রহোমরুল্‌লীগ্‌" স্থাপন করিয়া, দেশে রাজনৈতিক আলোচনার প্রসার-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে হোরুমলার্‌ সম্প্রদায় এরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল যে দেশের রাজনৈতিক কার্য্যে তাহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহামতি তিলক হোমরুলারগণের নায়ক ছিলেন।

মহাত্মা তিলক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি অনেকসময় ধর্ম্মালোচনায় একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতেন। দক্ষিণাপথের "গণপতি উৎসব" তাঁহারই চেষ্টায় সঞ্জীবিত ছিল। তিনি যে সাধারণতঃ কতিপয় বিশ্বাস বা ধারণা লইয়াই হিন্দুত্ব রক্ষা করিতেন তাহা নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার জীবনের এক মূল্যবান্‌ অবসর অতিবাহিত হইত। মহাত্মা তিলক পূজাজপাদিপরায়ণ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রয়োজনানুরোধে তিনি শেষজীবনে বিলাত যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু সমাজের কল্যাণার্থে দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। মহাত্মা তিলক শেষজীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অধিক সময় ব্যয় করিতেন।

মহাত্মা তিলক দেশীয়ভাবের প্রধান প্রচারক ছিলেন। দেশজাত সামগ্রীব্যবহার তাঁহার চিরঅভ্যস্ত ছিল। দেশীয় ভাবভঙ্গী, আচারব্যবহার, বেশভূষা, প্রথাপদ্ধতি সকলকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং সে সমস্ত রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষ, কবচবস্ত্র (অঙ্গরক্ষা), উত্তরীয়, পাদুকা প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। ভিন্নদেশের বা ভিন্নজাতীয় পরিচ্ছদের সমাদর ও দেশীয় পরিচ্ছদের অনাদর তাঁহার নিকট ছিল না। সকলেই দেখিয়াছেন, মহামতি তিলক কখনও দেশীয় বা জাতীয় ভাবের আদর্শ হইতে দূরবর্ত্তী হইতে চাহেন নাই।

মহাত্মা তিলকের জীবন এক রহস্যময়ী প্রহেলিকায় পরিপূর্ণ। তিনি অনেকসময় রাজপুরুষগণের কার্য্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন, ধন জন দিয়া রাজশক্তির কল্যাণসাধন করায়ও তাঁহার প্রচুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যাপার এমনই রহস্যময় যে, তিনি রাজদ্বারে রাজদ্রোহী বলিয়া নিপীড়িত হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ জানেন ইহার মূলতত্ত্ব কি।

মহাত্মা তিলক সুপণ্ডিত, সদাশয়, ত্যাগী, কর্ম্মী, ভগবদ্‌ভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, পরোপকারী, ওজস্বী, নির্ভীক জননায়ক ছিলেন। তাঁহার রাজভক্তিও ছিল—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তবে তাঁহার অসাধারণ ওজস্বিতা, তীব্র দেশানুরাগ ও কর্ত্তব্যে একাগ্রতা, অনেক সময় তাঁহার প্রকৃতরূপকে রহস্যময় করিয়া তুলিত, তাই তাঁহাকে ভালরূপ বোঝা যাইত না।

আমরা জানি, তাঁহার অভাব বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বড় অভাব, কিন্তু শুধু 'আমরা' বা ভারত লইয়া বিচার চলে না। তাঁহার পার্থিব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এ ভূমিকায় আর অধিক চলে না—তাই তিনি হৃদয়ের গূঢ় বিশ্বাসের কথা শেষ-নিঃশ্বাসের পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদুক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন—যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্—ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ভগবানের অবতরণ—মানবাকারে মানবের অধিকার প্রচার করিবার জন্য আগমন, তিনি প্রাণে২ বিশ্বাস করিতেন, সে সম্ভাবনা দিব্যচক্ষে দেখিতেন, তাই সাহসের সহিত সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি, কর্ম্মে ধর্ম্মে জ্ঞানে প্রেমে এক মহাসাম্যের মিলনমন্দির যিনি গড়িবেন, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তিনি আসিবেন—না আসিয়া পারেন না—এই অভয় আশ্বাসবাণী শুনাইয়া ভারতের প্রাণে বলসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। হে ভারতের তিলক! হে দেবতা! তুমি মরণেও অমর—তোমাকে কোটি নমস্কার।

শ্রী——

বুদ্‌বুদ্।

ওই যে যাহার অর্দ্ধগোলাকার
ভাসিছে পুকুর মাঝে,
ভিতরে উহার বাতাসের ভার
সূর্য্যের আলোকে রাজে।
বহিছে কাঁপিয়া উঠেছে কাঁপিয়া
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলে,
কোথা হতে এল কোথায় চলিল
চলিছে কাহার বলে।

নাক্‌মুখহীন স্ববলবিহীন
দেখিতে সুন্দর অতি,
টলমল করে, কি আছে ভিতরে,
জানি না উহার নীতি।
হস্তপদশূন্য, করেছে কি পুণ্য
চিন্তা-শূন্য ভাবে আছে,
ক্ষুধার সময় কি করে উপায়
চাহে বা কাহার কাছে ?
মরণের ভয় কদাপি কি হয়
জানিতে বাসনা করে,
কি ফল লাগিয়া রহিয়া রহিয়া
এপারে ওপারে ঘোরে !
আহা ! কোথা গেল, জলে কি মিশিল,
না, উড়িল হাওয়ায় ?
বুঝি না বুঝি না বুঝিতে পারি না,
গিয়াছে দিশাৎ কোথায়।
নামটি "সোহহম্" লইয়া চরম্,
বায়ুর উপাধি ধরি,
বাস্তবিক জল না চাহিয়া ফল,
ভেসে জলের উপরি,
করমের ফলে ধরি রূপ জলে,
সাকারভাবেতে ছিল,
নিরাকার নাকি কিছুদিন ফাঁকি
দিয়া, জলেতে মিশিল।
উপাধি বায়ুতে জলাত্মা জলেতে
বিলীন হইয়া গেল
দেহ পঞ্চভূতে পরাত্মা ব্রহ্মেতে
যেমন, তেমন হ'ল।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্‌বুদ্ধ্বাবুদ্ধিমান্‌স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চভারত" ইত্যুক্তং তত্র ক এতত্তত্ত্বং বেত্তি কোবা ন বেত্তি ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ভারত (অর্জ্জুন!) অভয়ং (অভীরুতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (সত্ত্বম্ অত্র চিত্তম্ অন্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনাদিবর্জনং চিত্তস্য সুপ্রসন্নতা) জ্ঞান-যোগ-ব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (যোগ্যপাত্রে যথাশক্তি ভোজ্যস্য অন্নাদেঃ সংবিভাগঃ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ) যজ্ঞঃ (অগ্নিহোত্রাদিদেবযজ্ঞাদিঃ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞাদি) তপঃ (উত্তরাধ্যায়বক্ষ্যমাণং ১৪শ ১৫শ ১৬শ শ্লোক প্রতিপাদিতং শারীরং বাঙ্ময়ং মানসং চ তপঃ) আর্জবং (ঋজুত্বং) ১

অহিংসা (পরপীড়াবর্জনং) সত্যং (যথাদৃষ্টার্থভাষণং) অক্রোধঃ (তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ ঔদাস্যং) শান্তিঃ (অন্তঃকরণস্যোপশমঃ চিত্তোপরতিঃ) অপৈশুনং (পরদোষপ্রকটনং পৈশুন্যং তদভাবঃ পরোক্ষে পরদোষাপ্রকাশনং) দয়া ভূতেষু (ভূতেষু দুঃখিতেষু দীনপ্রাণিষু কৃপা) আলোলুপ্ত্বং (নির্লোভত্বং) মার্দ্দবং (মৃদুতা অনুগ্রতা) হ্রীঃ (লজ্জা) অচাপলম্ (অপ্রয়োজনং বাক্‌পাণিপাদাদীনাং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্) ২

তেজঃ (প্রাগল্‌ভ্যং অপরাভববৃত্তিঃ) ক্ষমা (তাড়িতস্য তিরস্কৃতস্য পরিভবাদিষু সমর্থস্যাপি ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ) ধৃতিঃ (দুঃখাদিভিঃ অবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণং) শৌচং (দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ শুদ্ধিঃ—মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্ম্মল্যং রাগাদিবর্জ্জনং আভ্যন্তরং) অদ্রোহঃ (জিঘাংসারাহিত্যং)

নাতিমানিতা (আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানাভাবঃ) (এতানি অভয়াদীনি ষড়্‌-বিংশতিপ্রকারাণি) দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য (দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদং অভিজাতস্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো) ভবন্তি ৷ ৩

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! নির্ভীকতা, অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাদি পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যকথন, অক্রোধ, ঔদাস্য, চিত্তের উপরতি, পরনিন্দাত্যাগ, সর্ব্বজীবে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তর্বাহ্য শুচিতা, অবিরোধ এবং অভিমানশূন্যতা এই ষড়্‌বিংশতি-প্রকার বৃত্তি দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। ১।২।৩

আলোচনা। ভগবান্‌ই যে সংসারবৃক্ষের মূল—তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হইয়াছে। বাসনা সংসারবৃক্ষের অবান্তর মূল। বাসনার পরিপুষ্টিতে সংসারবৃক্ষের পুষ্টি। জীব বাসনার বলে পরিচালিত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। বাসনা শুভ ও অশুভ দ্বিবিধ; বাসনা গুণ-ভেদে ত্রিবিধ——সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক বাসনা শুভ এবং দৈবীসম্পৎ, আর রাজসিক ও তামসিক বাসনা অশুভ এবং আসুরীসম্পৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ এই অধ্যায়ে সেই দৈবী ও আসুরী সম্পদের কথা বলিবেন।

শাস্ত্রার্থ বিদিত হইয়া নির্ভয়ে তদনুষ্ঠান এবং মৃত্যু আদির ক্লেশ-শঙ্কার অভাবের নাম অভয়। মিথ্যাপ্রবঞ্চনা-মায়াদি-ত্যাগসংস্কৃত অন্তঃকরণের নির্ম্ম-লতার নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। আত্ম-স্বরূপ-নির্ণয়-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে আত্মানু-ভূতির নাম জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি। স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক যোগ্যপাত্রে নিজ বস্তু অর্পণের নাম দান। এতদ্ভিন্ন চক্ষু কর্ণ ও হস্ত-পদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, অগ্নি হোত্রাদি দৈবযজ্ঞ, এবং তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান, বেদাদির অধ্যয়ন, পর অধ্যায়ে ১৪শ ১৫শ ১৬শ শ্লোকে ব্যাখ্যাত শারীরিক, বাচিক, মানসিক তপস্যা, অকপটতা, অন্যের ক্লেশকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা, যথার্থ অর্থবোধক কথন, ব্যথিত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া, যোগ্যপাত্রে দান, অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের উপশম, পরোক্ষে কাহারও দোষ-কীর্ত্তন না করা, সর্ব্বজীবের দুঃখমোচনের চেষ্টা, ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তির বিষয়ে অব্যাকুল থাকা, সরল ও কোমল-বাক্য-ব্যবহার, বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কেবল প্রয়োজনমাত্র ব্যবহার, অন্যের নিকট অপরাজেয়ের শক্তি, ব্যথিত হইয়া সামর্থ্য-সত্ত্বেও ক্রোধ না

করা, চঞ্চল ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত রাখিবার শক্তি, শারীরিক মানসিক পবিত্রতা, অবিরোধ, অভিমানরাহিত্য—এই ষড়্‌বিংশতি গুণ সাত্ত্বিক এবং ইহাই দৈব-সম্পত্তি-নামে কথিত। যাঁহারা সাত্ত্বিকী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই সকল গুণ লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে পুণ্যময়ী বাসনা দ্বারা প্রেরিত জীব, পরজন্মে পুণ্যবান ও পাপবাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত আছে—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" ১।২।৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পার্থ! দম্ভঃ (সর্ব্বথা আত্মগৌরবপ্রকাশঃ ধর্ম্মধ্বজিত্বং) দর্পঃ (ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্য ঔৎসুক্যং, বলবত্তাভিমানং) অভিমানঃ (আত্মনি অতিপূজ্যত্ববোধঃ) ক্রোধঃ (কোপঃ) পারুষ্যং (নিষ্ঠুরত্বং) অজ্ঞান (আত্মজ্ঞানাভাবঃ অবিবেকঃ মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ) (এতানি) আসুরীং সম্পদং অভিজাতস্য (তাং অভিলক্ষ্য জাতস্য) ভবন্তি। (দম্ভাদয়ঃ সর্ব্বেহপি রজস্তমোধর্ম্মাঃ) ৪

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ, আসুরী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ নিষ্ঠুরতা অজ্ঞান এই সকল লক্ষণ-যুক্ত হয়। এই সকল গুণকে আসুরীসম্পদ্ বলে। ৪

আলোচনা। প্রথম ৩ শ্লোকে ২৬টী দৈবীসম্পদের কথা বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম-ধন-সম্পদাদিতে আত্মশ্লাঘাপ্রকাশ, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির আধিক্য মনে করিয়া গৌরব বোধ করা, "আমি মান্য—পূজ্য" এই প্রকার ধারণা, ক্রোধ, নিষ্ঠু-রতা, দেহ ও আত্মার একত্ববোধ, অবিবেকিতা—এই ছয়টী "আসুরী সম্পদ্" নামে কথিত হয়। এই সমস্ত ভাব রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে জন্মে। যাহারা রাজ-সিক তামসিক বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা এই সকল আসুর-গুণ প্রাপ্ত হয়।

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে। দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় (সংসারবন্ধনাৎ মুক্তয়ে,) নিবন্ধায় (সংসারবন্ধনায়) আসুরী (সম্পৎ) মতা, হে পাণ্ডব (অর্জ্জুন) মা শুচঃ (শোকং মাকার্যীঃ) (যতঃ ত্বং) দৈবীং সম্পদং অভিজাতোঽসি। ৫

বঙ্গানুবাদ। দৈবীসম্পদ্ সংসারমোক্ষের হেতু এবং আসুরীসম্পদ্ সংসার-বন্ধনের হেতু। হে অর্জ্জুন! তুমি শোক করিওনা, যে হেতু তুমি দৈবী সম্পদ্সহ জন্মিয়াছ। ৫

আলোচনা। ব্রাহ্মণাদিচতুর্ব্বর্ণোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তি-গণই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া দৈবীসম্পদ্ প্রাপ্ত হন। কর্ম্মের দ্বারা নিষ্ঠা, নিষ্ঠাদ্বারা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে উপাসনায় অনুরাগ, উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানোদয় হয়। এই জন্যই প্রথমে কর্ম্মানুষ্ঠান। সেই কর্ম্ম শাস্ত্রসঙ্গত এবং বর্ণাশ্রমোচিত হওয়া উচিত। বর্ণাশ্রম দ্বারা কর্ম্মের অধিকারী নির্ণীত হয়। এই প্রকারে যাঁহারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হন, তাঁহারাই দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়া চরমোন্নতিতে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষের অধিকারী হইতে পারেন।* আর যাঁহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা রাজসিক-তামসিক প্রকৃতি দ্বারা আসুরভাব লাভ করেন। এই আসুরীসম্পৎ সংসারবন্ধনের মূল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের হেতু। এইজন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন "হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিওনা; তুমি দৈবীসম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ৫

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু। ৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পার্থ অস্মিন্ লোকে (সংসারে) দৈব আসুরশ্চ এব দ্বৌ (দ্বিপ্রকারৌ) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টী সৃষ্টিঃ সৃজ্যত ইতি সর্গ ইতি উচ্যতে) দৈবঃ বিস্তরশঃ (সবিস্তরং) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) আসুরং মে (মমবচনাৎ) শৃণু (অবধারয়)। ৬

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! এই সংসারে দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকৃতির সৃষ্টি রহিয়াছে। দৈব-প্রকৃতির বিষয় তোমাকে পূর্ব্বে বিস্তারিত বলিয়াছি, এক্ষণ আসুরপ্রকৃতির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬

আলোচনা। সংসারের মানুষ দ্বিবিধ। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মজাত সত্ত্বপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কাম-ক্রোধ-লোভ ও হিংসা-দ্বেষাদির বশীভূত না হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারাই দেবপ্রকৃতি বা দেবতা, আর যাঁহারা পূর্ব্ব-জন্ম হইতে রজস্তমোগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ইহজন্মে কাম-ক্রোধ-রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া লোকের ক্লেশ উৎপাদন

পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারাই আসুর-প্রকৃতি বা অসুর। দৈবপ্রকৃতির সুফল এবং আসুর প্রকৃতির কুফল দেখাইয়া, মনুষ্যকে দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন হইতে উৎসাহিত করা গীতার উদ্দেশ্য। ভগবান্ পূর্ব্বে পূর্ব্বে অধ্যায়ে—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক হইতে একসপ্ততিতম শ্লোকে, [illegible] অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের [illegible] এবং এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে, যে সকল গুণাযুক্ত হইলে, মনুষ্য, দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়া, জন্মজন্মান্তরে ক্রমোন্নতি [illegible] প্রাপ্ত হইয়া, আত্মদর্শনের অধিকারী হইতে পারে, তাহা [illegible] বলিয়াছেন। এক্ষণে আসুর-সম্পদের কথা বলিতেছেন। [illegible] না জানিলে, লোক তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় কিরূপে? ৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। (আসুরীং [illegible] নিরূপয়তি।) আসুরাঃ জনা (আসুর-স্বভাবাঃ) প্রবৃত্তিং (ধর্ম্মে প্রবৃত্তিং) নিবৃত্তিং (অধর্ম্মাৎ নিবৃত্তিং) চ ন জানন্তি। (কেবলং ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব [illegible] ইতি ন) (অপিতু) শৌচং (শুচিত্বং) নাপি আচারঃ ([illegible]) ন সত্যং তেষু বা বিদ্যতে। ৭

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের আসুর স্বভাব, তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই এবং শৌচ অশৌচ আচার অনাচার [illegible] জ্ঞান নাই। ৭

আলোচনা। আসুরপ্রকৃতি লোকেরা [illegible] তমোগুণান্বিত, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মভেদ-জ্ঞান থাকে না। যাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধ নাই, তাহার শৌচ] অশৌচ সদাচার অনাচার সত্য মিথ্যা জ্ঞান থাকা কদাচ সম্ভব নয়। পাপাচরণের অভ্যাসে স্বভাবও পাপে পরিণত হয়। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। তে (আসুরাঃ) জগৎ অসত্যং (নাস্তি সত্যং, বেদপুরাণাদিপ্রমাণং [illegible] কর্ত্তারো [illegible] ইতি আহুঃ) অপ্রতিষ্ঠং (নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা [illegible] ব্যবস্থাহেতুর্যস্ত তৎ স্বভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ) ([illegible]) অনীশ্বরম্ (নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ) অপরস্পরসম্ভূতং (অপরশ্চ পরশ্চেত্যপরস্পরম্ অপরস্পরতঃ অন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্মিথুনধর্ম্মেণ সম্ভূতং জগৎ) কিমন্যৎ

(কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ) কামহেতুকম্ (স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেতি) আহুঃ। ৮

বঙ্গানুবাদ। আসুরভাবাপন্ন পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, এই জগৎ অসত্য—ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থাহীন, ইহার কোনও ঈশ্বর নাই, এই জগৎ কাম-হেতু স্ত্রীপুরুষসংযোগে জন্মিয়াছে—অন্য কোনও কারণ নাই। ৮

আলোচনা। আসুরপ্রকৃতি লোকেরা জগতের মূলে কোন সর্ব্বজ্ঞের সত্তা স্বীকার করেন না। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র অমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাই যে এই জগৎসঞ্চালনের হেতু, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শুভাশুভ কর্ম্মের নিয়ন্তা ও সুখদুঃখের ফল-বিধাতা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই—এজন্য তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে স্বেচ্ছাচারে জীবনযাপনে কোনও সঙ্কোচ মনে করেন না। তাঁহারা পরকাল বা ইহকালের সম্বন্ধে পাপপুণ্য মানেন না। তাঁহারা বলেন; মানবের পূর্ব্বকাল পরকাল কিছুই নাই—সমস্তই ভ্রান্তি। মৃত্যুর পর দেহ-ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিরীশ্বরবাদ চার্ব্বাক্‌দর্শনে উক্ত—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

ঈশ্বর হইতে জগৎ সৃষ্ট ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, বিষয়ভোগাভিলাষী স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কামই জগতের উৎপত্তি-হেতু। পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মফল বা ঈশ্বর কিছুই নাই। ৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

লঙ্কা-বিজয়।

(চতুর্থ-সর্গ)

বিষাদে মহিষীসহ অন্তঃপুর মাঝে
নির্ব্বেদে কর্ব্বুর-রাজ ঘোর অভিমানে
মৃতপ্রায়; কালসর্প মহাভয়ঙ্কর
শীতের আগমে যথা নম্র-শির মরি।

এখনো রুধিরধারা ঝর-ঝর-ঝরে
ঝরিতেছে রক্ষোরাজ-বক্ষ বিদারিয়া;
হারায়ে গৌরবরাশি ঘোর অভিমানে
স্মরিল রাবণ মহীরাবণ কুমারে
(জনমের মত যেন বিদায় মাগিতে)
পাতালে; অমনি মহী অহিসম তেজে
উত্তরিয়া প্রণিপাতি পিতা-মাতা-পদে
মাখিলেক ভক্তিভরে শিরে পদ-রজঃ।
কিন্তু মহারথী হেরি পথি মাঝে হায়
বহু অমঙ্গলসেতু প্রমাদ গণিল;
সুধায় পিতায় মরি করিয়া মিনতি—
"এ দুর্গতি পিতৃদেব! কি হেতু তোমার?
ঝরিছে রুধিরধারা ঝর-ঝর-ঝরে
মায়ের সুতনু হ'তে, তনু হ'তে তব।
হেরিনু পশিতে পুরে ভগ্ন সিংহদ্বার.
আচ্ছন্ন এ রাজপুরী বানরনিকরে;
রুদ্ধ যত গৃহদ্বার, উদ্যান নিকুঞ্জ
উৎপাটিত, ভগ্ন শাখাপ্রশাখা-বিহীন।
ধর্ম্মাগার, অস্ত্রাগার, ধনাগার আদি
সমস্ত বিধ্বস্ত যেন প্রলয়পীড়নে
ঘোরতর। কোথা তাতঃ! খুল্লতাত মম
কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজেতা ভ্রাতা ইন্দ্রজিৎ
তরণী, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বীর বীরবাহু,
মহাবল মকরাক্ষ, বিরূপাক্ষ, বলী
মহোদর, অকম্পন, যূপাক্ষ নিকর
আর যত মহারথী যূথপতিসম?
কোন্ কাজে রত সবে কহ কোন্ দেশে
তবাদেশে; প্রণমিবে কবে আসি পুনঃ
শ্রীচরণে? কহ তারা রণজয়ী হয়ে
কেন বা বিরত, হতে আগত স্বদেশে?

ভাসিছে বিষাদনীরে দীনের মতন
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, কেহ অঙ্গহীন
আথি বিথি ; রক্ত-স্রোতে রঞ্জিত ধরণী
যেনরে শ্মশান-ভূমে পরিণত পুরী !
শকুনী, গৃধিনী, কাক, শিবা, সারমেয়
করিছে বিকট কণ্ঠে ধ্বনিত ধরণী !

কেন পিতা ! চিতা-ধূমে আঁধার সতত
দশ দিশ্ ! দিশাহারা তরণীর প্রায়
(যেনরে ঝটিকাগ্রস্ত) ব্যতিব্যস্ত সবে
পরিপূর্ণ স্বর্ণ-লঙ্কা করুণক্রন্দনে !
কালের প্রেরিত হ'য়ে কোন্ কুলাঙ্গার
পশিল এদেশে তব, রিপুবেশে তব !"
শুনিয়া মহীর হেন অহির তর্জ্জন
নাচিয়া উঠিল আহা রক্ষঃকুলপতি
রাবণ ধূনার গন্ধে মনসার মত ;
হাসিল স্বকরে যেন শত শশধর
আসিয়া, বহিল প্রাণে শান্ত সমীরণ
সুশীতল, মলয়ের সুগন্ধ সহিত।

কহিলেক লঙ্কেশ্বর ক্ষীণতর স্বরে
ক্ষণপরে,—"হায় বৎস, বীভৎস ঘটনা
বর্ণিতে ঘুর্ণিত শির হ'তেছে আমার
মহাশোকে ; কিন্তু যবে সুধাইলে ধন
সুধামুখে অভাগায়, সে দুঃখকাহিনী
বিবরিব একে একে, কর অবধান।

"ভাবি নাই, দেখি নাই স্বপনেও যাহা
কোন দিন ! একাকিনী পঞ্চবটীবনে
সূর্পনখা পিসী তব বিমলচরিতা
বিচরিতেছিল মাত্র ; নেহারিয়া তায়

কোশলের কুলাঙ্গার পিতৃবিতাড়িত
—দয়িতা ও ভ্রাতা সহ—সে কানন মাঝে
বনচারী জটাধারী দুরাচার রাম
ছেদিয়া নাসিকা-কর্ণ বিবর্ণ করিল
দিয়া অনুমতি, নিজ অনুজ লক্ষ্মণে
অনাথিনী ভগ্নী মোর অগ্নি মূর্ত্তি ধরি
ফিরিলেক গৃহে; হেরি নিগৃহীতা হায়
নারি সম্বরিতে ঘোর অন্যায় আচার
গৃহিণী সীতায় তার করেছি হরণ,
সে দুরাত্মানিকরের শিক্ষা প্রদানিতে।
অতঃপর সঙ্গে করি অসংখ্য বানর
করিছে সে অত্যাচার; বাঁধি মহাসিন্ধু,
দহিতেছে পুনঃ পুনঃ স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
দুঃখের বারতা বৎস কি আর কহিব!
দুরাচার বিভীষণ রক্ষঃকুলাধম
করিয়াছে আত্মীয়তা সে পাপাত্মা সনে
লভিবারে রাজপদ সম্পদনিকর
আহ্লাদে উৎফুল্লচিত্ত খুল্লতাত তব।
কুম্ভকর্ণ অতিকায় মেঘনাদ আদি
কালের কঠোর কক্ষে সকলে শায়িত
একে একে, তাতঃ তব খুল্লতাতছেলে;
জীবিত এখন মাত্র একাকী অভাগা
এ শ্মশানে, পোহাইতে এই অবিরল
শোকানল, নিদারুণ দাবানলসম!

হায় বৎস! ত্রিভুবন কম্পিত সতত
যে পিতার তাপে তব, শঙ্কিত বাসব
ত্রিদিবে, পাতালে দৈত্য, নর মর্ত্তলোকে
সেই রক্ষঃপতি আজ রক্ষিতে অক্ষম
এখন আপদ নাশি কর নিরাপদ,

লঙ্কা তব, হে লঙ্কার অলঙ্কার মোর।
রক্ষ, রক্ষঃকুল-তরী অকূলকাণ্ডারী
নিপতিত সুত এই বিপত্তি-সাগরে।
কি আর কহিব বৎস দুঃখের কাহিনী,
শুক্রাচার্য্য-উপদেশ কালি নিশীযোগে
নিরজনে হোমে রত ছিনু গুরুগেহে
তাঁ সহ; হঠাৎ আসি পশি পুরমাঝে
দুরন্ত বানরগণ প্রাণান্ত করেছে
ঘোর অত্যাচারি; শেষে পশি অন্তঃপুরে
বন্দীবেশে মন্দোদরীজননীরে তব—
করিয়াছে নিগৃহীত,—কেশ আকর্ষিয়া।
কোটি কোটি বানরের অন্যায় আচারে
মৃতপ্রায় বাপ; লঙ্কা শ্মশান এখন।"

শুনি পিতামুখে সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত
বিভ্রান্ত রাবণি; হেরি অবিশ্রান্ত যত
বিভব-বিনাশ হায় ভাবে মনে মনে—
"পিতা মোর সীতা হরি মজালে সকলি।

* *

কিন্তু পুত্র হয়ে আমি কেমনে করিব
অবজ্ঞা তাঁহার আজ্ঞা, অজ্ঞের মতন।
বিশেষ বিপৎকালে কিম্বা দুঃসময়ে
কিবেনা মনের গতিনিয়তি-অধীন।"
ভাবি, নানামতে করে লঙ্কার ঈশ্বরে
পাতাল-ঈশ্বর তুষ্ট শিষ্ট আলাপনে।
"কেন চিন্ত লঙ্কা-কান্ত কৃতান্ত-তাপন
মূর্ত্তিমান্ বহ্নিসম বর্ত্তমান যবে
এ দাস। কিন্তু হে তাত। নিঃশেষিয়া সব
শেষ করি, শেষ কালে স্মরিলে আমায়;
তা না হলে ওহে প্রভু বিনা অভিলাষে

এইক্ষণ-রিপুক্ষয় কটাক্ষে হইত
মায়াচক্রে মোর হায়; জানিত না কেহ—
ধৌত হ'ত কি কৌশলে লঙ্কায় কালিমা।
তবু আজি ছদ্মবেশে নিদ্রাবেশে পশি
নিশীযোগে হরি আনি অনুজ সহিত
সে রামলক্ষ্মণে মন্ত্রে মুগ্ধ করি সব
নিজরাজ্যে; পোহাইলে বিভাবরি কালি
পূজা দিয়া বলি দিব কালিকার পদে—
এ প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞতম পাদ-পদ্মে তব।"

শুনি সুতমুখে তুষ্ট দুষ্ট লঙ্কাপতি
এ ভারতী, মহাসুখে চুমিলেক শির
বারেবারে; সৌদামিনী লাগিল খেলিতে
ঝলকে ঝলকে যেন রাবণ-অধরে।
কহিলেক—"চিরজীবী চিরজয়ী হয়ে
এ কুলের মান বৎস রক্ষ হে সতত
বুদ্ধিবলে বাহুবলে, আশীর্ব্বাদ করি;
রক্ষঃকুলছত্রধর হে পুত্র আমার।"
হেথায় শিবির-মাঝে শুনি অসম্ভব
মন্দোদরী-পরে ঘোর নিন্দিত আচার
বানরনিকর-করে বানরের মুখে
রহিলেন মৌনী হয়ে ক্ষৌণী-অধিপতি
রঘুপতি; বিচলিত অন্তর তাঁহার
চিন্তাবায়ু-সন্তাড়নে; শিবিরের পাশে
শিবার অশিব ধ্বনি শুনি শিহরেন
মুহুর্ম্মুহু; বাঁমবাহু হইল স্পন্দিত,
ঝরিতে লাগিল স্বেদ সহস্রধারায়
দেহ হ'তে; হেরিলেন আঁধার ধরণী;
ঘন ঘন উল্কাপাত সে আঁধার মাঝে
হেরিলেন; হেরিলেন ঘোর ভূকম্পনে

টলমল ধরা যেন চরণের তলে
ক্ষণে ক্ষণে ; সীতাপতি মতিচ্ছন্ন প্রায়।

হেরি হেন অমঙ্গলঘটনানিকর
কহিলেন রঘুপতি কাতরে সম্বোধি
বিভীষণে,—ওহে মিত্র, অলক্ষণ যত
হেরিতেছি অনুক্ষণ, বাম অঙ্গ মোর
হতেছে স্পন্দিত যেন মহান্ আতঙ্কে
ভয়ঙ্কর। দশানন অত অত্যাচার
সহিয়া রহিল কেন ক্ষান্ত দিয়া রণে
এতক্ষণ ; অস্থির হে তাই ভাবি আমি।
হের মিত্র, ছদ্মবেশে রক্ষঃসঙ্গে পশি,
উগ্রচেতা তবাগ্রজ ব্যগ্রতাবিহীন
কি হেতু নিরস্ত আছে সমস্ত দিবস,
না জানি কি মায়াজাল বিস্তার করিয়া!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

পাগলের প্রাণের দান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ভক্তির ভগবান্" এই প্রবাদবাক্য আমার মনে লাগে। তোমায় বাঁধ্‌বার গুণ যদি কিছু থাকে, তাহা একমাত্র প্রেমভক্তি। তুমি হৃদয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা, তোমায় 'পর' ভাবিলে চলিবে কেন? যতটা নিকটে যেতে পারি, তাহাই চেষ্টা কর্‌তে হবে। প্রবাদবাক্যে বলে—"জীব মরে আপন দোষে, কি কর্‌বে হরিহর দাসে"—অতীব সত্যকথা। ভগবন্ তুমি এমন মানবজন্ম দিয়েছ যে, তাহার তুল্য ভজনসাধনোপযোগী দেহ আর হইতে পারেনা। শরীর বাক্য মন—এই তিন সাধনে সাধনা আর কোনও দেহেই হইতে পারেনা। শাস্ত্রে যত কিছু ভগবৎসাধন-ভজনের উপদেশ আছে, সে সমস্তই কায়মনোবাক্য-

সহায়ে সম্পন্ন হইতে পারে। বেদান্তাদিশাস্ত্রে যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, ভক্তিমার্গেও তাহা আছে। চণ্ডালোঽপিদ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ—এই বচনবলে বহু বিড়ালব্রতী নর দ্বিজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখেন না যে, হরির ভক্তিই পর একমাত্র অয়ন আশ্রয় হইয়াছে যাহার—সেই চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ—বটে; কিন্তু, সেটা হ'তে কত জীবন গত হয়ে যায়, তার সংখ্যা নাই; সকলের ভাগ্যে ঘটেও না। মুখে পাখীর মত বুলি ধরিলে কিছুই ফল নাই, মনপাখী বুলি ধরিলে তবে ফল ফলিতে পারে। একজীবনে হরি দেখা না দেন, ক্ষতি নাই। সাধনার পথে শঙ্কা নাই, পতন হ'লেও ক্ষতি নাই। দয়াময়ের রাজ্যে কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না। গতি ক্রমে উর্দ্ধেই হবে, আবার তথায় পূর্ব্বসংস্কার জাগরূক হইয়া সাধনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবে। যদি ক্রমেই গতি উচ্চদিকে চলিল, বল দেখি, তবে আর ভক্ত সাধকের মরণে কি ভয়? যাঁহার স্মরণমাত্রে, সকল বন্ধনের খণ্ডন হয়, সর্ব্বসংশয় তিরোহিত হয়, সে আনন্দসিন্ধু পেলে আর ভয় কি? আমরা পামর, বিষয়বিষের কীট, দয়ালয়ের চরণ-স্মরণে বিমুখ, আমাদিগের রোদননিবৃত্তি হবে কেন? এত ভ্রান্ত আমি পান্থ যে, যে আমায় নরকে লয়ে ডুবাবে, আমি তারই আহ্বানে, তারই অনুগামী হয়েছি। কত যাদুমন্ত্রে আহা! কুহকিনী পাগল ক'রে, আমায় কত যাতনা দিয়েছে। কত দিবানিশি বৃথা অশ্রুপাত করেছি! সে কা'র জন্য? যার জন্য করেছি, সে অন্তরে শঠতা-পূর্ণ হাসি হেসে বাহ্যিক শোকাভিনয় প্রদর্শন করেছে। তত ব্যাকুলতা, তত যত্ন, অবিশ্রান্ত শ্রম, যে বিষয়ের জন্য, হায়! হতভাগ্য আমি! তাহার শতাংশের একাংশও কেন হরিচরণ-সরোজের জন্য হইল না? হায়! আমি কেন প্রাণের সর্ব্বস্বধনে ভুলে জঠরেই মরিলাম না! এ ভারভূত জীবন-ধারণে আমার কি ফল আছে? হৃদয়ে যদি হরি-ভক্তির বীজাঙ্কুর না জন্মিল, তবে আর সে হৃদয় ধারণে ফল কি? হা প্রাণকৃষ্ণ! দয়াময়! কত দূরে তুমি আছ, হা প্রভো! তোমা বিনা আমার জীবন বিফল। আমায় নিজগুণে দয়া কর।

আমি কাতরপ্রাণে লুটায়ে পড়ি রাজীবচরণ-মূলে,
তুমি দয়াল ব'লে এসেছি দুয়ারে লওগো তনয়ে কোলে।
তুমি, দয়া না করিলে জগত মাঝারে সবাই ঠেলিবে পায়ে,
তোমার করুণা বাঁচায়ে রেখেছে, জনকজননী চেয়ে।

হা প্রাণগোবিন্দ ! অপার করুণাসিন্ধু তুমি, তোমার সৃষ্ট এ সংসার, এতে এত নিষ্ঠুরতা কেন ? জানিনা প্রভো ! সেকি দীনের ভাগ্যফল ! জগতে অতুল সৌন্দর্য্য বিকাশ করেছ, দেখে মনে হয়, না জানি তুমি কত সুন্দর—তুমি অনন্তসৌন্দর্য্যনিধি। কোন বস্তুর অনুরূপ না থাকিলে কখনই তাহার সত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে না। সকল জলই সেই জলনিধির অংশ, সকল কিরণই সৌরমণ্ডলের বিকাশ, সেইরূপ প্রেম, স্নেহ, আনন্দ, যাহা কিছু কণামাত্র জগতে দেখিতে পাই, সে সমস্তই তোমার অংশ। ভ্রান্ত-মানব, সেই কণামাত্র-লাভেই চরিতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু, জগতে যাহা কিছু সুখাস্পদ দৃষ্ট হয়, তাহা অবিমিশ্র নহে, দুঃখ-শোক-যাতনা-মিশ্রিত। তুমি স্বয়ং সত্ত্বনিধি। সাংসারিক সুখ রজস্তমোবিমিশ্রিত, সুতরাং তাহা দুঃখ-পরিণামী না হইবে কেন ? তাহাতে অপার যাতনা মিশ্রিত, তবুও জীব তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে। জন্মজন্ম জীব যে রসে নিমগ্ন, সে তাহার অধিক পাইবে কোথা ? সুতরাং সে অবিজ্ঞাত অখণ্ডরসের প্রত্যাশীও হয় না। বিশ্বের মোহজননী ইন্দ্রজাল-পিঞ্জিকার অন্তর্নিহিত রহস্য ভেদ করিতে ভ্রান্ত মনুষ্য সহজেই অসমর্থ। তাই সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাগতি ব্যতীত কোনও মতেই জীবের নিস্তারের উপায় নাই। উপায় অপায় সকলই দেব ! তব পা'য় ! নিরুপায় উপায় পায় ধরিলে তোমার রাঙাপায়। হায় ! হায় ! কি ভ্রান্তি ! জীব ইহা বুঝেও বুঝে না। আমরা জীবনে কত লাভ-ক্ষতি বিচার করি, তাহার অবধি নাই। এমন কি, অর্দ্ধ পয়সার একটি হাঁড়ি খরিদ করিতে গেলেও তাহা তিন চারিবার ঘা দিয়া লই, কি জানি পাছে ফাটাফুটা বাহির হয়। অর্দ্ধ পয়সার ক্ষতি সহ্য হয় না, কিন্তু, অমূল্য জীবনটা ষোল-কড়াই কাণা হইল, সমস্ত জীবনটাই বিফলে গেল, একটি পয়সাও লাভ হইল না, তাহাত প্রাণে সহিল ! এ কেমন জমাখরচজ্ঞান তাহাত কিছু বুঝি না ! বুঝিতে হইলে সকল দিকই বুঝা উচিত, নচেৎ একদেশদর্শীর প্রতিপদেই বিপদের সম্ভাবনা। সম্ভাবনা কেন বলি, বিপদ্ মানবের প্রতিপদেই লাগিয়া আছে। বিপদ্ভঞ্জনের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই বিপদের পথ প্রশস্ত হয়েছে। তবুও বিপদ্ভঞ্জন ব'লে আমরা ডাকিতে পারি না। দোষ দিব কা'র্ ? সকল দোষই স্বীয় অদৃষ্টের। খাল কেটে জল আনিলে, তাহাতে নক্র এসে যদি গ্রাস করে, তবে সে দোষ আর কা'র ? হায় ! এইরূপ অপার দুঃখে কত জনম গত হয়েছে, তবু ত জাগরণ হয় নাই। এ ঘুমের ঘোর আর কত

দিনে ঘুচিবে তাহা জানিনা। অরুন্তুদ ব্যথা পেয়ে যদি কখনও মন ফিরে, সেও নিমিষের নিমিত্ত! ক্ষণিক বৈরাগ্যে কি স্থায়ী ফল হবে!

চরণে কণ্টকাঘাত, মরমেতে বজ্রাঘাত, দুনয়নে অশ্রুপাত—তাই এসেছি দেব! নিদারুণ ব্যথা জানাতে তোমাকে। তুমি এ বিশাল রঙ্গভূমির অধি-নায়ক, এ অভাজন জনে পরীহার ক'রে অভিনয় কর্‌লে তোমার কি অভিনয় সম্পূর্ণ হয় না? একজন ব্যতীত অসংখ্য অভিনেতার হাসিকান্নায় তোমার কি পরিতৃপ্তি হয় না? শক্তিশালীর শক্তির অপব্যবহার বড়ই পরিতাপের বিষয়। দুর্ব্বলদলনে বলবানের কি পৌরুষ, কি মহিমা বৃদ্ধি হয় জানি না। দয়ালুর দয়া যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত হ'লেই প্রশংসা বটে। নিরপেক্ষ পরদুঃখহরণেচ্ছাই প্রকৃত দয়া। তুমি দয়াসিন্ধু, আমি সকল ভাবেই কাঙ্গাল, আমার প্রতি দয়া তোমার উপযুক্তই হবে। আমি সর্ব্বপ্রকারে অশক্ত বলিয়াই তোমার দয়ার ভিখারী। কোন গুণ নাই যে সেই গুণে তোমায় বাঁধিব। কোন বস্তু নাই, যাহা তোমায় উপহার দিব। এক যদি মন বশে রহিত, তাহলেও পারিতাম,—নিরবধি তোমার চরণে ফেলিয়া দিয়া প্রাণ খুলে কাঁদিতাম। তাহ'লে বুঝিতাম—তোমার দয়া হয় কিনা। কখনও ভাবি, তুমিই যখন সর্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি, তখন আমার অবাধ্য মন কি তুমি স্বীয় পদে ফিরাইয়া লইতে পার না? অবশ্যই পার। আমার বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই, রতি নাই, মতি নাই ব'লে কি আমার অবাধ্য মন ফিরাইয়া লওনা? আমিত বলি—আমার কোন ক্ষমতা নাই, যাহা কর্ত্তব্য হয়, তুমিই কর। বুঝেছি প্রভো! আমার সেরূপ নির্ভর নাই বলেই তুমি আমার কথা শুন না। আমি শপথ করে বল্‌ছি, তুমি আমায় পাগল করিয়া সঙ্গে লও। কৃষ্ণ হে! আকর্ষণ করে কাছে লইয়া যাও, আমায় সংসার ভুলাইয়া দাও, ছার সংসারে অমানিশা আনিয়া দাও, আমার বাসনা বলি দাও, তা'তে আমার সুখ ভিন্ন অণুমাত্র দুঃখ নাই। তোমায় পেয়ে যদি আমি অনন্তজীবন সকল ভুলিয়া থাকি, সেও আমার পরম লাভ।

আমি অন্য 'লাভ' লাভ বলিয়া মনে করি না, নীলমণিধনলাভই প্রকৃত লাভ মনে করি। তাই বলি, প্রাণপ্রিয়! আমায় তাদৃশ মহাজন করিয়া দাও, যাহাতে ব্যবসায় করিয়া কখনই ক্ষতিগ্রস্ত না হই। আমি যাহা বলি, যাহা করি, সে সকলই তোমারই শক্তিতে; যাহা অর্পণ করি, সে সমস্ত তোমারই বস্তু। এখন শেষ প্রার্থনা, আমাকে তুমি তোমার করিয়া লও, আমার আমিত্ব

ঘুচিয়া যাক্। তুমি বরদ, তুমি দয়া করিলে কাঙ্গালসন্তানের যে কোনও প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে পার। যদি মনে কর, এখনও আমি তোমার দয়া-প্রাপ্তির যোগ্য হই নাই, বেশ কথা, বুঝাইয়া দাও, কি করিলে তাহা হইব, কত দিনে হইব,—আমি তাহাই করি। এ জীবনে কেন, আমি জনমে জনমে তোমাকে ডাকিব, আর চরণে এইরূপ অশ্রুবিন্দু উপহার দিব, দেখিব তোমার দয়া হয় কিনা।

আমার যাওয়া আসা শেষ হয় নাই, তুমিও চিরদিন আছ, সুতরাং একজীবনে তোমার করুণা না পাই, দুঃখ নাই। আশা আছে, ডাকিতে পারিলে অবশ্যই কোনও জনমে তোমার করুণা নিশ্চয়ই পাইব। তবে আমার এ প্রার্থনা প্রভো! এই মতি দিও, যেন জনমে জনমে তোমায় ডাকিবার শক্তি হয়। মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত অতিক্রম করে, কালে দুঃসাধ্য কর্ম্মও সাধন করে, আমিও যেন দেব! জীবন পেয়ে, মন তোমার চরণে দিয়া রাখিতে পারি। আমার এই প্রার্থনা টুকু পূর্ণ করিও। রাশি রাশি সম্পদের বিনিময়ে তুমি আমায় রাশি রাশি বিপদ্ এনে দিও, তাতে আমি কাতর নহি, কিন্তু প্রভো! সেই বিপদ্‌ই সম্পদ্ মনে করি, যে তোমায় স্মরণ করাইয়া দেয়। আর একটা কথা, হরি হে! তোমায় যে স্মরণ করে, তার আর বিপদ্‌ই বা কি? জগদ্‌জাঁতার মধ্যবর্ত্তী শঙ্কুতুল্য তুমি, তোমায় অন্ধ চক্ষু দেখিতে পায় না, তাই অগণ্য প্রাণ তাহাতে নিষ্পেষিত হইয়া যায়, কিন্তু যে তোমায় আশ্রয় করে, সে আর কখনই নিষ্পেষিত হয় না। প্রবলস্রোতোজলে করিবর ভাসিয়া যায়, কিন্তু মৎস্য উজান বহিয়া যায়। তাই বলি, যে যাহাকে আশ্রয় করে, সেত তাকে রক্ষা করে। হায়! প্রাণকৃষ্ণ! আমি কি মূঢ়মতি! আমি যদি একান্তমনে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকতে পারতাম, তাহ'লে আমার অবশ্যই এ দুঃখ-রজনীর অবসান হ'ত। হা প্রাণারাম! হা হৃদয়রঞ্জন! হা করুণানিধে! হা দীনবন্ধো! আমাকে তোমায় দান কর্‌লাম। তুমি আমাকে 'তোমার' ব'লে গ্রহণ কর—আমি কৃতার্থ হই।

শ্রী——

সংবাদ ও মন্তব্য।

নূতন সুসংবাদ। বঙ্গজননীর সুসন্তান মাননীয় লর্ড শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। এ দেশের লোকের পক্ষে 'গবর্ণরি'পদ-প্রাপ্তি বর্ত্তমান দৃষ্টিতে নূতন ব্যাপার। সংবাদ যেমন নূতন, বঙ্গবাসীর পক্ষে তেমন আনন্দেরও বটে। ভগবৎকৃপায় মাননীয় লর্ডসিংহ মহোদয় নিরাপদে দেশে ফিরিয়া কার্য্যভার গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া দেশবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

পদোন্নতি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়িভাবে শ্রীরামপুরকলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছেন। এ পদে এ দেশীয়ের নিয়োগ এই প্রথম। সুখের কথা।

প্রধান সেনাপতি। প্রথিতনামা জেনারল রলিন্সন মহোদয় ভারতের প্রধানসেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পরিচালন-গুণে ভারতের সৈনিক-বিভাগের সমুন্নয়ন সংসাধিত হইবে আশা আছে।

নবপ্রথা। ডাকবিভাগের নূতন নিয়ম অনুসারে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আনরেজিষ্টার্ড ভিঃ পিঃ চলিতে পারিবে না। সমস্ত ভিঃ পিঃই রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। আশা করি, হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক মহোদয়গণ স্বীয় ২ দেয় মূল্য মণিঅর্ডার-যোগে প্রেরণ করিয়া, রেজেষ্ট্রীব্যয় ৵০ এড়াইতে চেষ্টা করিবেন॥

'বহুরূপ' তারা-পর্য্যবেক্ষণের বিবর

জুলাই, ১৯২০ খৃঃ অঃ।

অবস্থান।	বহুরূপ তারার নাম।				পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।
০২১৪০৩	তিমি	রাশির	O.	তারা	২৫১৫	৩·৬
১০৩৭৬৯	সপ্তর্ষি	,,	R.	,,	০৫০৮	১১·০ অপেক্ষা ছোট।

বহুরূপ তারার অবস্থান।	নাম।				পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়।	আপেক্ষিক স্থূলত্ব।
১২৩১৬০	সপ্তর্ষি	রাশির	T.	তারা	০৪১০	৯·২
,,	,,	,,	,,	,,	১০১০	৮·৫
,,	,,	,,	,,	,,	১৫১০	৮·৩
,,	,,	,,	,,	,,	২০০৮	৮·৩
১২৩৪৫৯	,,	,,	RS.	,,	০৪১০	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
১২৩৯৬১	,,	,,	S.	,,	০৪১০	৯·২
,,	,,	,,	,,	,,	১৫১০	৯·৪
১৩২৪২২	হ্রদসর্প	,,	R.	,,	০৩০৮	৭·৮
১৫১৫২০	তুলা	,,	S.	,,	০৪০৮	১১·৫
১৫১৭৩১	কিরীট	,,	S.	,,	০৪১১	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
১৫৪৪২৮	,,	,,	R.	,,	০৪০৮	৬·৫
,,	,,	,,	,,	,,	০৭১০	৬·৬
,,	,,	,,	,,	,,	১৫১০	৬·৫
১৬৩১৩৭	হরকুলেশ	,,	W.	,,	০৮১১	১১·০ অপেক্ষা ছোট।
১৬৩২৬৬	তক্ষক	,,	R.	,,	০৫০৯	১০·৪
১৭০২১৫	সর্পধারী	,,	R.	,,	০৪০৯	৯·১
,,	,,	,,	,,	,,	১১০৯	৯·৩
১৭৫৫১৯	হরকুলেশ	,,	RY.	,,	০৭০৯	১১·৭ অপেক্ষা ছোট।
১৮০৫৩১	,,	,,	T.	,,	০৭০৯	৮·১
,,	,,	,,	,,	,,	২০০৮	৭·৬
১৮৪২০৫	গরুড়	,,	R.	,,	০৮১০	৬·৮
,,	,,	,,	,,	,,	১১১০	৬·৯
১৮৪৩০০	,,	,,	নূতন	,,	০৭১০	৮·৪
,,	,,	,,	,,	,,	১১১০	৮·৬
,,	,,	,,	,,	,,	২০০৯	৮·৬
১৯৩৪৪৯	বক	,,	R.	,,	০৫১০	১১·৮ অপেক্ষা ছোট।
১৯৪০৪৮	,,	,,	RT.	,,	০৫১০	৭·৩
,,	,,	,,	,,	,,	২৩০৮	৭·১
১৯৪৬৭২	বক	,,	Chi.	,,	০৪১০	৫·২
২০০৯৩৮	,,	,,	RS.	,,	০৭১০	৮·২
২০১৪৩৭	,,	,,	P.	,,	০৭১০	৫·০
২০৩৮৪৭	,,	,,	V.	,,	০৪১০	১০·৪
২০৪৪০৫	কুম্ভ	,,	T.	,,	০৭১১	১০·৮
২১০৮৬৮	শেফালী	,,	T.	,,	০৪১১	৯·০
২১৩৮৪৩	বক	,,	SS.	,,	০৪১১	১০·৮
,,	,,	,,	,,	,,	১০১০	১১·৪
,,	,,	,,	,,	,,	২৫১০	১২·০
২৩৩৩৩৫	[illegible]	,,	ST.	,,	০৮১২	১০·[illegible]

সাঙ্কেতিক অঙ্ক গুলির ব্যাখ্যা :—

নক্ষত্রূপ তারার অবস্থান, ০২১৪০৩= তারাটীর বিষুবাংশ ২ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ও ক্রান্ত্যংশ ৩ ডিগ্রী উত্তর (Right Ascension 2 hours 14 minutes and declination 3 degrees north of the Equator.

নক্ষত্রূপ তারার নাম, তিমি রাশির O. তারা=তারাটী তিমি-রাশির একটী তারা এবং তারাচিত্রে (Map of the sky) ইংরাজী O. অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত, উহার ইংরাজী নাম O. Ceti. যে তারার অবস্থানের নিম্নে রেখাযুক্ত তাহার ক্রান্ত্যংশ বা Declination দক্ষিণ অর্থাৎ তারাটী বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত বুঝিতে হইবে। এই সঙ্কেত অবলম্বনে এবং তারাচিত্রের সাহায্যে আকাশে তারাটীকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়।

পর্য্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়, ২৫১৫ = জুলাইমাসের ২৫শে তারিখে রাত্রি ৩ ঘটিকার (১৫-১২ = ৩) সময়ে তারাটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এই সাঙ্কেতিক অঙ্ক যদি ০৫২০ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে জুলাই মাসের ৫ই তারিখে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে তারাটী পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এইরূপ অঙ্ক যদি ১০১০ হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ১০ই জুলাই রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে তারাটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে একদিনের দিবা মধ্যাহ্ন হইতে পরের দিনের দিবা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত একদিন ধরা হয়, এবং এই সময় ০০ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়। দিবা মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন কোন স্থানের দর্শকের মস্তকোপরি—মধ্যরেখায়—উপনীত হয়, তখন সেই স্থানের সময়ের ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হয়। ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হইলেই ০০ ঘণ্টা গণনা করা হয়, তৎপরে প্রতি সেকেণ্ড, মিনিট ও ঘণ্টা গণনা করা হয়। কার্য্যের সুবিধার জন্য আমরা পাশ্চাত্যপ্রথায় ২৪ ঘণ্টার হিসাবে সময় নির্দ্দেশ করিতেছি, কিন্তু উহা কলিকাতার সময় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আপেক্ষিক স্ফুটত্ব, ৩'৬=পর্য্যবেক্ষণকালে তারাটী তৃতীয়শ্রেণীর তারা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল এবং চতুর্থ শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা হইতে দশভাগের চারিভাগ বেশী উজ্জ্বল ছিল, অতএব উহার উজ্জ্বলতা ৩'৬।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টরীকৃত

হিন্দু-পত্রিকা।

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩২৭ সাল। ১৮৪২ শকাব্দ।

বঙ্গভাষা।

(কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলায় এম্ এ পরীক্ষা উপলক্ষে।)

১। ভাষা আমার! আশা আমার! আজি মা! প্রেভা প্রভাতীর,
করিছে দীপ্ত সুপ্ত চিত্ত সকল বঙ্গনিবাসীর।
ভাষার পূজায় তোমার অর্ঘ্য দেব আশুতোষ করিল স্থির,
পাইলে তোমার যোগ্য-স্থান অঙ্কে বিশ্বভারতীর।
জ্ঞানের মন্দিরে তোমার আসন হেরিয়া সবার উচ্চ শির,
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা! অর্দ্ধশতাব্দীর।
ভাষা আমার! আশা আমার! সৃজিল তীর্থ গোমুখীর,
নূতন সাধনে, সে রামমোহন, গুপ্ত কবীশ, যুগ্মবীর।
মধুর কাব্য, দীনের হাস্য, মাধুরী বঙ্কিম-লেখনীর,
পুণ্য মিলনে হইয়া যুক্ত, হইল তোমার প্রয়াগ-তীর।
জ্ঞানের মন্দিরে তোমার আসন হেরিয়া সবার উচ্চ শির,
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা! অর্দ্ধশতাব্দীর।

৩। ভাষা আমার! আশা আমার! বাণীর পুত্র সাহিত্যবীর,
বিবিধ ছন্দে করিছে গান, গরিমা তোমার ত্রিদিবশ্রীর।
রবির কিরণে, জ্যোতি তোমার শোভিছে, অঙ্গে, পৃথিবীর,
শরণে তোমার, শিখাবে জগৎ নূতন তত্ত্ব প্রকৃতির।
জ্ঞানের মন্দিরে তোমার আসন হেরিয়া, সবার উচ্চ শির,
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা! অর্দ্ধশতাব্দীর।

৪। ভাষা আমার! আশা আমার! যাচিব আশীষ ভারতীর,
তোমার চরণ রহুক শীর্ষে, সকল বঙ্গ-পুরুষ-স্ত্রীর;
সাজাতে তোমায় করিবে গ্রহণ ভূষণ যথায় ধরিত্রীর,
হইবে জননী পূর্ণচন্দ্র, মানবভাষা-মণ্ডলীর।
জ্ঞানের মন্দিরে, তোমার আসন হেরিয়া সবার উচ্চশির,
হইল মুক্ত রুদ্ধ দ্বার, আজি মা! অর্দ্ধশতাব্দীর।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।

দুর্ব্বলতাই পাপ।

দুর্ব্বলতা পাপের জননী। দুর্ব্বল হৃদয়, পাপপ্রলোভন হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম। দুর্ব্বলহৃদয়ে সার্ব্বজনীন উদারভাবের মলয়-মারুত বহে না, সেথা স্বার্থের পূতিগন্ধ। দুর্ব্বল শরীর রোগপ্রবণ, রোগবীজ সে শরীরে প্রবেশ করিয়া সহজে স্বীয় প্রভাব-বিস্তারে সক্ষম হয়, কিন্তু সবল দেহে রোগবীজ প্রবেশ করিলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বল মনে জাগতিক প্রলোভন প্রবেশপূর্ব্বক বুদ্ধিকে সহজে বিধ্বস্ত করিয়া সমূহ অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয়; অন্যপক্ষে সবল মনে নানা প্রলোভন প্রবেশ করিলেও—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

রমণীর কমনীয় দেহের রূপলাবণ্য-দর্শনে তুমি হতচেতন ও ভোগ-লালসায় বিগতবুদ্ধি, সে দোষ রমণীর না তোমার? তোমার মনে দুর্ব্বলতাজাত

লালসাবহ্নি জ্বলিতেছে, সে বহ্নির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া, তুমি নিজেকে এমনি গঠিত করিয়াছ যে, তদ্ব্যতীত তোমার দ্বিতীয় গতি নাই। তুমিই আবার রমণীকে "নরকস্য দ্বারং" বলিয়া অভিহিত করিতেছ! তাতে যে তোমার অধিকতর দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইতেছে। দুর্ব্বলতা-প্রযুক্তই তুমি রমণীকে ভোগের জিনিসমাত্র মনে করিয়াছ, আর তদ্ধেতুই তাকে 'নরকের দ্বার' বলিয়া তৃপ্তি পাইতেছ। হে দুর্ব্বলহৃদয় নর! নারী কি তোমার জননী নয়? তার সঙ্গে মাতৃভাবই তোমার সর্ব্বপ্রথম ও আত্মবিস্মৃতির ভাব নহে কি? সে পবিত্র জীবনপ্রদ ভাবকে কেন বড় করিয়া তুলিতে পার নাই? কারণ তোমার ক্ষুদ্রত্ব—দুর্ব্বলতা। তোমার মনের মধ্যে যেই পাপপ্রবৃত্তি জন্মিল, অমনি "কামিনী নরকের দ্বার।" রমণীর লাবণ্য—সৌন্দর্য্যসুষমা কি তার পাপ? একই রমণীকে দর্শন করিয়া, হয়ত অপর এক হৃদয়ে মাতৃভাবের উদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত হইতেছে! বল দোষী কে? তুমি তাঁকে যেমন ভাবিয়াছ, তিনি তোমার নিকট তেমনি হইয়াছেন। অগ্নিদ্বারা জগতের কত উপকার সাধিত হইতেছে, কিন্তু যদি কোন খলব্যক্তি অপরের গৃহদাহের জন্য সেই অগ্নির প্রয়োগ করে, তবে তজ্জন্য কি অগ্নি দায়ী? তবেই দেখ্‌ছি, দোষ বস্তুর অপব্যবহারে। অপব্যবহার মানসিক দুর্ব্বলতা-প্রসূত। রমণীর স্কন্ধে সকল দোষের ভার আরোপ করিয়া, শুধু যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছ, তাহা নহে, সত্যেরও অপলাপ করিতেছ। নিজের অক্ষমতায় কর্ত্তব্য-দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছ। এখন সবলতাকে বরণ কর—নারীতে মাতৃত্ব স্থাপন কর পাপ দূর হবে। তুমি দেবজীবন লাভ কর, তিনি দেবী হবেন। আগে দুর্ব্বলতা এনে হীনতা এনেছ, পরকে গালি দিচ্ছ। অপরকে গালি দেওয়ায় মনের অসূয়াবৃত্তির ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু তাতে শ্রেয় নাই। দুর্ব্বলতাকে ত্যাগ কর, তোমাকে "হীন' করে জগতে এমন কেহ নাই। ওহে শোকতাপক্লিষ্ট বন্ধু আমার, কেন তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ও তপ্তঅশ্রু-ত্যাগ দ্বারা জীবন-ক্ষয় করিতেছ? এ তোমার দুর্ব্বলতা নয় কি? ওহে পাপতাপে জীর্ণহৃদয় ভাই! তুমি তোমার কদর্য্য অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, এ তোমার দুর্ব্বলতা। তুমি যে "পারি না—পারি না" বলিতেছ, এটীও তোমার Self imposed দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বলতা দ্বারা তোমার নিত্য সত্তাকে অস্বীকার করিতেছ; আত্মহনন করিতেছ। অতএব উঠ, দুর্ব্বলতাকে ত্যাগ কর। ভাই আমার, কেন আপনা ভুলে দুঃখ পাচ্ছ? যতশীঘ্র পার, তাড়াও তোমার প্রাণমনক্ষয়কারী

দুর্ব্বলতা যক্ষকে। দেখিবে, তুমি অচিরাৎ অসীম আনন্দের অধিকারী হবে। God has made you after Him. এমন যে তুমি, তোমার এতুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে? তুমি। তুমি যেমন তোমাকে ভাবিয়াছ, তেমনই হইয়াছ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি দৈনন্দিন—সকল জীবনেই দুর্ব্বলতা আমাদের শ্রেয়োলাভের অন্তরায়। দুর্ব্বলতা-রাক্ষসী আমাদিগের হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া, আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে। আমরা কত কথা বলি, কত শাস্ত্র-বচন আবৃত্তি করি, কিন্তু বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আনিতে অসমর্থ। ক্ষুদ্র স্বার্থপুষ্টির জন্য নিজের বা অপরের সর্ব্বনাশকারী প্রলোভনেও বাধা দিতে সাহসী হইনা। এসব দুর্ব্বলতাজাত নহে কি? একজন তথাকথিত হীনজাতীয় ব্যক্তি যদি বিদ্যা-অর্জ্জনে অগ্রসর হয়, অমনি আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে অসূয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে নানাপ্রকারে বাধা দিই। আমরা এমনি বুদ্ধিহীন যে, সামান্য স্বার্থনাশ ভয়ে মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে ইতস্ততঃ করি না। আরও ভয়ানক এই যে, আমাদের পাপপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত কার্য্যকে শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করি, নিজের মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দশজনের সর্ব্বনাশের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিই। এবাধা দেওয়ার কারণ কোথায়? যখন নিজে উন্নত হইতে পারিব না, তখন অপর এক চিরঘৃণিত অজ্ঞাত ব্যক্তি উন্নতিলাভ দ্বারা সমকক্ষ হইবে বা অতিক্রম করিবে, অথবা চিরসেবিত Priviledge হইতে বঞ্চিত করিবে—এই আশঙ্কা। সর্ব্বপ্রকার ভীতি দুর্ব্বলতাজাত। ইহাই আমাদিগকে শ্রেয় হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। রাজনৈতিকজীবনেও এই মানসিক দুর্ব্বলতা পদে পদে দৃষ্ট হয়। কাহারও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইব—এই ক্ষুদ্রস্বার্থ-বুদ্ধিজাত ভীতিই আমাদিগকে মঙ্গলপথ হইতে চ্যুত করিতেছে।

ধর্ম্মজীবনেও দুর্ব্বলতা প্রতিপদে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। আমরা আমাদের পুত্রকন্যাকে সুখী ও সদ্‌গুণমণ্ডিত দেখিতে সর্ব্বদা উৎসুক, অথচ যদি কোন সন্তান বিপথগামী হয়, তাতে উদ্বিগ্ন হই না, কিন্তু সন্তানকে ধর্ম্মজীবন-লাভে সচেষ্ট দেখিলে মর্ম্মস্থলে ছুরিকা-বেধবৎ যাতনা উদ্বেগে অস্থির হইয়া পড়ি। নিজে হয়ত কত মহাপুরুষের মহামূল্য বাক্য আবৃত্তি দ্বারা লোকসমাজে নিজশ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে সচেষ্ট, হয়ত ধর্ম্মের মীমাংসা

বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেই ধর্ম্মজীবন-লাভ হয়েছে, এই বোধে তৃপ্ত. (অনুভূতিশূন্য বুদ্ধির গ্রহণ যে ছায়া মাত্র) কিন্তু আত্মজীবনের নিভৃত স্থানে, যেখানে অপরের গমনাগমন নাই, সেখানে সমস্তস্থান কুচিন্তা স্বার্থপরতা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পৈশাচিক বৃত্তিতে পরিপূর্ণ রেখে, সব চেয়ে অকেজো-স্থানে কচিৎ ভগবানের জন্য একটু স্থান দিই ! যে একটু স্থান দিই, তাও ক্ষুদ্রস্বার্থ পূর্ণ হবে—এই আশায় ! যেন তাঁর দ্বারা আমার স্বার্থসিদ্ধির কাজ-গুলি করিয়ে নিতে চাই ! যেটুকু তাঁকে ডাকি, সে সময়টুকু বলি,—"এটী দাও ওটী দাও ; এ নাহ'লে আমার চল্‌বে না—অমুকের এই সর্ব্বনাশটী করে দাও তাহ'লে আমি তোমাকে আর একটু ডাক্‌বো—ভাববো বুঝ্‌বো, তুমি দয়াল, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, নচেৎ বুঝ্‌বো, তুমি নাই—আর থাকিলেও তুমি বড় অবিচারী।" অহো কি ভীষণ দুরবস্থা ! একখণ্ড জমি পাওয়ার প্রতি যে মমতা, তদ্‌রক্ষণে যে চেষ্টা, ভগবান্ বা অনন্তজীবন-লাভে সে চেষ্টাটুকুও নাই, অথবা শক্তি নাই। আরও আমাদের অবস্থার ভীষণতা দেখুন, এরূপ অনেকে আছেন, যাঁরা লোকের গলদেশে দ্বিধাশূন্য ভাবে ছুরিকা-চালনা দ্বারা, নানা উৎপীড়ন, অমানুষিক অত্যাচার ও বীভৎস পৈশাচিকতার সহায়ে অর্থ সংগ্রহ করে সংসরান্তে একবার কোন পূজা দিয়ে, দিনান্তে একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, (হয়ত সে সময় কত কুচিন্তা মনে বর্ত্তমান !) মন কুচিন্তাপূর্ণ রেখে, মুখে ভগবানের নাম নিয়ে, তাঁর দোহাই দিয়ে, অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষাক পরিধান করে মনে করেন—"স্বর্গরাজ্যের ছাড়পত্র পেয়েছি। আমি অমুক দেবতাকে বা ভগবান্‌কে এমন চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছি যে, আমার সকল পাপ ত ক্ষালিত হবেই, পরন্তু স্বর্গে আমার জন্য একটী দাসদাসীসমন্বিত অট্টালিকা ও অত্যাচার করিবার উপযুক্ত প্রজাবর্গ-যুক্ত জমিদারীর ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে।" এই ভরসায় দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলে। একবারও ভাবিয়া দেখেন না, মন কত প্রশস্ত হ'ল। হৃদয়ের দিকে তাকাইতে সময়ও হয় না, প্রবৃত্তিও থাকে না, সাহসেও কুলায় না। মানসিক-দুর্ব্বলতা-হেতু আমরা ক্ষুদ্রস্বার্থে এমনই আসক্তচিত্ত, যে, তার অচলায়তনের বাহিরে গিয়া, প্রকৃত স্বার্থ কি, তাহা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে চমকিয়া উঠি। আমরা কতকগুলি স্বার্থবুদ্ধির দাস মাত্র হয়ে পড়েছি। ধর্ম্ম যাহা অনন্তজীবনলাভের উপায়, তাকেও বৈষয়িক-লাভের মাপকাটী দিয়া মাপিয়া থাকি। ভাবি, ধর্ম্মজীবন-যাপনে কতটুকু অর্থ মান যশ বা প্রতিপত্তি আসিবে ! যদি না হয়, তবে ভাবি, ধর্ম্মজীবন মস্ত ভুল—একটী

দাগাবাজী। কেহ ধর্ম্মজীবনলাভের চেষ্টা করিতে বলিলে ব'লি—"ওটা একটা ঐন্দ্রজালিকক্রিয়া।" হায় মানব, তুমি পাপপ্রবৃত্তির—স্বার্থবুদ্ধির ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়ে সর্ব্বত্র বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বিভীষিকা দেখিতেছ! কেহ তোমাকে সে ইন্দ্রজাল-প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে আসিলে, তুমি, ভূতগ্রস্ত রোগীর মত চীৎকার করিতেছ! কেহ ভাবেন—ধর্ম্মজীবন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, উহার সহিত বাস্তব জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই। রোগ আরও ভীষণ! শুধু ঐরূপ ভাবিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি এইরূপ ভাবিতে পারেন বলিয়া নিজে গর্ব্ব অনুভবও করেন এবং এইরূপ মত-প্রকাশ দ্বারা যাদের বৈষয়িক আকর্ষণ কম, যারা একটু ধর্ম্মপিপাসু, তাদের কত লোককে কামনার পূতিগন্ধময় নরকে নিয়ে যান এবং নিজের ও আরও দশজনের সর্ব্বনাশে সুখ অনুভব করেন। যারা স্থূলের দাস, কামকাঞ্চনের দাস, তাদের ভাবার বুদ্ধি কোথায়? তারা ত আত্মাকে অস্বীকার করে চলেছে, তারা আত্মঘাতী। মনের উপর প্রভুত্ব নাই—মনের আমরা হইয়াছি—মন আমাদের নহে, মনের দাস হয়ে পড়েছি! দাসের ভাগ্যে সুখ কোথায়। দাস প্রভুত্ব-জনিত সুখে চিরবঞ্চিত। ক্রীতদাসের মত বিষয়াকর্ষণ যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে দিকে দৌড়াচ্ছি। এসকল দাসসুলভ ভাবের মূল মনের সংস্কার। সংস্কার অর্জ্জন-সাপেক্ষ। যাহা অর্জ্জনযোগ্য, তাহা ত্যাগ করাও যায়। আমাদের ব্যষ্টি বা সমষ্টিজীবনের দুর্ব্বলতা, আমাদের জীবনীশক্তির হ্রাসই প্রমাণ করছে। আমাদের চরিত্র গঠিত হয় নাই। সকল ক্ষেত্রে যে সাহসের বীর্য্যের প্রয়োজন, তা মনে অবস্থিত। মনের দুর্ব্বলতা সকলস্থানে প্রতিফলিত হয়। এই মনের বলই সকল স্থানের শক্তির উৎস। মনের শক্তি থাকিলে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বথা আমরা শ্রেয়ের সেবক হইতে পারি। সর্ব্বাগ্রে মানসিক-বল-সঞ্চয় প্রয়োজন, তজ্জন্য চাই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি চিত্ত-সংযমে—সাধনাপূত আধ্যাত্মিক জীবনলাভে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের দুর্ব্বলতার প্রতিকার দুই প্রকারে হ'তে পারে। যেমন শরীরে রোগ উপস্থিত হইলে দুইপ্রকারে তাহা নিরাকৃত হয়—প্রথম-Local treatment বা স্থানীয় চিকিৎসার দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রকৃতিকে শক্তি দিয়া, তার রোগ-নিরাকরণের ক্ষমতা-বর্দ্ধন দ্বারা। প্রথম উপায়ে একস্থানের রোগ নিরাকৃত হইলে পুনরাক্রমের সম্ভাবনা থাকে, দ্বিতীয় উপায়ে রোগ নিরাকৃত হইলে সে ভয় থাকে না। দুটী উপায় একই সময়ে প্রযুক্ত

হইতেও পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য প্রধানতঃ দ্বিতীয় উপায়ের প্রতিই থাকিবে। সকলের মূল কারণ মনকে পরিবর্ত্তিত করাই আমাদের লক্ষ্য—তাই বুদ্ধদেব বলেছেন—

"মনঃপুব্বঙ্গমাধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসাচে পদুট্‌ঠেন ভাষতি বা করোতি বা।
ততো নং দুঃখমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং
মনোপুব্‌বঙ্গমাধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মনসাচে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী"।

মন ধর্ম্মসমূহের পূর্ব্বগামী, মনই শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম মনোময়। যদি কেহ দূষিতান্তঃকরণে কথা কহে বা কার্য্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে। মনই ধর্ম্মসমূহের পূর্ব্বগামী, মনই ধর্ম্মমধ্যে প্রধানপদার্থ, এবং ধর্ম্ম মন হইতেই উৎপন্ন। যদি কেহ নির্ম্মলান্তঃকরণে কথা কহেন কিংবা কার্য্য করেন, তবে সুখ তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, কারণ, বাহিরটা মনের প্রকাশ মাত্র। মন সূক্ষ্ম, বাহ্যস্থূলের জনক। মনের দাসত্ব আগে, পরে বাহিরের দাসত্ব। জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন না হ'লেও মনের পরিবর্ত্তনে জগৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রতিভাত হয়। মন বাহিরকে গঠন করে, মনের ঘনীভূত অবস্থাই বাহির। মনের পরিবর্ত্তন সাধনাপেক্ষ। সাধনা দ্বারাই মানুষ সত্যজ্ঞানলাভে সক্ষম হয়। সাধনাপূত জ্ঞানই প্রকৃত-পথ-নির্দ্দেশে সক্ষম। সাধনা দ্বারা মাত্র জগতের স্থূলের আকর্ষণ কেটে যায়, তখনই মাত্র তার সকল দুর্ব্বলতা ক্ষুদ্রতা নষ্ট হয়, তখনই সে স্বাধীনতাসুখের অধিকারী হয়। তখনই মাত্র সে বল্‌তে পারে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

কিন্তু সে সাধনার অন্তরায় পূর্ব্বসংস্কার ও দুর্ব্বলতা। তাহা অভ্যাস দ্বারা অপনেয়। তাই গীতায় বলেছেন—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

ক্লৈব্যকে নাশ করতে হ'লে, অদ্বৈত ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ও আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে, তাঁর শরণ নিতে হবে। জীবনের ঊর্দ্ধ-গতিই আমাদের মঙ্গল ও স্বাভাবিক পদার্থ, কারণ তাহ'তেই মাত্র আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করি। আত্মবিস্তৃতিই আনন্দ ও জীবন; আত্মসংকোচই দুঃখ ও মৃত্যু। সংকোচ দুর্ব্বলতা-প্রসূত। তাই চাই, দুর্ব্বলতার সমূলে নাশ। অদ্বৈতব্রহ্মের উপলব্ধিতে সকল দুর্ব্বলতার নাশ। অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধির জন্য চাই সাধনা; সাধনাপূত জীবনে প্রকৃত আনন্দ। সাধনা গ্রহণ করতে হ'লে চাই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে অভিযান। আমরা সর্ব্বদা "সুখ সুখ" ব'লে চীৎকার করছি, অথচ সুখের দাসত্ব ছাড়ছি না; আবার বলছি, "দুঃখ"। এ যেন দুই হাত দিয়া জোর ক'রে দুই চোখ বন্ধ ক'রে বলছি, "কোথায় আলো।" যে ভোগা-কাঙ্খায় বুদ্ধি হত, তাতে ভোগলিপ্সার আগ্রহাতিশয্যে সম্ভব হচ্ছে না। রুগ্ন দেহে অধিক আহার যেমন শরীরের মঙ্গলজনক নহে, তেমনি দশা। যাকে ভোগ করতে হবে, তার উপর চাই কর্ত্তৃত্ব। দাসের ভোগ হয়, ভাগ্যে ভোগ হয় না, দুর্ভোগ হয় মাত্র। আমরা কতকগুলি ভাবের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আছি! যেন বুদ্ধিবৃত্তি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য নাই। জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে বাত্যাবিতাড়িত শুষ্কপত্রবৎ অবস্থাচক্রে চালিত হচ্ছি। এখন প্রয়োজন, এই মোহ-পাশমুক্তি Dehýpnotisation. পৈতৃক স্বাধীনতা-লাভ লক্ষ্য, তজ্জন্য সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতাকে দূর করতে হবে—তাকে অস্বীকার করতে হবে। বারবার অস্বীকার করতে করতে সে মোহজাল ছিন্নভিন্ন হবে।

হে অমৃতস্য পুত্র! তুমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরিতেছ! ছাড় তোমার দুর্ব্বলতাকে। হুঙ্কার দিয়ে বল—তুমি অমৃতের সন্তান, তোমার কোন দুর্ব্বলতা নাই, দুঃখ নাই, দৈন্য নাই। পিতার দিকে নজর কর. স্মরণ কর—ye are temples of God. বল "ন মা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং' ॥

তুমি অমৃতের সন্তান, তুমি ইচ্ছা না করিলে তোমাকে কি দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে? তুমি পরমপুরুষের সন্তান, তাঁর সত্তা তোমার মধ্যে বর্ত্ত-মান, তাই তুমি যেমন ভাববে তেমনি হবে—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং। তুমি self hypnotised হয়ে আছ। এখন পিতার কথা স্মরণ কর—ভীমগর্জ্জনে সকল দুর্ব্বলতাকে পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে ফেল। জগতে কেহই এমন নাই যে তোমার পিতৃসিংহাসন-লাভে বাধা দিতে পারে। সব তোমার

তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ভস্মসাৎ হউক্। আত্মাকে আশ্রয় কর, অনন্তজীবনের অধিকারী হবে, নচেৎ দুর্ব্বলতা তোমার সংকোচ আনবে। সংকোচই নিরানন্দ, পরিণামে জড়ত্ব,—মৃত্যু। অতএব যদি বাঁচ্তে চাও, শ্রেয়কে চাও, যদি অনন্তজীবন চাও, তবে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। No God helps those that do not help themselves. তুমি তোমার পিতৃধনলাভে বদ্ধপরিকর হও—এই মর্ত্তে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করে অমৃতের সন্তান যীশুর বাণী সফল কর। এই স্বর্গরাজ্য-স্থাপনই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হউক্। তাই আবার সেই মহাবাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"

এখন এস ভাই, করযোড়ে পিতার নিকট প্রার্থনা করি—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥
ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥।

শ্রীপ্রমথনাথ তত্ত্বনিধি বি এল্।

মকরধ্বজ-পরিচয়।

যাহার অলৌকিকী রোগনাশিনী শক্তি দেখিয়া প্রতীচ্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্তম্ভিত, আর্য্য ঋষিদিগের সেই অলোকসামান্য অভিজ্ঞতার ফল আয়ুর্ব্বেদজলধিরত্ন মকরধ্বজের গুণ আবালবৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই ব্যাধির করালকবল হইতে আত্মস্বজন-রক্ষার্থ স্ব স্ব ভবনে সযতনে মকরধ্বজ রক্ষা করিতেছেন।

দেশে বিদেশে, রাজায় প্রজায়, ধনী দরিদ্রে, গৃহী উদাসীনে, বালে বৃদ্ধে, আজ 'মকরধ্বজ' সমাদৃত। এমন দেব-দুর্লভ পদার্থ বুঝি আর নাই!

একদিকে স্রক্‌চন্দনবনিতাভিলাষী মৎস্যমাংসাশী বিলাসিজনবাঞ্ছিত, অপরদিকে জটাজিনধারী ফলমূলাহারী বনচারী উদাসী সন্ন্যাসিজনকাঙ্ক্ষিত। ধন্য মকরধ্বজ তুমি!

মন্ত্রিণাং মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং বিবিধাশ্চর্য্যকারণম্ ॥

করুণানিধি ভূতভাবন দেবাদিদেব রসরাজ, হীনমতি দোষদেশ-কালানভিজ্ঞ নানাবিধ জটিলসঙ্কটব্যাধিগ্রস্ত কলির মানবদিগের পরিত্রাণার্থ যোগবাহী সর্ব্ব-রোগান্তক রসচিকিৎসার প্রচার করিয়াছেন।

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে ॥

রসচিকিৎসায় দোষের সাম্য, নিরাময়তা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ কাল, ইহাদের কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

যোগবাহী রসোহয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকৃৎ। এই সুবিশুদ্ধ রস (পারদ) যোগবাহী—অর্থাৎ যখন যাহার সহিত মিশিবে, তখন তাহার বলবীর্য্য বর্দ্ধিত করিবে। ইহা অনুপান-ভেদে সর্ব্বরোগনাশক।

রসে কতকগুলি নৈসর্গিক দোষ অবস্থিতি করে। শোধন-জারণ-মারণাদির দ্বারা সেই দোষগুলি অন্তর্হিত হয়। কাচা পারদ অর্থাৎ অপক্করস অত্যন্ত চঞ্চল; উহা সহজে জীর্ণ হয় না, প্রায়শঃ মল-মূত্র-মার্গের দ্বারা বাহির হইয়া যায়। একারণ মারিত ভস্মীভূত রস মকরধ্বজাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সাধারণতঃ মারিত রস চারিপ্রকার।

শ্বেতং পীতং তথা রক্তং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং।
লক্ষণং ভস্মসূতানাং শ্রেষ্ঠং স্যাদ্ উত্তরোত্তরম্ ॥

শ্বেতভস্ম, পীতভস্ম, রক্তভস্ম এবং কৃষ্ণভস্ম এই চতুর্ব্বিধ পারদভস্ম যথাক্রমে উত্তরোত্তর সমধিক গুণপ্রদ। এইরূপ ব্যাখ্যা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অপর সম্প্রদায় বলেন,—অভ্যর্হিতত্বাৎ শ্বেতাদীনাং পূর্ব্বনিপাতনমিতি।" তাঁহাদের মতে কৃষ্ণভস্ম হইতে রক্তভস্মের, রক্তভস্ম হইতে পীতভস্মের, পীতভস্মাপেক্ষা শ্বেতভস্মের গুণ অধিক। এই মতটী নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তান্ত্রিক যোগিপুরুষেরা ঐ শ্বেতভস্মের বলে, সুচিকিৎসকপরিত্যক্ত মুমূর্ষুরোগিদিগকে আরোগ্য করিয়া থাকেন। প্রায়শঃ পারদের শ্বেতভস্ম যোগি-ঋষিদিগের নিকট ব্যতীত দেখা যায় না। যাহা হউক, এ বিষয় আমাদের সময়ান্তরে আলোচনা করিতে বাসনা রহিল। অদ্য আমাদের আলোচ্য মকর-ধ্বজ। অবশ্য সকলেই অবগত আছেন, ভস্মীভূত পারদের মধ্যে "মকরধ্বজ" অন্যতম। এমন দেবদুর্ল্লভ পদার্থ আজ দ্বারে দ্বারে ফেরিওয়ালার মাথায় ফিরিতেছে। অশীতি রাজকীয় রাজমুদ্রা হইতে চতুরাণক পর্য্যন্ত মকরধ্বজের

ভরি আজ বিক্রীত হইতেছে। বরিশালের ফেরিওলাদের।০ চারি আনা ভরি মূল্যের মকরধ্বজ, আর ৪৲, ৮৲, ১৬৲, টাকা ভরির মকরধ্বজের মধ্যে বিশেষ কিছুই পার্থক্য প্রতীত হয় না। আবার ষড়্‌গুণবলিজারিত সিদ্ধমকরধ্বজের সহিত সাধারণ মকরধ্বজের আকৃতিগত কোন বাঁধাবাঁধি প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। একারণ মকরধ্বজ সম্বন্ধে জনসাধারণের হৃদয়ে একটা মহান্ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্রকারের "মকরধ্বজ চিনিবার প্রকৃত উপায়"রূপ ভেদকীট তাহার শিকা কাটিয়া গাহিতেছে ;—

স্বর্ণদলং পলঞ্চৈব রসেন্দ্রস্য পলাষ্টকম্।
রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
কুমারিকারসৈর্ভাব্যং ক্রমাদ্ দিনত্রয়ং পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং সমাদায় পুষ্পারুণরজঃসমম্॥

সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, বিশুদ্ধ পারদ ৬৪ তোলা, একত্র খলে মাড়িতে মাড়িতে যখন স্বর্ণপত্রগুলি পারদে একেবারে বিলীন হইবে, তখন উহার সহিত গন্ধকচূর্ণ ১২৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, ঐ কজ্জলী ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া যথাবিধি বালুকাযন্ত্রে ক্রমবর্দ্ধিতাগ্নিতে তিন দিবস নিরন্তর পাক করিয়া, চতুর্থ দিবস চুল্লীর উপর রাখিয়া দিবে। যখন চুল্লীর সহিত বালুকাযন্ত্রস্থ কূপ সুশীতল হইবে, তখন কূপের ঊর্দ্ধসংলগ্ন পুষ্পের অরুণরেণুসদৃশ যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহারই নাম "মকরধ্বজ।" শাস্ত্রকার মকরধ্বজ-প্রস্তুত-প্রণালীর মধ্যেই সাধারণ রক্তিত-রস হইতে মকরধ্বজের আকৃতিগত মহদ্‌বৈষম্য "পুষ্পারুণরজঃসমম্" বলিয়া বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। উদ্ধৃত প্রমাণবলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, প্রকৃত মকরধ্বজের দানা অতি সূক্ষ্ম, ফুলের রেণুর মত অর্থাৎ ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্র, বর্ণ অরুণ অর্থাৎ ঈষদ্ লোহিতাভ। ইহা বাজারের গোটা গোটা মোটাদানার মকরধ্বজ নহে। ইহা বাজারের টকটকে সুলোহিত সিন্দুরের মত নয়নরঞ্জন রক্তিতরস নহে। ইহা প্রকৃত মকরধ্বজ।

পাঠক মহোদয়গণ! আপনারা প্রকৃত মকরধ্বজের উক্ত আকৃতিগত প্রত্যক্ষ লক্ষণ দুইটার দ্বারা এইক্ষণ অনায়াসে মকরধ্বজ চিনিয়া লইতে পারিবেন। চিরদিন ঝুটা মুক্তা দেখিয়া, হঠাৎ সাচ্চা মুক্তা দেখিলে, যেমন অজ্ঞের কাছে সাচ্চাটি ঝুটা বলিয়া প্রতীত হয়, আজ প্রকৃত মকরধ্বজের

সেই দশা। প্রকৃত মকরধ্বজ বর্ত্তমান সময়ে সুদুর্লভ। প্রায় সকলেই ৮ হইতে ১২ ঘণ্টায়, অত্যূর্দ্ধ ২৪ ঘণ্টায় মকরধ্বজের পাককার্য্য সমাধা করিতেছেন। তিন অহোরাত্র নিরন্তর জ্বালে প্রস্তুত প্রকৃত মকরধ্বজ অতিবিরল! দুই চারি জন সুচিকিৎসকের রসশালায় প্রকৃত মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মকরধ্বজ এরূপ হাটে বাজারে সস্তাদরে বিক্রীত হয় না।

বর্ত্তমানসময়ে "মকরধ্বজ"-নামধারী যে সব রঞ্জিতরস বাজারে বিক্রীত হইতেছে, উহার অধিকাংশ হইতে পারা বাহির করা যাইতে পারে। হিঙ্গুলে আর উল্লিখিত রঞ্জিতরসে গুণের বড় প্রভেদ নাই। খুব সম্ভব, উক্ত মকরধ্বজরূপী রঞ্জিতরস গুলি, সুবিশুদ্ধ-পারদ-গন্ধক-সংমিশ্রণে উৎপাদিত নহে! যদি বস্তুতই উহা সুবিশুদ্ধরসগন্ধকের দ্বারা প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিঙ্গুলাপেক্ষাও উহা নিকৃষ্ট। অবিশুদ্ধ রস বড় ভীষণ জিনিষ! উহা সেবন করিলে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে!

"শুদ্ধোঽয়মমৃতং সাক্ষাদ্দোষযুক্তোরসো বিষম্॥

এই রস সুবিশুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ, দোষযুক্ত থাকিলে, বিষবৎ অনিষ্টকারী। সাধারণতঃ কতকগুলি নৈসর্গিক দোষ রসে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে প্রধান দোষ আটটী—

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি এবং অসহ্যাগ্নি নামক আটটী দোষ পারদে আছে। উক্ত দোষদুষ্ট পারদ ব্যবহার করিলে যথাক্রমে দেহীর আটটী রোগ জন্মে—

ব্রণং কুষ্ঠং তথা মূর্চ্ছাং দাহং বীর্য্যস্য নাশনম্।
মরণং জড়তাং স্ফোটং কুর্ব্বন্ত্যেতে ক্রমান্নৃণাম্॥

নাগদোষে ব্রণ, বঙ্গদোষে কুষ্ঠ, মলদোষে মূর্চ্ছা, বহ্নিদোষে দাহ, চাঞ্চল্যদোষে বীর্য্যনাশ, বিষ-দোষে মরণ, গিরিদোষে জড়তা এবং অসহ্যাগ্নিদোষে স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সপ্তকঞ্চুকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ পারদে পরিলক্ষিত হয়। অতএব অবিশুদ্ধ পারদ কখনই ঔষধে ব্যবহার করিতে নাই।

দোষহীনো যদা সূতস্তদামৃত্যুজ্বরাপহঃ।

দোষমুক্ত পারদ জরামৃত্যু-নাশক বলিয়া জানিবে। পাঠক মহোদয়গণ! এইক্ষণ আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঐ সব গোটা গোটা মোটা-

দানার সুলোহিত মকরধ্বজরূপী রঞ্জিতরসগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন কি? ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজকে হতরস এবং শতগুণবলি দ্বারা অন্তর্ধূমে মারিত নিম্নোক্ত মৃতরসকে সিদ্ধমকরধ্বজ বলা যাইতে পারে।

পর পর তন্ত্রের প্রমাণগুলি বিশেষ প্রণিধানের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, হত ও মৃতরসে বিলক্ষণ ভেদ পরিলক্ষিত হইবে, সুতরাং মৃতরস এবং হতরস পরস্পর গুণকার্য্যতঃ স্বতন্ত্র বস্তু। আমরা যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিদর্শনে জীবিতসত্তা উপলব্ধি করিয়া মৃতামৃতের পরস্পর ভেদ অনায়াসে বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ হত ও মৃত এই উভয়বিধ রসের কতিপয় সূক্ষ্মলক্ষণ-দৃষ্টে ভেদজ্ঞান সহজেই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত মৃতরস দুষ্প্রাপ্য। রস শতগুণবলির দ্বারা অন্তর্ধূমে যথাবিধি জারিত মারিত হইলে, প্রকৃত মৃত হইয়া থাকে। "জরামরণদারিদ্র্য-রোগনাশকরোমৃতঃ"।

সাম্প্রদায়িক-ভেদে উক্ত মৃতরস সিদ্ধমকরধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি আমাদের দেশে সুচিকিৎসক মহলে ত্রিবিধ মকরধ্বজ ব্যবহৃত হইতেছে। ১। মকরধ্বজ, ২। ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ, ৩। সিদ্ধ মকরধ্বজ। তিন অহোরাত্র নিরন্তর জ্বালে পারদ হত হয়, এ কারণ সাধারণতঃ মকরধ্বজকে হতরস বলা যাইতে পারে। যাবতীয় তন্ত্রের রসরঞ্জনাধিকারের প্রমাণগুলি দৃষ্টে অনুমিত হয়—অন্যূন তিনদিবস নিরন্তর পাক না করিলে, পারদ হত অর্থাৎ ভস্মীভূত হয় না। তন্ত্রের রসরঞ্জনাধিকারটী বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পর্য্যালোচন করিলে, দেখা যায়, তিন অহোরাত্রের ন্যূনকাল-পাক-নিষ্পন্ন পারদ ভস্মীভূত রস বলিয়া সমাদৃত নহে।

ক্রমাগ্নিনাত্রীণিদিনানি পক্কা তাং বালুকাযন্ত্রগতাং ততঃস্যাৎ।

বন্ধূকপুষ্পারুণমীশজস্তুভস্মপ্রয়োজ্যং সকলাময়েষু—॥

ক্রমবর্দ্ধিত অগ্নির দ্বারা তিন দিন নিরন্তর পাক করিলে যে বাঁধুলীপুষ্পের ন্যায় অরুণ সূতভস্ম প্রস্তুত হইবে, উহা সমস্ত রোগে প্রয়োজ্য। মহামতি তান্ত্রিকচূড়ামণি—ভুণ্টুভনাথ স্বীয় রসেন্দ্রচিন্তামণি-গ্রন্থে রসরঞ্জনাধিকারোক্ত ঔষধগুলি তিনদিনের ন্যূনকালপাকনিষ্পত্তিহেতু রঞ্জিতরস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রায়শঃ প্রমাণগুলিতে দেখা যায়—২। ১ দিনের পাকোৎপন্ন রঞ্জিত-রস সূতভস্ম বলিয়া লিখিত হয় নাই।

যাবতীয় রঞ্জিতরসের প্রস্তুতপ্রণালীর প্রমাণ গুলি দৃষ্টে ২। ১ দিনের

পাকে রস ভস্মীভূত হয় না, এ বিষয়ে—সকলেই নিঃসন্দেহ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণতঃ মকরধ্বজকে "হতরস" বলিয়া ব্যাখা করিব। হতরসের গুণও অপার; ইহা জরা (বার্দ্ধক্য) ও যাবতীয় ব্যাধির নাশক।

তন্ত্র গাহিতেছেন—

হতো হন্তি জরাব্যাধিং, মূর্চ্ছিতো ব্যাধিঘাতকঃ।
বদ্ধঃ খেচরতাং ধত্তে, কোঽন্যঃ সূতাৎ কৃপাকরঃ॥

হতরস অর্থাৎ মকরধ্বজাদি রঞ্জিতরস, জরা ও ব্যাধি-বিনাশক।
মূর্চ্ছিত হিঙ্গুলাদি রঞ্জিতরস কজ্জলী প্রভৃতি ব্যাধিমাত্রনাশক।
বদ্ধরস অর্থাৎ অভ্রাদিযোগসাধ্য কৃষ্ণভস্মাদি বদ্ধরস বিমানগতি-প্রদ।

এমন দয়ালু পারদ ব্যতীত এ জগতে আর কে আছে? পারদের মতন সর্বহিতৈষী এমন দেব-দুর্লভ পদার্থ আর নাই। যাহার প্রসাদে মানব অমরত্বলাভে সমর্থ। মানুষ রোগ, শোক, পাপ, দুঃখ, দারিদ্র্যাদি রিপুবর্গকে জয় করিয়া অজর অমররূপে সুখে কালযাপনে সক্ষম হয় রস-প্রভাবে। এমন রস-রসাস্বাদনে কার বা রসনা রসিত না হয়? ঐ শুন আকর্ণ মেঘদুন্দভি-নিনাদে গাহিতেছেন—

"জরামরণদারিদ্র্যরোগনাশকরোমৃতঃ॥

পারদ সম্যক মৃত হইলে, জরা, (বার্দ্ধক্য) মৃত্যু, (দেহান্তর) দারিদ্র্য এবং যাবতীয় ব্যাধি বিনাশ করিয়া থাকে।

এই মৃত, হত, বদ্ধ ও মূর্চ্ছিত রস সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, সময়ে সমালোচনার আশা রহিল। পারদ সহজে জীর্ণ (হজম) হয় না। কাঁচা পারদ সেবন করিলে মল-মূত্র-রোম-কূপাদি-মার্গে অবিলম্বে বাহির হইয়া যায়, একারণ মৃত পারদ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। পারদ যেরূপ স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহাতে মূর্চ্ছিতরস ক্ষণকাল মধ্যে দেহে প্রবেশ মাত্র অম্লযানবায়ু-সংসর্গে উষ্ম:যাগে প্রকৃতাপন্ন হইয়া অচিরাৎ বাহির হইয়া যায়। মৃতকল্প হতরসও সম্যক্ জীর্ণ হয় না। একারণ হতরস অমরত্ব-প্রদানে অসমর্থ। বীর্য্যনাশকর পদার্থ কখনও অমরত্ব দান করিতে পারে না। মৃত না হইলে পারদের চাঞ্চল্যদোষ অন্তর্হিত হয় না। পারদের চাঞ্চল্য-দোষ বীর্য্যনাশ-কারী, একারণ মকরধ্বজাদি হতরস জরাব্যাধিনাশক, কিন্তু মৃত্যুনাশক অর্থাৎ অমরত্বপ্রদ নহে। "হতো হন্তি জরাব্যাধিম্" ষড়্গুণবলিজারিত না হইলে

পারদে রোগনাশিনী শক্তি জন্মে না, একারণ—"ষড়্গুণবলিজারিত" স্বতন্ত্র একরূপ "মকরধ্বজ" বলা যায় না।

বর্ত্তমান বাজারের "মকরধ্বজ" বা মোটাদানার রস্তিতরস সেবন করা আর কাঁচা পারদ সেবন করা প্রায় সমান। রস্তিতরসসেবন আমাদের বীর্য্য-ক্ষয়কারী। আবালবৃদ্ধে এ রোগ দেখা দিয়াছে। মকরধ্বজাদি রস বিশ্বস্ত সুচিকিৎসকের স্বহস্তপ্রস্তুত না হইলে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীনেপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

জয়দেব।

কলিযুগে অজয়-পুলিনে ধন্য কেন্দুবিল্বগ্রামে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-কাব্য-ধারায় জীবকে প্রেমামৃত পান করা-ইয়া গিয়াছেন, আজ "হিন্দু-পত্রিকার" পাঠকগণকে সেই দ্বিজচূড়ামণি মহা-কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জয়দেব বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী। জয়দেব অতি অল্পবয়সেই উদাসীন হন, পরে পদ্মাবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া, নিষ্কামভাবে, কিছুদিনের জন্য সংসার-জীবন যাপন করেন। কিংবদন্তী আছে যে, জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা সুদেব, স্বীয় দুহিতাকে উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বলেন। সে কথা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

জয়দেব স্বগ্রামবাসী নিরঞ্জন-নামক একটী লোকের নিকট কিছু দেনা ছিলেন। নিরঞ্জন জয়দেবের সংসারে ঔদাসীন্য দেখিয়া ও চারিদিকে জয়-দেবের "পাগল" অপবাদ শুনিতে পাইয়া, কিরূপে তাঁহার বাস্তুভিটা স্বীয়কর-তলগত করিবেন—এই অভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এক কবলা লিখিলেন এবং জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখ্ রে জয়া, আমি তোর রাধা বুলি, কৃষ্ণ বুলি, কোন বুলি শুনব না, আজ এখনই আমার টাকা দে, না হয় তোর বাস্তুভিটা আমাকে কবালা করিয়া দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া

দে।” জয়দেব বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া কবালায় স্বাক্ষর করিলেন। ভগবানের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে! জয়দেব হস্ত হইতে কলম নামাইয়াছেন, এমন সময়, নিরঞ্জনের শিশুকন্যা ছুটিয়া আসিয়া বলিল “বাবা, শিগ্‌গির চলো, সব পুড়ে গেল।” ভক্তচূড়ামণি, দ্বেষ-হিংসা-বিবর্জ্জিত জয়দেব তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া নিরঞ্জনের বাটীতে লেলিহানজিহ্ব হুতাশনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত অগ্নি জল হইয়া গেল। চরিদিকে শতকণ্ঠে সকলে বলিতে লাগিল “জয়া মানুষ না দেবতা!” নিরঞ্জন জয়দেবের অলৌকিক-শক্তিদর্শনে নয়নজলে ভাসিয়া জয়দেবের চরণে পতিত হইয়া বলিলেন “দেব, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া যেমন তোমার বাস্তুভিটা কবালা করিয়া লইয়াছিলাম, তেমন আমার উপযুক্ত শিক্ষা হইতেছিল। ভাগ্যে তুমি ছিলে, এই লও তোমার কবালা, আজ আমার দিব্য জ্ঞান হইয়াছে”! এই বলিয়া নিরঞ্জন সেই কবালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তদবধি নিরঞ্জন ও তাঁহার পত্নী জয়দেবের প্রিয় শিষ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন-গানে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। জয়দেবের ন্যায় কেন্দুবিল্বে আর একজন শ্রীকৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাঁহার নাম পরাশর। পরাশরের আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল দিন রাত দু'হাত তুলিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন—

সাজ সাজ সাজ, সারি গৃহকাজ, কিবা ফল কালব্যাজে।
আমি কর্ণধার ভব-পারাবার, ক'রে দেব পার, কি ভাবনা আর,
মায়া-মোহ-ভ্রান্তি রাখিয়ে বিকার, (তোরা) আয়রে ভিকারীসাজে।
অনিত্য বিষয় পাগল রহিয়ে, পরমার্থ কেন যাস্‌রে ভুলিয়ে,
রঙ্গভূমি-মাঝে নট সাজিয়ে, (ও তোর) ভয় কেন কুল-মান-লাজে।

পরাশরের স্ত্রী বিমলা, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা হইলেও বাহ্যতঃ কিন্তু পরাশরের প্রতি যথোচিত বিরক্তিভাব প্রদর্শন করিতেন। পরাশর সস্ত্রীক জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়দেব ও পরাশর দুইজনে জগন্নাথ দর্শনে গমনকালে এক প্রান্তরে জয়দেব তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া ভূমিশায়ী হইয়া পড়িলে, স্বয়ং রাখালবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবকে বাতাস করেন এবং জয়দেবকে সুমধুর দুগ্ধদানে পরিতৃপ্ত করেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ তদনন্তর জয়দেবকে পথ দেখাইয়া পুরুষোত্তমে লইয়া যান। সেখানে যাইয়া জয়দেব প্রথমতঃ দেখেন—যেন চারিদিকে সুনীল পর্ব্বতরাজি, কলকলনাদিনী যমুনা, তাহার তীরে কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার আরাধ্যদেবতা

শ্রীকৃষ্ণ। এই দৃশ্য দেখিয়া জয়দেবের মুখ হইতে আপনা হইতেই এই কবিতা নিঃসৃত হইল ঃ—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

পরাশর এই মধুময় শ্লোক শুনিয়া বলিলেন—"প্রভো, আপনার মুখ হইতে আজ যে কবিতা নিঃসৃত হইল, তাহা যেন গোমুখীবিনিঃসৃত গঙ্গার পারিজাত-মথিত অপূর্ব্ব পরিমলক্ষীরতোয়। ধন্য আপনার ললিতমধুর গীত-গোবিন্দ।"

তখন অকস্মাৎ শূন্য হইতে মৎস্য-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। জয়দেব সে মূর্ত্তি দেখিয়া গান ধরিলেন—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

পরাশরের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তিনি দুই হাত তুলিয়া—সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কোন্ অমররাজ্য হ'তে এ অমিয়-ধারা-নিসৃত হ'চ্চে?" এই বলিয়া তিনি বারংবার—"প্রলয়পয়োধিজলে" এই সঙ্গীতটী গাহিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ আবার শূন্যে কূর্ম্ম-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এবার ভাবমুগ্ধ পরাশর গান ধরিলেন—

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে—
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে—।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

তখন একেএকে শূন্যে বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি-প্রমুখ ভগবানের মূর্ত্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। পরাশরও প্রত্যেক মূর্ত্তি দেখিয়া এক একটী কবিতা রচনা করিয়া মূর্ত্তির প্রতি ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একি! হঠাৎ চক্ষুরুন্মীলন করিতেই দেখেন—তাঁহারা ত বৃন্দাবনে ন'ন, সম্মুখে যে অনন্তপ্রসারিত সমুদ্র! তখন জয়দেব ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন—"প্রভু, প্রভু, অনন্ত জগতে তুমি ছড়াইয়া রহিয়াছ কত রকম ভঙ্গি, তাই তোমার ইয়ত্তা হয় না। ঐ যে

আমার পুরুষোত্তম, শ্রীমন্দিরের মধ্যভাগে উপবেশন করিয়া মন্দির হিরণ্ময় করিয়া রাখিয়াছেন। চল পরাশর, প্রভুকে আমার মধুর গীতগোবিন্দ শুনাইয়া আসি।”

এই বলিয়া দুই ভক্ত তখন দু'বাহু তুলিয়া—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর-বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

এই গান গাহিতে গাহিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশে—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর-বেশম্
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥

এই গান গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন জয়দেব বলিলেন, “পরাশর, মিছে কেন গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি বহন করিয়া মরি। ভেবেছিলাম—নূতন ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের পদে অঞ্জলি দিব, কিন্তু এই রাখাল-বালক যখন শ্লোকের শেষ চরণ দুইটী আবৃত্তি করিল, তখন এই “গীত-গোবিন্দ” নিশ্চয়ই পুরাতন”—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে “গীতগোবিন্দের” পাণ্ডুলিপি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নেপথ্যে বলিলেন—“জয়দেব! রোদন সম্বরণ কর, তোমার অপূর্ব্ব “গীতগোবিন্দ” উচ্ছিষ্ট বা পুরাতন নয়, নিত্য পবিত্র; নিত্যনূতন। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন তোমার এই গীতগোবিন্দের পবিত্র গাথা সাধুদিগের পবিত্র-হৃদয়ে চন্দনাক্ষরে লিখিত থাকিবে। জয়দেব! তোমার গীতগোবিন্দ কখনও পুরাতন হইবে না।”

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া জয়দেবের মনে অনুতাপ আসিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“হায়! হায়! কি ক'র্‌লেম্! আমার সাধের “গীতগোবিন্দ” সমুদ্র-জলে ভাসিয়ে দিলেম।” কথিত আছে—তখন শ্রীকৃষ্ণ অম্বুধির তরঙ্গ-উচ্ছাসে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়া বলিলেন “ওরে ভাবুক ভক্ত! তোর গীতগোবিন্দ ভাসিয়া যায় নাই, আমি ইহা বক্ষে যত্ন করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি! আমি নদীয়ার গৌরাঙ্গ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোর এই গীত-গোবিন্দের গীতসুধা ছড়াইয়া লোকের ভবক্ষুধা মিটাইব।”

এই বলিয়া গৌরাঙ্গরূপী ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন, জয়দেব ও পরাশর

ত্বরিতপদে মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে সুদেব-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পদ্মাবতীকে জয়দেবের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করিয়া বলিলেন "ইঁনিই স্বামী তোমার, ইঁহার পদধূলি লও।" জয়দেব বলিলেন,—"আমি বৈরাগী, আমার কামনা লালসা দেখিলে লোকে আমার কুগীত গাহিবে, অতএব কেমন করিয়া ইহাকে আমি গ্রহণ করি?" সুদেব কিন্তু ইত্যবসরে অন্তর্হিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী জয়দেবের চরণ ধরিয়া বলিলেন—"নাথ! নারীর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য যাবে, লোকে কুযশঃ গাহিবে, এরূপ ধারণা করিবেন না। ধর্ম্ম কি শুধু পুরুষের? নারীর কি ধর্ম্ম নাই? এই বিশাল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে কত মহাপাপী সাধু কৃপায় পরিত্রাণ পায়, কামিনীর কি পরিত্রাণ নাই? এজাতি কি এতই অভাগ্য? হিন্দুধর্ম্মে আছে, যে জায়া পতির অর্দ্ধাঙ্গ, ধর্ম্ম-বিধি, পতিপত্নীসহ, ইহা কি সব অমূলক?"

পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া জয়দেব দু'হাত তুলিয়া বলিলেন—"দীনবন্ধো, এ দীনের সহায় হও, কামিনীর মোহে পড়িয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। পদ্মাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

জয়দেব, পরাশর এবং পদ্মাবতী জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমনসময় সমাসীন পাণ্ডাগণ জয়দেবকে বাধা দিল। জয়দেব মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিতে নাছোড়বান্দা হওয়ায় পাণ্ডাগণ বেত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল, খরস্রোতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে উড়িষ্যারাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় পাণ্ডাগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল—সশিষ্য জয়দেব পুরুষোত্তমের বিগ্রহ দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর উড়িষ্যারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জয়দেব স্বগ্রামে আসিয়া পদ্মাবতীর সহিত সংসারে মনোনিবেশ করিলেন।

একদিন জয়দেব কুটীরে বসিয়া "গীতগোবিন্দ" লিখিতেছেন, আর পদ্মা নিকটে বসিয়া আবৃত্তি করিতেছেন——

"ললিত লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিত-কোকিল-কূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥
উন্মদমদন-মনোরথ-পথিক-বধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুল-কুসুমসমূহ-নিরাকুল-বকুলকলাপে॥

মৃগমদ-সৌরভ-রভসবশংবদনবদলমালতমালে
যুবজন হৃদয়-বিদারণ মনসিজনখরুচি কিংশুকজালে ॥”

গান সমাপ্ত হইলে, পদ্মাবতী বলিলেন—“নাথ! স্নানের সময় যে আগত, এখন লেখা রাখিয়া স্নান করিতে গেলে হয় না?” জয়দেব বলিলেন “যাব ত, পদ্মা! গীতগোবিন্দের জন্য একটি কবিতা লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার শেষ চরণটা যে মিলাইতে পারিতেছি না! শুনিবে, শুন—

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগম্।
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্—

তারপরে যে আর কি লিখিব, তাহাত স্থির করিতে পারিতেছি না।”

পদ্মা বলিলেন, “এত চঞ্চল হবার প্রয়োজন কি? গঙ্গাস্নান ক'রে এসে ধাঁকাটুকু লিখ্‌লেই হ'বে।”

“আচ্ছা তাই হ'বে! পদ্মা! তুমি আমার গ্রন্থখানি তুলে রাখ, আমি স্নানান্তে এসে লিখ্‌ব।”

জয়দেব স্নানার্থে গমন করিলেন। এমন সময় জয়দেব-বেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “পদ্মা, শীঘ্র আমার গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেও”

পদ্মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—“একি, তুমি স্নান না করিয়াই ফিরিয়া আসিলে যে!” উত্তর হইল—

“অর্দ্ধপথে যাইয়া শেষচরণটী মনে পড়িল, তাই ফিরিয়া আসিলাম।” পদ্মা লেখনী, মস্যাধার ও গ্রন্থ আনিয়া দিলেন, জয়দেব-বেশী শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত কবিতার শেষে লিখিলেন—‘দেহি পদপল্লবমুদারম্।” পরে জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ পদ্মার আনীত জলে স্নান করিয়া পদ্মার স্বহস্তে প্রস্তুত আহার্য্য ভোজনে বসিলেন। আহারান্তে পদ্মাকে প্রসাদ পাইতে অনুজ্ঞা করিয়া জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিলেন। এমন সময় জয়দেব আসিয়া বলিলেন—“পদ্মা-পদ্মা, বড় সুসমাচার! দেবী সুরেশ্বরী আজ কৃপা করিয়া আমায় বলিয়াছেন যে, তিনি প্রতিদিন কদম্ব-গিরির ঘাটে আসিবেন, আর আমাকে পথ-শ্রমে কাতর হইতে হইবে না। কিন্তু একি পদ্মা! তুমি মাধবকে ভোগ না দিয়া এবং আমাকে না খাওয়াইয়া

নিজেই আহারে বসিয়াছ যে? এরূপ আচরণ ত তোমার কখনো দেখি নাই সতি!"

জয়দেবের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী বলিলেন "একি! এই যে তুমি এইমাত্র অর্দ্ধপথ হ'তে ফিরিয়া আসিয়া কবিতার শেষচরণটুকু লিখিয়া আহারান্তে শয়ন করিলে!"

পদ্মার কথা শুনিয়া জয়দেব বলিলেন "তাহাহইলে নিশ্চয় ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আজ প্রসাদ-দানে অনুগৃহীত ক'রেছেন। কই পদ্মা, আমার হৃদয়-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কই। দেখি দেখি গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি খানি দেও দেখি।"

পদ্মা পাণ্ডুলিপি দিলেন। জয়দেব দেখেন, তাহাতে শেষচরণে ঠিক্ তাঁহারই মনঃকল্পিত কথা লিখিত রহিয়াছে। ঊর্দ্ধকরে জয়দেব তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, নন্দের নন্দন, রাধাবল্লভ, বিধির দুর্ল্লভ, ব্রজাঙ্গনাধন, গোকুলরতন, করুণার সিন্ধু, রাখালের প্রাণবন্ধু! আজ কোন্ দোষে অধম কিঙ্করকে ত্যাগ করিয়া, পদ্মার মন-অভিলাষ পূর্ণ করিলে?" এই বলিয়া জয়দেব পদ্মার পাত্র হইতে শ্রীহরির প্রসাদ লইয়া ভক্ষণ করিলেন। পদ্মা কতবার বলিলেন "নাথ, এ প্রসাদ উচ্ছিষ্ট," কিন্তু জয়দেব তাহা শুনিলেন না।

চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, জয়দেবের শ্রমনাশনার্থে সুরেশ্বরী জাহ্নবী অজয় প্লাবিত করিবেন। এ দৃশ্য দেখিবার জন্য শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক অজয়ের তীরে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা বলিতেছেন, যদি আজ বৈষ্ণবসাধক জয়দেবের জন্য সত্য সত্যই মা সুরেশ্বরী অজয় প্লাবিত করেন, তাহা হইলে বুঝিব—আমাদের তান্ত্রিক সাধনা ব্যর্থ। দর্শকগণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় সহসা গঙ্গাস্রোতে অজয় প্লাবিত হইল। জয়দেব দু'বাহু তুলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অজয়ে অবগাহন করিলেন—

"চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাবয়বভূষিতাম্।
রত্নকুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদামভয়প্রদাম্॥
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামণি-বিভূষিতাম্।
তাং চ ধ্যায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈ র্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্॥

সুধা-প্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যমনিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥"

কিন্তু সাধারণে "অজয়ে মা গঙ্গা আসিয়াছেন" তাহা পাছে অবিশ্বাস করে, এই ভয়ে জয়দেব বলিলেন "মাতর্গঙ্গে! সত্যই যদি তুমি আসিয়া থাক, তাহা হইলে একবার মকরবাহিনীরূপে দর্শন দিয়া ভক্তের মান রক্ষা কর মা!"

সহসা মকরবাহিনীরূপে সঙ্গিনীদ্বয়সহ গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়া জয়দেবকে বলিলেন—"বৎস! তোর পুণ্যে আজ কেন্দুবিল্ব ধন্য হইল। আজ হ'তে অন্তগিরির ঘাট মহাতীর্থ হইল। তোর স্নানকালে আমি প্রত্যহই আসিব; আর পৌষ-সংক্রান্তিতে যে অজয়ে স্নান করিবে, তার শতকোটিজন্মের পাপ ধ্বংস হইবে।" এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

তখন জয়দেব ও অপরাপর সকলে গান ধরিলেন—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত—
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥
হরি-পাদপদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগর-পারম্॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরম পদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে

ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে ॥"

কিছুদিন এই ভাবে অজয়ের তীরে বাস করিবার পর জয়দেব, পদ্মাবতী, পরাশর, নিরঞ্জন প্রভৃতির সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, প্রতিকুঞ্জে তাঁহার বিনোদিয়া বিহার করিতেছেন, তাঁহার অরুণিত চরণে রুণু রুণু করিয়া মণিমঞ্জীর বাজিতেছে, শিরে তাঁহার শিখণ্ডক খেলিতেছে, তিনি যেন জয়দেবকে "আয় সখা, আয়" বলিয়া ডাকিতেছেন।

পদ্মাবতীও দেখেন—যেন মেঘের আড়ালে সৌদামিনীর ন্যায় শ্যাম-বামে এক রমণীমূর্ত্তি তাঁহাকে সঙ্গিনী বলিয়া ডাকিতেছেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ ধরিয়া জয়দেবকে এবং শ্রীরাধা নিজমূর্ত্তি ধরিয়া পদ্মাবতীকে অঙ্গে গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতার জয়দেব শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীরাধার অবতার পদ্মা শ্রীরাধায় মিলাইয়া গেলেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাঁহারা স্থূলদেহ ও মনকে "আত্মা" বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমনিরাসার্থ এদীর্ঘ প্রয়াস স্বীকার করা হইল। ফলতঃ আমরা বেশ বুঝিতে পারি, সবাই সুখদুঃখের অতীতাবস্থা—মুক্তি—তাহাই প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহা পাইতে হইলে মুমুক্ষুতা অর্থাৎ মুক্তি পাইবার ইচ্ছা ও মহদাশ্রয়ের আবশ্যক। মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য প্রবল আগ্রহকে মুমুক্ষুতা কহে।

যখন ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জন্মিবে, বুঝিতে হইবে, তখনই ঈশ্বর-লাভের অধিকার জন্মিবে। তাহার পর চাই মহাপুরুষ-সংশ্রয়, অর্থাৎ সদ্‌গুরুলাভ। গুরুপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহার সহিত সংযোগ-স্থাপন ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না। তাহারই সহিত আধ্যাত্মিকযোগ স্থাপিত হইলে, তবে ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ সুগম হইবে।

তাহার পর চাই অভ্যাস। অভ্যাস, সাধন ব্যতীত কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টী যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। সেই অজ্ঞেয়তত্ত্ব বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না, দৃষ্টান্ত দ্বারাও সমর্থন করা যায় না। কাহাকেও অনুভব করান যায় না। তবে মুমুক্ষুতা, গুরুপদাশ্রয় ও সাধন-প্রভাবে সেই তত্ত্ব লুপ্ত স্মৃতির উন্মেষের মত স্বতই হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে। ভগবদভিমুখতাই জীবের স্বাভাবিক ভাব, তদ্বৈপরীত্য অস্বাভাবিক; যেহেতু তিনিই হৃষীকেশ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। দুরদৃষ্টবশতঃই জীব দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অপথে বিচরণ করে ও নানাবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ও সৎসঙ্গ প্রভাবে জীবের দুরদৃষ্ট ক্ষয় হয়, তখন আর মন অপথে ধাবিত হয় না। এই জন্যই প্রথম বৈধীভক্তির আবশ্যক। বিষয়-বিষদগ্ধ লুপ্তজ্ঞান অন্তঃকরণের প্রবোধ জন্মাইতে বহুবিধ ক্রিয়ার আবশ্যক। মাত্র চিত্ত বিশুদ্ধ করিতেই কত জন্ম গত হইয়া যায়। তারপর যদি ভাগ্যবলে সদ্‌গুরু মিলে, তবে তখনই তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে যথার্থতত্ত্বের ছায়া পড়িতে থাকে। শুধু কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এই তিনটীর কোনটী শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক করিয়া সহস্র জীবন গত করিলেও কোনও ফল হইবে না। শূন্য-পাত্রে জল পুরিতে থাকিলে শব্দ হয়, কিন্তু পূর্ণ পাত্রে জল ঢালিলে শব্দ হয় না। সুতরাং যতদিন বস্তু না মিলে, ততদিনই তর্ক আর বকাবকি থাকে, বস্তুলাভ হইলেই একদম নীরব। সেই চিরপ্রার্থিত বস্তু, একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যে উপায়েই হউক্ না পাওয়া যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ। দেহ, মন, বাক্য, কর্ম্ম, চেষ্টা—সমস্তই সেই একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হউক, যাহা হইতে নিশ্চিত শ্রেয়োলাভ হইবে। কৌশলী পুরুষ ঐহিক পারত্রিক যাবতীয় শ্রেয়ই অক্ষুণ্ণ রাখিতে সতর্ক থাকেন; আর যাহারা পশুজীবন লইয়া জগতে বিচরণ করে, তাহারা উভয়কুলই ভগ্ন করিয়া থাকে। পরম-ভাগবত সাধুগণ, তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী দ্বেষশূন্য, নিন্দা-প্রসংশায় উদাসীন সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা জগতের হিত ভিন্ন অহিত হয় না। তাঁহারা স্বীয় জীবনহন্তাকেও ক্ষমা করিতে অনুরোধ করেন। যাহারা তুচ্ছ কামিনী-কাঞ্চনের গর্ব্ব করে, তাহারা ভগবদ্ ভাব-বর্জ্জিত হইয়া অসার জীবন ভারবহন করে মাত্র। সেই শিশ্নোদরপরায়ণ মানবদিগকে কোন অংশে পশু হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি ব্যতীত যদি জীবনের কোনও প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তবে শ্রেষ্ঠ মানব-জীবন-লাভের

উদ্দেশ্য কি? এই শ্রেষ্ঠজীবনলাভের কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? অবশ্যই আছে। সেই উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবনের পরিসমাপ্তি। বাক্য হইতে কার্য্যের ফল স্বতন্ত্র। বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া সময়ক্ষেপ না করিয়া কার্য্য করাই ভাল; কারণ কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য করা চাই। জগতে সবাই যদি আচার্য্যের পদ অধিকার করে, তবে শিষ্য হইবে কে? আচার্য্য যিনি, তিনি চক্ষুষ্মান্ কি অন্ধ—তাহাও পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহার নিজের কোনও সামর্থ্য নাই, সে পরের শরীরে শক্তিসঞ্চার করিবে কিরূপে? যদিও ভগবানের নিকট কেহই অপ্রিয় নাই, সত্য, তথাপি তাঁহার সত্তা আত্মায় অনুভূত না হইলে, শক্তির বিকাশ হইবে না। তাহা না হইলে, সে নিজেও তরিবে না, অপরকেও তারিতে পারিবে না। অতএব সাধনা-বলে আত্মায় শক্তি-সঞ্চয় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

প্রিয় পাঠকগণ! আমি এ রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিব বলিয়া আপনাদিগের সম্মতি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ছিলাম। গত ফাল্গুনের হিন্দু-পত্রিকায় আমার প্রার্থনা প্রকাশ পায়। প্রকাশের পর কতিপয় সুধী সহৃদয় পাঠক, আমাকে পত্রদ্বারা অভিনন্দিত করেন এবং প্রবন্ধের সারবত্তা স্বীকার করেন। এমন কি, তাঁহাদের আকাঙ্খার অপরিতৃপ্তিও আমার অগোচর থাকে নাই। সেই সাধুসহৃদয় পাঠকবৃন্দের উৎসাহ-প্রদর্শনে হর্ষনির্ভর হৃদয়ে আবার আপনাদিগের নিকট উপনীত হইতেছি। সাধু-মহাত্মাদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদে আরব্ধ ব্রত প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যদি এই প্রবন্ধ-পাঠে কাহারও তৃপ্তিবোধ হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আমার কোনই কৃতিত্ব নাই; অনন্তমধুর অমৃতসিন্ধু জগদ্বন্ধু শ্রীহরির নামমাহাত্ম্যই তাহার একমাত্র কারণ। শুনিয়াছি, শুক-মুখেও লোকে মধুর-হরিনাম-শ্রবণে পরিতুষ্ট হয়। অতএব প্রবন্ধে যদি কিঞ্চিৎ মধুরতা লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা একমাত্র নামের গুণে। "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিলরে' আকুল করিল মোর প্রাণ।" আহা! কি সুন্দর বর্ণনা! যে কবি ভাষায় এই প্রাণের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নরকুলে ধন্য—তিনি প্রকৃত অমর। প্রাণ আকুল করা নামই বটে! পাগল করা নাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে নামে মৃত্যুঞ্জয় পাগল, নারদ পাগল, সনকসনাতন পাগল, সেই নামমাহাত্ম্যই সত্য। "জপিতে জপিতে নাম স্ফুরয়ে বদনে—"নাম স্মরিতে করিতে আপনিই মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে। নামের ভিতরই নামীর সত্তা বিদ্যমান! অমৃতরসসিক্ত মধুর নাম

পশু-পক্ষীতে গান করিলেও মধুরস্বভাববশতঃ মধুর লাগে। ভক্তিসূত্রকার নারদ বলিয়াছেন, "সাকস্মৈ পরম-প্রেমরূপা"। কিম্ শব্দ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমপ্রেম অর্থাৎ ক্ষণবিরহাসহিষ্ণুতারূপ যে ভালবাসা তাহাই ভক্তি। ভক্তিকথাই এই প্রবন্ধের বিষয়; সুতরাং প্রবন্ধ-কলেবরে কিঞ্চিৎমাত্রও মাধুর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকিলে তাহা নামেরই শক্তিতে। আমি মূঢ় অকিঞ্চনমাত্র। তবে পামর দেহসর্ব্বস্ব তর্করসিক লোকায়তিক-মতাবলম্বিদিগের নিরস্ত করিবার জন্য প্রবন্ধকলেবরে অনেক স্থলে নীরস যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সহৃদয় সাধু ভক্তবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা স্বীয় গুণে আমার এদোষ পরিহার করিবেন।

একশ্রেণীর লোক বলেন, বৈরাগ্যমত ভক্তিশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ-বিষয়, এবং উহাতেই ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে। এ আপত্তি আমি পূর্ব্বেই খণ্ডন করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যদি আমাদিগকে নরকেও যাইতে হয়, তবুও তথায় আমরা বাঁচিয়া থাকিব, আর বিরুদ্ধবাদীরা জগৎ হইতে চির বিলুপ্ত হইবে। আমরা ধর্ম্মই চাই, আমরা ভগবান্‌কেই চাই। মহার্ঘ হীরকখচিত স্বর্ণমুকুট পদাঘাতে সরাইয়া দিয়া, আমরা কৌপীন পরিধান করিতেই চাই। সুখদুঃখ মনের ভাবান্তর মাত্র, সুতরাং বস্তুর সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। কুসুমাস্তৃত নরকের পথ আমরা চাহি না, কণ্টকাকীর্ণ হইলেও আমরা স্বর্গের পথই প্রার্থনা করি। আমি পরের জিহ্বায় আস্বাদ গ্রহণ করি না, পরের চক্ষুতে দেখি না; আমার যাহা ভাল লাগে, আমি তাহাই চাই। জলপান না করিয়া যদি তৃষ্ণার উপশম হয়, তবে সে সব চেয়ে ভাল। আমার প্রবৃত্তি, মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়নিচয়, মন—সমস্তই আমি সেই একবস্তুর দিকে অভিমুখী করিতে চাই। সেই এক বস্তু ভগবান্। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, তিনিই আমার জীবনের বাঞ্ছিত। ভক্তরূপে—আচার্য্যরূপে এসে যদি তিনি আমায় গন্তব্য পথে লইয়া যান, তবেই আমার এই জীবন-জনম সফল হইবে। সংসারের স্ত্রীপুত্রের ক্ষণবিরহে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, চক্ষে জল আইসে, প্রাণ শোকসাগরে ভাসিতে থাকে। কিন্তু আহা! আমার সেই শুভ মুহূর্ত্ত কবে হবে, যেদিন ভগবানের জন্য সেই ভাব প্রাণে বিরাজ করিবে? মরণেইবা ভয় কি, জীবনেইবা সুখ কি, যদি কৃষ্ণের চরণারবিন্দে মন বাঁধা না রহিল? আমি দীনাতিদীন ভজনসাধনবিহীন, পথভ্রষ্ট, মন

অবাধ্য। আমায় যদি ইন্দ্রিয়গ্রাম সহ তিনি ফিরাইয়া লন, তবেই ফিরিতে পারি। নতুবা জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মপ্রবাহ আমায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। খরস্রোতানদীর প্রতিকূল অভিমুখে আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এ দুঃখ কাহাকে বলিব, কেবা আমায় এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে?

মরি! মরি! প্রাণের এ অরুন্তুদ যাতনা আর কাকে জানাব? কে আমার বুক থেকে এ সহস্রমণ পাথর সরাইয়া দিবে? এক একবার প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠে, আবার জলবিম্ববৎ সে ভাব কোথায় লুকায়ে যায়, তাহার ঠিকানা নাই। উদ্দেশ্য-হারা হইয়া কোথা যাই, কি করি, কিছুই ঠিক নাই। কত বন্ধু-বান্ধব দেখি, কত জনকে জিজ্ঞাসা করি, "ভাইহে! আমার প্রাণের এ ক্ষত শুকাইবে কিসে?" কেহ কথা কয় না। কেহ বা বলে—"জানি না, অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর।" এ বাজারে সবাই সমান; সবাই সমান ঠকিতেছে। এক দুই জন নেশার ঘোরে কাল কাটাইতেছে। হরি হে! দয়াময়! বলে দাও নাথ! কিসে এ প্রাণের ক্ষত শুকাইবে? স্বপ্ন এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে—জলবিম্ব এখনই বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এ মরীচিকায় দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়াইতেছে। দয়াময়! ইহার কি প্রতীকার হবে না? জীবন-কুসুম এইরূপেই কি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে?

আহা! ঐ শুন, কে যেন বিশ্বের অন্তরাল হ'তে সমস্ত কোলাহল নিরুদ্ধ ক'রে জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছে, "ভয় নাই,—এই আমি এখানে আছি; হতাশ্বাস হইও না; ব্যাকুল হয়ে আত্মহারা হইও না; এই আমি অন্তরে আছি। ভয় কি! মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা) একমাত্র আমাকেই যে আশ্রয় করে, সেই এই ত্রিগুণময়ী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পায়। যে মায়াকে চিনিতে পারে, সেখান হইতে মায়া পলায়ন করে। নামরূপ উঠাইয়া দাও, দেখিবে, আর কিছুই নাই, মাত্র সেই এক তুমি আছ, আর সব পুতুল, সেই ছায়াবাজীর পুতুল, সব পলাইয়া গিয়াছে। আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইবে না।" যিনি বিশ্বের অন্তরাল হইতে এতক্ষণ অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন, তিনি এখন সম্মুখে। তিনিই নিজমুখে বলিতেছেন শুন,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" এখন তুমি অতী[illegible] আর তোমাকে কি ভয় দেখাইবে? ইন্দ্রজালবিদ্যার [illegible] মধ্যে

কাটা দেখিয়া যে কাঁদিয়াছিল, সেই পুত্রই এখন দেখিল, সে ভিন্ন আর কিছুই নাই, তবে ভগবচ্চরণাগতি ভিন্ন কেহই সুখী হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

মধুর-ভজন ও জাতীয় উন্নতি।

আজকাল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ভারতের উদ্ধারের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনা যায় যে, "ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের অন্যতম কারণ বৈরাগ্য-বাদে গাঢ় শ্রদ্ধা, এবং মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মই উক্ত বৈরাগ্যবাদের প্রসূতি না হইলেও প্রধান প্রশ্রয়দাতা তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যে ধর্ম্মে শিক্ষা দেয়,—"সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ"—"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি"—"অর্থাঃ পাদরজোপমাঃ" * যে ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু,—"বৈরাগ্য-বিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষপ্রধানঃ"—যে ধর্ম্মের শেষ আশা "কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকরী মেগে খাব"—সে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আর কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? একে আমাদের দেশের জলবায়ুর

---

* সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ, বাহৌস্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং। সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা, দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ"। সুবিস্তৃত ধরণীতল থাকিতে পর্য্যঙ্কের প্রয়োজন কি? স্বসিদ্ধ বাহু উপাধান থাকিতে অন্য উপাধানে প্রয়োজন কি? স্বীয় করপুট থাকিতে নানাবিধ ভোজনপাত্রের প্রয়োজন কি? দিক্ ও বৃক্ষবল্কল থাকিতেই বা উত্তম উত্তম বসন-ভূষণের প্রয়োজন কি?

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্। রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্? —পথে কি ছিন্নবসনখণ্ডও নাই, পরপোষণকারী বৃক্ষগণ কি আর ভিক্ষা দান করে না? পৃথিবীর জলাশয়গুলিও অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই, পর্ব্বতগুহাগুলি কি একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? জগৎপালনকর্ত্তা শ্রীহরি কি একান্তাশ্রিত অনন্যশরণ সন্তানগণকে পালন করেন না? তথাপি যে পণ্ডিতগণ ধনমদান্ধ জনগণের ভজনা কেন করেন বুঝি না।

গুণেই সকলে নিস্তেজ, শ্রমপরাঙ্মুখ, অলস, কোনওরূপে নিরুদ্বেগে দিন-সংস্থান হইলেই চরম উন্নতি বলিয়া মনে করে, তাহার পর আবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবল বৈরাগ্যবাদ দেশটীকে একেবারেই নিষ্ক্রিয় জড় করিয়া তুলিতেছে—ভিখারীর দেশে দিন দিন ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। দুর্ভিক্ষের প্রবল পীড়নে লোক সকল হাহাকার করিতেছে,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতিকষ্টে একমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, তাহার পর আবার প্রতিদিন শত শত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ বলিষ্ঠ যুবক "জয় গৌরনিতাই"—বলিয়া তাহাদের ঐ শ্রমার্জ্জিত মুষ্টিমেয় তণ্ডুলের অকারণ অংশী হইয়া পোষ্য-ভার-প্রপীড়িত গৃহীকে সমধিক পীড়ন করিতেছে! সুতরাং এরূপ ধর্ম্ম, মুমূর্ষ ভারতের পক্ষে কখনই উপযোগী হইতে পারে না। এখন আমরা চাই কর্ম্ম, চাই উত্তেজনা, চাই লোকহিতৈষণা, চাই কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম—"যতোনিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়সিদ্ধিঃ"—যাহা হইতে মুক্তি এবং অভ্যুদয় সিদ্ধি হয়। কিন্তু যে ধর্ম্মবলে,—"বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং"—সে ধর্ম্ম কখনই বর্ত্তমান ভারতের উপযোগী হইতে পারে না।" কথাটী আপাতদৃষ্টিতে শ্রুতিরম্য ও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিলেই উহার অসারতা উপলব্ধ হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈরাগ্যবাদের পর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু বৈষ্ণবধর্ম্ম কেন? প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জগতে যদি কিছু থাকে, তবে তাহার ভিত্তি বৈরাগ্যবাদের পর স্থাপিত হওয়াই সঙ্গত। ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ বৈরাগ্যবাদে দৃঢ় বিশ্বাস নহে, পরন্তু বৈরাগ্যের অভাব ও ব্যভিচারই উহার প্রধানতম কারণ। বর্ত্তমানভারতে বৈরাগ্যসম্পন্ন লোকের সংখ্যাই বা কত, এবং বিষয়ানুরক্ত লোকের সংখ্যাই বা কত——তাহা গণনা করিলেই আমার কথার সত্যতা বুঝা হইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে "বৈরাগী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও "বৈরাগী" অপেক্ষা "অনুরাগী"র সংখ্যাই অধিক। বিষয়ে আমাদের অনুরাগ যথেষ্টই আছে, কিন্তু তাহা অর্জ্জনের উপায়ে আমাদের ঘোর বৈরাগ্য; তাহার হেতু আমাদের অলসতা। এটি আমাদের তামসিক ভাব। তমোভিভূত ব্যক্তি কখনই বৈরাগ্যসম্পন্ন হইতে পারে না। বিষয়বিরাগ সত্ত্ব-গুণের কার্য্য। সত্ত্বগুণে লোককে জড় অলস বা নিষ্ক্রিয় করে না। সত্ত্বগুণের অন্যতম লক্ষণ,—"ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।" অনেকসময় ছদ্মবেশী তমোগুণের নিকট আমরা প্রতারিত হইয়া থাকি। সত্ত্ব ও তমোগুণের বাহ্য লক্ষণ

অনেকটা একরূপ, কিন্তু উহার কার্য্য ও কারণে আকাশপাতাল প্রভেদ মোহ আলস্য প্রভৃতি তমোগুণের কার্য্য, উহার ফলে লোক নিশ্চেষ্ট জড় হইয়া পড়ে, এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলিত হয়, তখন লোক আত্মার পূর্ণতা অনুভব করিয়া, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শান্তভাবে অবস্থান করে: তাই সে নিষ্ক্রিয় জড়বৎ প্রতীয়মান হয়। সময় সময় আমরা চিত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক অন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াও উচ্চাবস্থার বড় বড় কথা বলিয়া নিজেদের দুর্ব্বলতাকে সমর্থন করিয়া থাকি। স্থূলদর্শিগণ ঐ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের পর অকারণ দোষারোপ করিয়া থাকেন। আমরাত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, একদিন ভারতের প্রধানবীর প্রধান-রথিক, নরনারায়ণের অবতার শ্রীভগবানের অভিন্নহৃদয় সখা অর্জ্জুনও কুহকিনী তামসী শক্তির প্রভাবে প্রতারিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"গুরূন-হত্বাহি মহানুভাবান্ শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে"—"কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা"—ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন যদি শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী সত্ত্বাভাসের অবগুণ্ঠনে আবৃতমুখী মায়াবিনী তামসীশক্তির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, প্রকৃতমূর্ত্তি অর্জ্জুনের নয়ন-পথবর্ত্তী না করাইতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুন নিশ্চয় যুদ্ধ পরিত্যাগ করি-তেন, আমরাও তাঁহাকে বাহবা দিতাম, স্থূলদর্শী সমালোচক আমাদের ধর্ম্মের অযথা নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু পাঠক মহোদয়গণ! এখন একবার আপনারা কুরুক্ষেত্রসমর ও অর্জ্জুনের মনোভাব এবং শ্রীভগবানের উপদেশ ধীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈরাগ্যপ্রধান ধর্ম্ম আমাদের অধঃপতনের হেতু, কিম্বা তাহার ব্যভিচারই আমাদের অবনতির হেতু। সৃষ্টির আদি কাল হইতেই দুইটী শক্তির খেলা দেখা যাইতেছে—প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তি। ইহার একটীকে বাদ দিলে, অপরটীর কার্য্যকারিতাই থাকে না। উহারই ঘাত-প্রতিঘাতে জাগতিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সুতরাং সৃষ্টিলীলায় দেবতার যেমন প্রয়োজন, অসুরেরও তেমনই প্রয়োজন; অমৃতের যেরূপ প্রয়োজন, বিষেরও সেইরূপ প্রয়োজন। ইহাই সৃষ্টিলীলার রহস্য, ইহাই সৃষ্টিলীলার মূলতত্ত্ব। ইহার অনুভব হইলেই ভগবানের মঙ্গল-ময়ত্ব উপলব্ধি হইবে। এই শক্তিদ্বয় অনন্তকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছে। কখনও প্রতিকূলশক্তি অনুকূলশক্তিকে পরাভূত করিয়া স্বাধিকার বিস্তার

করিতেছে। কখনও বা অনুকূলশক্তি প্রতিকূলশক্তিকে পরাজিত করিয়া বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইতেছে। যখনই এক শক্তির প্রভাবে অন্য শক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হয়, তখনই সেই দুর্ব্বলের বল নিরপেক্ষ ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া দুর্ব্বলের ক্ষীণ শক্তিকে বর্দ্ধিত করেন, সবলের বর্দ্ধিত শক্তিকে হ্রাস করেন, ও সমশক্তিকে পালন করেন। ইহাই তাঁহার লীলা। এই প্রতিকূল ও অনুকূল-শক্তি অন্তর্জ্জগতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং বহির্জ্জগতে দেবতা ও অসুর। তাই বলিতেছিলাম, সৃষ্টিলীলায় দেবতারও যেমন প্রয়োজন অসুরেরও তেমনই প্রয়োজন। অধর্ম্মবৃদ্ধি হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া যেমন তাহার বিনাশ করেন, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলেও ভগবান্ বা তাঁহার কোনও শক্তিবিশেষ অবতীর্ণ হইয়া তাহার বিনাশ করিয়া থাকেন। ভগবান ধর্ম্মের নাশ করেন—কথাটি বড় ভয়ানক হইল। তোমার-আমার পক্ষে ভয়ানক বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ লীলাপরায়ণ ভগবানের পক্ষে ভয়ানক নহে, বরং উহার বৈপরীত্যই ভয়ানক। একথা কেবল আমার মুখের কথা নহে, ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর লিপিভঙ্গীও ঐরূপ তাৎপর্য্যবোধক। জয়বিজয়ের ব্রহ্মশাপজনিত অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—জয়বিজয় ভগবৎপার্ষদ পরমভক্ত, তাহারা কি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য জানিত না? তবে তাহারা ব্রাহ্মণের অপমান কেন করিল? আর সনক সনাতনাদি ঋষিগণও তুল্যনিন্দাস্তুতি হইয়া সহসা কেন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎপার্ষদকে অভিসম্পাত করিলেন? এই সমুদয় আশঙ্কার সমাধানকল্পে স্বামী বলিতেছেন ;—"যদপি সনকাদীনাং ক্রোধোন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎপার্ষদয়োস্তযোঃ ব্রাহ্মণ-প্রাতিকূল্যং, ন ভগবতঃ স্ব-ভক্তোপেক্ষা, নচবৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জ্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ- যুযুৎসা সমজনি ; তদান্যেযামল্পবলত্বাৎ-স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেঽপি প্রাতিপক্ষ্যানুপপত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রবর্ত্ত্যৈষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌবিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মিতিভগবতেব ব্যবসিতং, অতঃ সর্ব্বং সঙ্গচ্ছতে, তদমুক্তং—শাপোময়ৈবনির্মিত ইতি।—অর্থাৎ যদিও সনকাদির ক্রোধের সম্ভব নাই, ভগবৎপার্ষদ জয়বিজয়েরও ব্রাহ্মণের প্রাতিকূল্য-সম্ভাবনা নাই, ভগবানেরও স্বভক্তোপেক্ষা সম্ভব নহে, এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইলে পুনর্জ্জন্মসম্ভাবনাও নাই, তথাপি ভগবানের সৃজনেচ্ছার ন্যায় কোনও সময় যুদ্ধের ইচ্ছা হইয়াছিল। অল্পবলত্বপ্রযুক্ত অপরের প্রতিপক্ষ হওয়া সম্ভব নহে, আর স্বপার্ষদ তুল্য হইলেও ভক্ত

বলিয়া প্রতিপক্ষ হওয়া সম্ভব নহে, তজ্জন্যই, জয়বিজয়কে ব্রাহ্মণ-নিবারণে প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং সনকাদির হৃদয়ে ক্রোধের উদ্দীপনা করাইয়া, প্রতিপক্ষ সৃজন করিয়া, যুদ্ধকৌতুক সম্পাদন করিবেন—বলিয়া ভগবদভিপ্রায়েই ঐ সমস্ত ঘটিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেবতাও যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, অসুরও তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্ট এবং তাঁহারই লীলাসহায়। কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা, জটীলাকুটিলারও সেইরূপ উপযোগিতা। জটীলা কুটিলা না থাকিলে রসের পুষ্টি হইতে পারিত না। যাহোক্ প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক্। দ্বাপরযুগের শেষে কথিতরূপ প্রতিকুলশক্তি অতিশয় প্রবল হইয়া অনুকুলশক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রতিকুল-শক্তি দুর্যোধনাদি নৃপতিবর্গের আশ্রিত এবং অনুকুলশক্তি যুধিষ্ঠিরাদির রক্ষিত। ভগবান্ সাঙ্গোপাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া এই প্রতিকুলশক্তির বিনাশ করিয়া অনুকুলশক্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন, অধর্ম্মের বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন, এই লীলানাটকের প্রধানপাঠ অর্জ্জুনের দ্বারা অভিনয় করাইবেন। কুরুক্ষেত্র এই অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ। সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন ঠিক হইয়াছে। অভিনেতৃগণ পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান, দেবর্ষি মহর্ষি প্রভৃতি দর্শকগণ সমুৎসুকচিত্তে দণ্ডায়মান। পটও উত্তোলিত হইয়াছে। অভিনয়ারম্ভসূচক বাদ্যধ্বনিও হইতে লাগিল। অভিনেতৃগণ পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন। এমন সময় অকস্মাৎ ধর্ম্মপক্ষের প্রধান অভিনেতা অর্জ্জুন পরাঙ্মুখ হইয়া বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।" তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের বড় বড় কথা বলিয়া নিজের পক্ষ সমর্থন করিলেন—অপিত্রৈলোক্যরাজ্যস্যহেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে—বলিয়া বৈরাগ্যের আভাস দেখাইলেন। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে অর্জ্জুনকে পরমত্যাগী, পরমবিরাগী, পরমধার্ম্মিক বলিয়া প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে—প্রজ্ঞাবাদাংশ্চভাষসে—বলিয়া নিন্দা করিলেন কেন? তবে কি গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা প্রভৃতি দ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করাই ধর্ম্ম? বিষয়াসক্তিই ভাল? বৈরাগ্য মন্দ? তাহা নহে। অর্জ্জুনের এই তামসভাব বৈরাগ্যমূলক বা সাত্ত্বিক নহে। উহা তামসিক মোহ-জন্য, সুতরাং চিত্তের দুর্ব্বলতা-জন্য। তিনি সেই দুর্ব্বলতাটিকে আবরণ দিবার জন্য কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা—কতকগুলি বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন। কোনও কার্য্যই কেবল পাপজনক বা কেবল পুণ্যজনক হয় না। উদ্দেশ্য-ভেদে পাপও পুণ্যজনক হইয়া থাকে। পীড়া

বা হত্যা একটি পাপ, কিন্তু এমনক্ষেত্র হইতে পারে, যেখানে উহা না করাই পাপ। যেমন রাজার পক্ষে—"অদণ্ড্যান্‌দণ্ডয়ন্‌রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্, অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি"—যে ব্যক্তি দণ্ডার্হ নহে, রাজা যদি তাহাকে দণ্ড বিধান করেন এবং যে দণ্ডার্হ তাহাকে যদি দণ্ড বিধান না করেন, তাহা হইলে সে রাজার মহৎ অযশ হয় ও পরিণামে নরকভোগ হয়। রাজা যদি পর-পীড়ন বা হত্যা পাপজনক বলিয়া দস্যুতস্করাদির যথোচিত দণ্ডবিধান না করিতেন, তাহা হইলে দেহাবসানে নরকে যাইতে হইত-না; এই দেশই ঘোর নরকে পরিণত হইত ও রাজাপ্রজা সকলেই সশরীরে অনায়াসেই নরকবাস করিতে পারিতেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, হত্যামাত্রেই পাপ-জনক নহে। উদ্দেশ্য-ভেদেই পাপ বা পুণ্য হইয়া থাকে। গুরুজনকে লঙ্ঘন করা একটী পাপ, কিন্তু উদ্দেশ্যভেদে উহাও মহাপুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রী মহাপ্রভু নীলাচলে লীলা করিতেছেন; ভক্তগণ স্ব স্ব অধিকারানুসারে ভগবৎসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। তন্মধ্যে পরমভাগ্যবান্ গোবিন্দ-দাস পদ-সেবার অধিকারী। তাঁহার অধিকার যে কত উচ্চ, তাহাই জনসাধা-রণকে জানাইবার জন্য ও সেবাধর্ম্মের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনজন্য ভগবান্ যে অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছিলেন, ভক্তগণ সকলেই তাহা অবগত আছেন, তথাপি মধুরা-দপি মধুরতর ভক্তচরিত্র-শ্রবণে শ্রোতা বা বক্তা কাহারই বিরস মনে হয় না—প্রত্যুত নিত্যই নব নব প্রতীয়মান হয়, তাই সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে দ্বারদেশে শায়িত আছেন, শ্রীপাদ-পদ্ম ঘরের ভিতরের দিকে; বাহির হইতে পদস্পর্শ করিবার উপায় নাই। প্রভু এরূপ ভাবে শয়ন করিয়াছেন যে, না সরিলে গৃহ-প্রবেশেরও উপায় নাই। গৃহটি একদ্বারী। মহাপ্রভুর ভোগ হইলে পর গোবিন্দদাস তাঁহার পাদসম্বাহন করেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে পর আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন—ইহাই তাঁহার নিত্যক্রিয়া। এদিন মহাপ্রভুকে ঐরূপ অবস্থায় শায়িত দেখিয়া গোবিন্দদাস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "প্রভো! দয়া করিয়া পথ দিন, গৃহে প্রবেশ করি।" প্রভু আলস্যের ভাণ করিয়া, সরিয়া শয়ন করা কষ্টজনক—এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন ভক্তরাজ গোবিন্দদাস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উল্লম্ফনে প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পদ-সেবায় নিরত হইলেন। মহাপ্রভু নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু, এদিন আর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। গোবিন্দদাসও আর বাহির হইতে পারেন না। বেলা

অবসানপ্রায়। গোবিন্দদাস অনাহারে গৃহমধ্যেই উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় মহাপ্রভুর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। সশব্যস্তে উঠিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত গোবিন্দদাসকে বলিলেন—"তুমি এখনও ঘরে বসিয়া রহিয়াছ, তোমার প্রসাদ পাওয়া হয় নাই?" গোবিন্দদাস বলিলেন "কি করিয়া হয় প্রভু! আপনি যে দ্বার-রোধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, বাহির হইব কি করিয়া?" প্রভু নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সে কি? তুমি গৃহে প্রবেশ করিলে কি করিয়া? উল্লম্ফনে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলে, বাহির হইতে পারিলেনা?" গোবিন্দদাস সগর্ব্বে বলিলেন;—"সেকি প্রভু? গৃহে গিয়াছিলাম আপনার সেবার জন্য, আপনার সুখের জন্য, তাহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তজ্জন্য যদি আমার নরকে যাইতে হয়, সে যে আমার পক্ষে স্বর্গসুখাপেক্ষাও বরণীয়। আহারান্তে আপনার আলস্য হইয়াছে, তখন সরিয়া শয়ন করা আপনার পক্ষে কষ্টকর। সেবক সেবা করিতে গিয়া যদি প্রভুকে কষ্ট দেয়, তবে আর সে কিরূপ সেবা? সরিয়া শয়ন করিতে আপনার যে কষ্ট হইত, তাহার কল্পনায় আমার যে কষ্ট, তাহার তুলনায় নরক-যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ। আপনার বিন্দুমাত্র সুখের জন্য এদাস সহস্রবার নরকে যাইতে প্রস্তুত,—"গোবিন্দ কহয়ে মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হো'ক কিম্বা নরকপতন"—আর এখন বাহির হইতে হইবে শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য অকিঞ্চিৎকর নিজদেহের জন্য, এই দগ্ধ উদরের জন্য। এখন কি প্রভু, আমি এই সামান্য কারণে দেবেন্দ্রমুনীন্দ্রগণের আরাধ্য ধনকে লঙ্ঘন করিতে পারি!" ধন্য গোবিন্দদাস! ধন্য তোমার ত্যাগ! ধন্য তোমার সেবা! ভক্তপাঠকমহোদয়গণ! সাধারণদৃষ্টিতে গুরুজনকে লঙ্ঘন করাই এক মহাপাপ, কিন্তু গোবিন্দদাসের ইষ্টলঙ্ঘনকে কি বলিবেন? ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, কোন কার্য্যই পাপ বা পুণ্যের জনক নহে, উদ্দেশ্যই পাপপুণ্যের জনক। অতএব এখন দেখা যাক, অর্জ্জুন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক? অর্জ্জুনের প্রথম আপত্তি—"স্বজনবধ করিয়া আমি রাজ্যভোগ করিতে চাহিনা। ভোগ একাকী হয়না—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে সুখ-ভোগ না করিলে তাহাতে আনন্দ নাই। এই সমরে পিতা, পিতামহ, পুত্র পৌত্র শ্যালা সম্বন্ধী সকলেই উপস্থিত। ইহা-দিগকে বধ করিয়া কাহাকে লইয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করিব?" অর্জ্জুনের কথায় মনে হইতেছে যেন যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্যসুখভোগ। বিজ্ঞ পাঠক

মহাশয়! এখন আপনারা চিন্তাকরিয়া দেখুন দেখি, ভোগলিপ্সা কি বৈরাগ্যজন্য, না অনুরাগজন্য হয়? সুতরাং অর্জ্জুনের এই যুদ্ধ-নিবৃত্তির ইচ্ছা বৈরাগ্যের ফল, না অনুরাগের ফল? ইহারপর কুলক্ষয়-জন্য দোষ, গুরুবধে পাপ ইত্যাদি যে সমুদয় আশঙ্কা করিয়াছেন, ঐ সমুদয় কেবল যুদ্ধত্যাগের পক্ষসমর্থন জন্য। যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্য রাজ্যসুখভোগ, তাহাতে তাঁহার কোনই সংশয় ছিলনা। তাই তিনি ঐ সমুদয় কথার উপসংহারে বলিলেন—অহোবত মহৎপাপং কুর্ত্তুং ব্যবসিতাবয়ং, যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ—রাজ্যসুখ-লাভের আশায় স্বজনবধে প্রবৃত্ত হইয়াছি! হায়! হায়! আমরা কি মহাপাপের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইয়াছি! স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে, ইহা বৈরাগ্যের কথাই বটে, সত্যই পাপভয়ে রাজ্য-সুখভোগে বিরাগ। বাস্তবিক ইহা প্রকৃত বিরাগ নহে। মোহবশতঃ যে বিরাগ, তাহা তামসিক এবং কায়ক্লেশভয়ে যে বিরাগ উহা রাজসিক। ঐ উভয়কে প্রকৃত বিরাগ বলা যায় না। রাজসিক তামসিক বিরাগ কার্য্যের প্রতিই উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাহাতে লোক নিষ্ক্রিয় জড় হইয়া যায়। সাত্ত্বিক বিরাগ কার্য্যের পর হয় না, ফলের প্রতিই হয়, সুতরাং তাহাতে লোক নিষ্ক্রিয় জড় হয় না, পরন্তু ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতই হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের এ বিরাগ সাত্ত্বিক নহে, কারণ যুদ্ধরূপ কার্য্যের প্রতিই তাঁহার বিরাগ, উহার ফলের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগই ছিল, কিন্তু স্বজন-বধ করিয়া সে ফললাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মুখে বৈরাগ্যাভাস দেখাইতেছিলেন। পরে যখন শ্রীভগবানের উপদেশে প্রকৃত সাত্ত্বিক-বৈরাগ্য-লাভ হইল, তখনই দৃঢ়স্বরে বলিলেন;—নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদা-ন্ময়াচ্যুত, স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যেবচনং তব;—সুতরাং বৈরাগ্যপ্রধান ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণই যে বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ, একথা বলা যায় না। রাজা যদি অত্যধিক বিষয়াসক্ত হন, তাহা হইলেই রাজত্ব ছারখার যায়। বিবেক ও বৈরাগ্য যে রাজার মন্ত্রী, ও সেনাপতি, তিনি ত্রিজগতের অজেয়। পক্ষান্তরে মোহ ও আসক্তি যাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতি, তিনি সর্ব্বত্রই পদে পদে পরাজিত. ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। প্রাচীন-কালের রাজা রাজসিংহাসনে বসিয়াও সন্ন্যাসী, অসিহস্তেও সকরুণ, স্ত্রীকদম্ব-পরিবেষ্টিত হইয়াও ঘোর বিরাগী। এই সমুদয়গুণে ভূষিত ছিলেন বলিয়াই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইতে পারিয়াছিলেন।

আর কালপ্রভাবে যখন বিবেক-বৈরাগ্যের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ-নিষেধ হইল, উহা যখন কতিপয় নিরন্ন ব্রাহ্মণ, ও ভিখারীর ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল, রাজপ্রাসাদ যখন ভোগবিলাসের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল, তখনই আর্য্যের রাজমুকুট পরের পদচুম্বন করিতে বাধ্য হইল। অম্বরীষ, জনক প্রভৃতি পৌরাণিক রাজার কথা ছাড়িয়া দিলাম। রাণা প্রতাপ, ও শিবাজীর ন্যায় ভোগবিলাসশূন্য, কঠোরকর্ম্মা বৈরাগ্যবান্ নৃপতি খুবই বিরল এবং তাঁহাদের ঐ গুণ ছিল বলিয়াই প্রবলপ্রতাপ মোগলসাম্রাজ্যের সময়ও স্বাধীনতারক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ঐ গুণের অভাবেই শম্ভুজি, সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি অল্পকালেই রাজত্ব হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৈরাগ্য সত্ত্বগুণের কার্য্য, সুতরাং সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক পরস্বাপহরণ করিতে পরাঙ্মুখ হন বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধে কখনই কুণ্ঠিত নহেন। পরাঙ্মুখতা তামসিকের লক্ষণ। সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিনগুণের দ্বারাই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার চলিতেছে। এই তিনগুণের তিনটি ঠাকুর আছেন। তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই আমার কথার কিছু সার্থকতা আছে কিনা বুঝা যাইবে। রজোগুণের ঠাকুর ব্রহ্মা; কার্য্য সৃষ্টি, স্বভাব-শিষ্টশান্ত জপতপনিরত; ঠিক যেন ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যমহাশয়। তমোগুণের ঠাকুর রুদ্র; কার্য্য--সংহার, স্বভাব--কভু শান্ত কভু রৌদ্র, ধ্যানমগ্ন মহাযোগী। সত্ত্বগুণের ঠাকুর বিষ্ণু; কার্য্য পালন, হস্তে তীক্ষ্ণধারচক্র, সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত, সর্ব্বদা অসুরশোণিতে ধরাপ্লাবিত করিতেছেন! মহামূল্যরত্নালঙ্কার-মণ্ডিত, মৃগমদচন্দনচুয়াচর্চিতদেহ; দেখিলেই ভোগী বলিয়া মনে হয়। ইহা দেখিয়াও কি বলিব যে সত্ত্ব-প্রধান বা বৈরাগ্যপ্রধান ধর্ম্ম আশ্রয় করাতেই উহা আমাদিগকে যুদ্ধপরাঙ্মুখ নিষ্ক্রিয় জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে। উহার অভাব বা ব্যভিচারই আমাদিগকে ওরূপ করিয়াছে। একের বিনাশ ব্যতীত অপরের পালন বা পোষণ সম্ভব নহে, এবং সত্ত্বগুণের কার্য্যই যখন পালন বা পোষণ, তখন সত্ত্ববহুল ধর্ম্ম কখনই যুদ্ধাদির অন্তরায় হইতে পারে না। তবে সেটি ন্যায়যুক্ত, ধর্ম্মযুক্ত হওয়া চাই। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈরাগ্যপ্রধান হইলেও উহা সামাজিক উন্নতির অন্তরায় নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেও "অহিংসা পরমধর্ম্ম" বলিয়া ঘোষিত হয়, কিন্তু ঐ বৌদ্ধযুগে ভারতের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, কলিপ্রবৃত্ত হওয়ার পর আর কদাপি সেরূপ উন্নতি হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তবে যে কার্য্যক্ষেত্রে

অনেকে জড়ত্বের পরিচয় দেন, সেটি ধর্ম্মের দোষ নহে, ব্যক্তিরই দোষ। প্রতিবাদিগণ হয়ত বলিবেন "প্রোক্তরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মে আমরা কোনই দোষারোপ করিতেছি না, কিন্তু মহাপ্রভু কি এবম্বিধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক? বোধ হয়-না। উহা যিনি গীতার বক্তা, কুরুক্ষেত্রের অভিনেতা, বসুদেবের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ধর্ম্ম। মহাপ্রভুর সম্প্রদায় তাঁহার বড় বিশেষ খাতির করেন না। তাঁহারা নন্দনন্দনেরই উপাসক। সেখানে বাঁশী, চাঁদের আলা, ফুলের মালা, রাসলীলা, মাঝে মাঝে বিরহজ্বালা, মানের পালা, আর বসনচুরি, ননীচুরি, মনচুরি প্রাণচুরি, সবশেষে চোরের পরে বাটপাড়ী, চোরের হ'ল সর্ব্বস্বচুরি ধ্বণী হ'লেন শ্রীহরি, তারই ফল নাকি গৌরহরি। তিনি প্রেমময়, তিনি মধুময়, সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহের স্থান নাই। তবে যে অঘাসুর, বকাসুর, প্রভৃতির নিধনসংবাদ শাস্ত্রে বর্ণিত শুনাযায়, সেটি নন্দনন্দনের কার্য্য নহে; নন্দনন্দনের মধ্যে বসুদেবনন্দন লুক্কায়িত থাকিয়া ঐ সমুদয় নৃসংশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; —"বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণকরে অসুর-নিধন"— (চৈঃ চরিতামৃত) বসুদেবনন্দন ও নন্দনন্দন গোস্বামিগণের মতে এক নহে;—কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তুগোপেন্দ্রনন্দনঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যপাদমেকং নগচ্ছতি"—আবার গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তে কান্তভাবে ভগবদ্ভজনাই ভজনার সার—আবার—"সখী বিনা এইলীলায় অন্যের নাহি গতি। সখীভাবে সেই তারে করে অনুগতি। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেইসাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"—সুতরাং এই পরুষ পুরুষভাব লইয়া সেই সুরস মধুরভাব—সাধনার সম্ভাবনা নাই। ঐ সাধনা করিতে হইলে হৃদয় হইতে পুরুষভাবগুলি সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহার স্থানে নারীভাব সকল স্থাপন করিতে হইবে যথা;—আত্মানং চিন্তয়েত্তত্রতাসাং মধ্যে মনোরমাং রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং"—(সনৎকুমারতন্ত্র) নিজেকে পরমরমণীয়রূপসম্পন্ন, কিশোরী ও প্রমদাকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদেহপ্রাপ্তিই বৈষ্ণবসাধকের ভজনদেহের শেষ পরিণতি এবং ইহাই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম গীতামুখে বাসুদেব-প্রচারিত। এই শেষোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা-প্রভাব দেশকে তেজোহীন নারীজনসুলভ কোমলস্বভাব করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর ঐ ভাবের প্রয়োজন নাই। এখন

যাহাতে পুরুষভাব উদ্দীপিত হয়, তাহাই আমাদের প্রয়োজনীয়।" সত্য, মহাপ্রভু শেষোক্তভাবের সাধন-ভজনার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ভাবেরও তিনি বিরোধী ছিলেন না। প্রথমাধিকারীর পক্ষে প্রথমভাবে এবং চরমাধিকারীর জন্য শেষোক্তভাবে ভজনার বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথদাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; —"না কর মর্কট-বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া। অন্তরেতে নিষ্ঠা কর বাহ্য লোকাচার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন স্বীকার"—ইহারই সারসংগ্রহ করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন; —অনাসক্তস্য বিষয়ান্‌ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ সঃ নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে"—অনাসক্ত হইয়া যাঁহারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আগ্রহই যুক্তবৈরাগ্য নামে অভিহিত। মহাপ্রভু শুষ্কবৈরাগ্যের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি এই যুক্তবৈরাগ্যেরই পক্ষপাতী এবং ইহার বিষয়ই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

লঙ্কা-বিজয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিত্রবর! নিরন্তর এ বিপত্তি-কালে
ছায়াসম তুমি মম সঙ্গী পদে পদে।"
ছুটিলেক বিভীষণ রামের নিদেশে
ধরি বিহঙ্গরূপ অতি সঙ্গোপনে—
লঙ্কাপুরে, যথা মহীরাবণ দুরন্ত
কূটমন্ত্রে ছিল রত লঙ্কেশের সনে
নিরজনে; শুনি রক্ষঃষড়যন্ত্র গুপ্ত
ত্বরিতে দিশাহারা ফিরিয়া শিবিরে,
বিবরিতে আরম্ভিল ভীষণ-বারতা
রাঘবেরে আখিনীরে ভাসিতেভাসিতে।

কহে বিভীষণ "প্রভো, নির্ম্মম নির্দ্দয়
যমদূতসম মহী, নিবসে পাতালে,
দারুণ মায়াবী, মহাদুষ্ট দুরাচার
সদা পাপাচারে রত, চরাচরখ্যাত ;
লঙ্কেশ্বর স্মরি তায় শঙ্কাতুর মনে
আনিয়াছে আজি প্রভু শঙ্কটে পড়িয়া।
হে মহাত্মা, সে দুরাত্মা আত্মজ তাহার
কত মায়া জানে, নাহি আসে গণনায়।
না করি সমর রক্ষঃ শুধু মায়াবলে
মুগ্ধ করি সর্ব্বনাশ করে সর্ব্ব-লোকে
শর্ব্বরীতে ; দুষ্টমতি অভীষ্ট সাধিতে
ওহে আর্য্য ! নাহি করে হেন কার্য্য নাই।
করেছে মন্ত্রণা স্থির, অনুজসহিত
নিশিযোগে নিশাচর করিবে হরণ
তোমায়, শুনিনু আমি থাকি সঙ্গোপনে
পক্ষিরূপ ধরি, পশি রক্ষোরাজপুরে।

মায়ায় মোহিয়া, মহী, করি অভিভূত
নিদ্রায় সবায়, হায়, প্রবেশি শিবিরে
লয়ে যাবে তোমা দোঁহে গেহে নিদ্রাবেশে
করিয়াছে স্থির ; স্থির করহ উপায়।
তা না হ'লে অনিবার্য্য সর্ব্বনাশ আজি
ঘটিবেক অবশ্যই নাহিক সংশয়।
আজি বিভাবরী যদি কাটে নিরাপদে
প্রভাতে করিব রণ রাবণের সনে।

আরো প্রভু, শুনিনু যে নিগূঢ় মন্ত্রণা
সে দুরাত্মানিকরের, শিহরিছে প্রাণ
স্মরি তাহা ; ভ্রাতৃসহ লয়ে নিজ-দেশ
পাতালে, হে মহাবাহো, পূজিয়া প্রভাতে

ঘাতকের হাতে দিবে বলিদান তরে
কালিকার শ্রীচরণে শ্রীহরি তোমায়।

শুনি বিভীষণ-মুখে ভীষণ ভারতী
মহামতি দাশরথি মতিচ্ছন্নপ্রায়,
হায়রে —অম্বর-পথে ঘোর মেঘমন্দ্র
অথবা অশনি-নাদ বিজলীজড়িত
শুনিয়া চমকে পান্থ প্রাণান্ত গণিয়া
যেমতি, সে রঘুপতি ভাবনা-সাগরে
ভাসিলেন ; সেনাগণ অবসন্নকায়
—মৃতপ্রায় ; আশঙ্কায় নিস্পন্দ নীরব।

উঠিলেক ঘোরতর চিন্তার তরঙ্গ
সৈন্য-পারাবারে, শ্বাস প্রলয়পবন,
হুতাশ বাড়বানল জ্বলিল সে জলে ;
বিশ্ব যেন পরিণত অনন্ত শ্মশানে ;

মনে হ'ল রাঘবের ক্রোড়ের কাহিনী
শত শত, বালিবধ, বাহিনীসংগ্রহ,
অসংখ্য রাক্ষসনাশ, জলধি-বন্ধন,
মহারণ, নিদারুণ স্বপনের মত।

ভাবিলেন রঘুপতি দুর্ম্মতির সনে
কেহ না সমর্থ হবে আত্ম রক্ষিবারে।
এ নহে সম্মুখরণ, পরাঙ্মুখ যায়
নহি মোরা ; কিন্তু পাপী পশি ছদ্মবেশে
সাধিবে দুষ্কর কর্ম্ম অধর্ম্ম আচারি,
মোহিয়া মোহিনী-মন্ত্রে বিনা সমরবে।
অবসন্ন প্রাণ, এই আসন্ন সঙ্কট
স্মরি, অরি-নিসূদন শ্রীমধুসূদন।

কতক্ষণ পরে তবে দুঃখ সম্বরিয়া
সম্বোধিয়া বিভীষণে কহেন কাতরে—

"আমি মরি দুঃখ নাহি ওহে রক্ষোবর!
রক্ষঃকারাগারে দুঃখে কাটাক্ জীবন
আজীবন সে জানকী জনক-নন্দিনী,
ঘোষুক কলঙ্ক তার ত্রিভুবনব্যাপী
চিরকাল; কিন্তু মিত্র! কর সদুপায়
কেমনে রক্ষিবে ভাই লক্ষ্মণের প্রাণ।

চতুর্দ্দশবর্ষকাল হয়েছে পূর্ণিত
হায়, মা ঊর্ম্মিলাবধূ সুমিত্রা জননী
ভাসিছেন অহর্নিশি আহ্লাদ-সলিলে
আশার; মিলাবে বিধি বক্ষোনিধি পুনঃ
অচিরে; কিন্তু হে সখে, শুনিবেন যবে
ধীমান শ্রীমান্ হায় চিরনিদ্রাগত
ঘোরতর রক্ষো-রণে রাঘবের সনে,
কেবা প্রবোধিবে সুধি সে সঙ্কটকালে
তাঁহাদের; আর্ত্তনাদ অভিশাপসহ
ভ্রমিবে এ অধমের অন্বেষণ করি
আঁধার রৌরবে, যবে প্রবেশিবে পাপী
কৃতান্তের অঙ্কে উঠি অনন্ত আঁধারে"।

এইরূপে বিবরিয়া ক্ষোভের কাহিনী
মহাশোকে মহামতি, হায়, দাশরথি
নীরবিলা, দীনহীন বালক যেমতি
জানায়ে প্রাণের ব্যথা মাতার সমীপে।

শুনি রাঘবের এই ক্ষোভের কাহিনী
কহে হনু মুহুর্ম্মুহুঃ বাহু আস্ফালিয়া
"থাকিতে কিঙ্কর মোরা, কি শঙ্কা তোমার?
বিনাশিয়া কুলাঙ্গারে নিঃশঙ্ক করিব
তোমায় হে আজিকার নিশী জাগরিয়া
সবে মেলি; এ প্রতিজ্ঞা ওহে বিজ্ঞবর!

তুচ্ছ ত মহীর কথা বিশ্বপাতা যদি
আসেন সে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বের আরাধ্য
অবধ্য, কি সাধ্য কহ পশিবে শিবিরে
কিম্বা পরশিবে ওহে ধীমান্ তোমায় ?

বর্দ্ধিল এগোলাঙ্গুল লাঙ্গুল, হে নাথ,
শতেকযোজনব্যাপী, বিরচিব ব্যূহ
গুহাসম, প্রবেশ হে নিবেশে এখনি,
রহিল রক্ষকরূপে দ্বারদেশে দাস
জাগি সারা নিশী, রক্ষোরথী বিভীষণ
ভ্রমিবেন চক্রাকারে, শিবিরের পাশে
জাগিবে সমগ্র সেনা গ্রহফল সম
নিগ্রহীতে রাক্ষসেরে ভিতরে বাহিরে ;
দেখিব সে দুরাচার পশে কোন্ ছলে !"

পশিলেক ব্যূহ মাঝে বানর নিকর
দলে দলে ; কুতূহলে রাঘবের সনে
মত্ত প্রায় ; তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে যথা
তরঙ্গ মিশায় যায় উৎসঙ্গ লভিতে।

প্রহরীর রূপে—করে ভীম প্রহরণ
জাগয়ে দুয়ারে হনু ; শূলপাণিসম
শূল হস্তে বিভীষণ, ভীষণ আকৃতি
—ব্যতিব্যস্ত দস্যুভয়ে গৃহস্থের মত
ভ্রমিতে লাগিল গর্ব্বে নিখর্ব্ব সংখ্যক
সেনাগণ, বিচক্ষণ বিরাম নিদ্রার।

কিন্তু হে পুরুষকার জয় লভে কোথা
কোন্ কালে মহাবল দৈববল কাছে ?
নিশী অবসানে হেরে প্রহরি নিকর
মূর্চ্ছিত সে ব্যূহ, রামলক্ষ্মণবিহীন।

উঠিল ক্রন্দন-রোল ঘোর কোলাহলে
সেনাদলে ; অশ্রুধারে তিতিল বসুধা
ক্রন্দনের ; হায় যথা জনক-জননী
নাহি হেরি রুগ্ন শিশু অন্তিম-শয্যায়
শায়িত, অজ্ঞাতে যবে লয়ে যায় ধরি
শ্মশানে স্বজনগণ বিসর্জ্জন দিতে ;
কিম্বা যথা বিহঙ্গম করে আর্ত্তস্বর
আপন শাবকশূন্য নীড় নিরখিয়া
বিষাদে ; অথবা চোর পশি গৃহ মাঝে
নিদ্রিত গৃহীর যবে সর্ব্বস্ব হরিয়া
লয়ে যায়, শূন্যগৃহ নেহারি গৃহস্থ
অকস্মাৎ কাঁদে যথা জাগিয়া প্রভাতে।

কে কারে নিবারে এবে সবে আত্মহারা
নিষাদের শরবিদ্ধ বিহঙ্গম সম
অথবা ধীবর-ধৃত বদ্ধ বাগুরায়
মীনপ্রায়, ধরাতল ভরিল ক্রন্দনে !
কাঁদিল অমরবৃন্দ বৈজয়ন্তধামে
বাসবের সনে হায় রাঘবের সনে
বিফল ; সফলকাম রাক্ষস-ঈশ্বর
লঙ্কেশ্বর, সুকৌশলে স্বকার্য্য সাধিয়া।

ক্ষণ পরে মহারোষে পরুষ বচনে
কহে বিভীষণে ধরি ভীষণমূরতি
মারুতি ;—আরক্তবক্ত্র, আরক্ত নয়ন
উদিত ভূতলে যেন সহস্র ভাস্কর
তেজস্কর—"পশিলি যে রে পিশিতাশন,
রঘুকুল-সরোজেরে—অনুজসহিত
সন্ধানিতে এই মাত্র মিত্ররূপে তুই ;
তবে এ শিবির শূন্য কিসক্ত রে এবে ?

মক্ষিকাও প্রবেশিতে অক্ষম যথায়,
কে সাধিল পশি সেথা হেন সর্ব্বনাশ
তুই বিনা ? অবিলম্বে আন্ সীতানাথে
চাহিস্ যদ্যপি হিত, কপটসুহৃৎ
আপনার ; তা'না হলে নথি এই দণ্ডে
(দুঃখ মনে সরমার বৈধব্য ঘটিবে)
নিশ্চয়ই সাধিব রাঘবের শোক
নিদারুণ ; এই স্থির প্রতিজ্ঞা আমার।

ছাড়িনু দুয়ার, তোরে আত্ম মানি মনে
নিরাপত্তি, তা'না হ'লে এ বিপত্তি-কালে
রাবণের (অনুমান বর্ত্তমানে) কভু
পারিতিস্ প্রবেশিতে কিম্বা বাহিরিতে
স্ব-ইচ্ছায় পাপাশয় পুনরায় তুই
প্রাণ ল'য়ে তস্কর ক্রুর আচারি !
মিত্ররূপী ওরে শত্রু, রে অনৃতবাদি,
আচতায়ি-অগ্রগণ্য, সৌজন্য দেখায়ে
এইজন্য সঙ্গে ছিলি ? সুযোগ সন্ধানি
উদ্ধারিতে কার্য্য ? আর্য্য দয়ার সাগর,
তাই দিয়াছিল তোরে নিরাশ্রয় পাপি
—বিপন্ন শরণাপন্ন শ্রীচরণে স্থান।

শিষ্ট আচরিয়া তুষ্ট করিয়া শ্রীনাথে
অনাথের প্রায় তার ছলিলি কৌশলে
অবশেষে ? কালসর্প, করিলি দংশন
আশ্রয়-দাতায় ছেদি কৃতজ্ঞতা-পাশ ;

সত্য বটে, পুরাতে যে রাজ্যের লালসা
ভাসিয়া দুরভিসন্ধি-সিন্ধুর সলিলে
অগ্রনাশিকরে করে স্বকরে সংহার
স্বতন্ত, সংসারে তার কিবা অসম্ভব ?"

বাড়ব-অনল, কিংবা গৈরিক নিস্রাব
অগ্নিময়, বিঁধিলেক বিভীষণপ্রাণে
পাবনির বাক্যবাণ, প্রহরণসম
খরধার; মহাদুঃখে কহে রক্ষাগুরু
শুনি পাবনির উক্তি কাকুক্তি-প্রচুর
শোকভরে ভগ্নকণ্ঠে গদগদস্বরে ;—

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত।

বলিদান-সমাধান।

দ্বিতীয়বল্লী।

প্রথমবল্লীতে বলিদানবিধান যথাশাস্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বল্লীতে সেই পশুবলিদানের অনুষ্ঠাতার বা অধিকারীর বিষয় আলোচিত হইবে। যেমন ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রধানতম সাধন প্রাণ, আবার সেই চতুর্ব্বর্গের সাধনীভূত প্রাণ যেমন দেহের একমাত্র আশ্রয়, সেইরূপ শুভাদৃষ্টের জনকীভূত বলিদানও একমাত্র অধিকারিসাপেক্ষ। বলিদান আধেয়, অধিকারী আধার। অধিকারীই সর্ব্বশাস্ত্র-শাসনের একমাত্র প্রতিপালক। বিধিসমূহ অধিকারী দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে, ইহা বিশ্বের চিরন্তন নীতি। অধিকারির অভাব ঘটিলে বিধি বিহিত হইতে না পারিয়া অনাশ্বাসবিষয় বা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কোনও বিধি নিরালম্বে প্রতিপালিত হইতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্র এই তিনের অপেক্ষা করে বলিয়াই বিধির স্বরূপতঃ ব্যবহারে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। যে বিধি প্রতিপালিত হইতে পারেনা, তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আধার না থাকিলে আধেয় নিরাশ্রয় হইয়া যেমন কোনরূপেই স্বীয় অস্তিত্বরক্ষা করিতে পারে না, বিধিও সেইরূপ অধিকারী হারাইলে স্বীয় অস্তিত্ব-রক্ষা করিতে পারে না। অনুষ্ঠাতার অভাব হইতে অনুষ্ঠেয়ের স্বরূপাপত্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব অধিকারীই বিধির বিধিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। আধিকার্য্যের মীমাংসা করিতে হইলে অধিকারীর মীমাংসা স্বতই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শাস্ত্রবিধিবিচারে অনুষ্ঠাতার বিচারেই সমাধান পাইয়া

যায়। তাদৃশ অধিকারীর অভাবে তাদৃশ অধিকার্য্যেরও অভাব হইয়া যায়। বৈধহিংসা-বিধির অধিকারি-নির্ণয়ই বর্ত্তমান বল্লীতে আলোচ্য বলিয়া যথাজ্ঞান যথাশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বিশ্ববিরচন-ক্রমে জাগতিক পদার্থের গুণাদি, জীবজগতের ধর্ম্ম, বিধিস্বরূপ, বিধিভেদ, হিংসা, বৈধহিংসা ঐ হিংসার পূজাদিতে ব্যাপ্তি এবং অধিকারিনির্ণয় ইত্যাদি বিষয় বিচার-সৌকর্য্যার্থে প্রথমবল্লীবৎ গুরুশিষ্যসংবাদরূপে আলোচিত হইয়া শেষ বল্লীতে "বলিদান-সমাধান" রূপে আপাতবিরুদ্ধপ্রতীয়মান প্রমাণসমূহ যথাজ্ঞান মীমাংসিত হইবে।

বিশ্ব-সৃষ্টি।

শিষ্য। গুরো, গতকল্য রাত্রি অধিক হওয়ায় অধিকারিনির্ণয় হয় নাই। যদি অদ্য আপনার কার্য্যক্ষতি না হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা নির্ণয় করিলে কৃতার্থ হই।

গুরু। বৎস! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে কখনও ঔদাসীন্য করি নাই, অদ্যও করিব না। দেখ বৎস! অধিকারি-বিনির্ণয় অতি জটিল ব্যাপার, সুতরাং বিশেষ ধৈর্য্যের আবশ্যক। ইহার পূর্ব্বে জগৎসৃষ্ট্যাদি কতিপয় বিষয় আলোচনা করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করি।

শিষ্য। গুরো! আমারও এই বিষয় শুনিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে, অতএব এই বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।

গুরু। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে স্থূলরূপে দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়াছে যথা—"প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চ ষোড়শকঃ তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ সাংখ্যদর্শন ২২ কারিকা॥ "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোহহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ম্ তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি॥ সাংখ্যসূত্র ১।৬১॥— সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে ষোড়শতত্ত্ব, তন্মধ্যে অপকৃষ্ট পঞ্চতত্ত্ব হইতে (স্থূল) পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে॥ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও (জ্ঞান ও কর্ম্ম) উভয় ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে॥ এইরূপে স্থাবরজঙ্গম-নদনদী-ভূধর-সাগর-গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য্য-সমন্বিত বিচিত্র বিশ্ব, সত্ত্ব রজ ও তমোগুণান্বিত হইয়া রহিয়াছে। কার্য্যদ্বারা কারণানুসন্ধান

সহজেই হইয়া থাকে, তাহা সাংখ্যসূত্র বলেন:—"স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য" ॥১।৬২॥ স্থূল পঞ্চভূতের সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদে শান্তঘোরমূঢ়রূপ কার্য্য হইতে পঞ্চতন্মাত্র-জ্ঞান হয়॥ সুতরাং ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণু ত্রিগুণাত্মক।

শিষ্য। গুরো। জগৎসৃষ্টির বিষয় আমার আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই। জীবজগৎ সম্বন্ধে বিশেষতঃ মানবের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতধর্ম্ম বিষয়ে জানিতে অভিলাষ হইতেছে।

গুরু। বৎস! স্থূলতঃ জীবের বাহ্যধর্ম্ম চারিটী বলা যাইতে পারে যথা,—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এবং আভ্যন্তর বা আন্তরধর্ম্ম বা গুণ তিনটী যথা, সত্ত্ব, রজ, তমঃ। জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য, স্বাভাবিক বাহ্য ও আন্তরধর্ম্ম-গুণগুলির তারতম্যানুসারে প্রধানতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ সাত্ত্বিক, রজোগুণের উৎকর্ষহেতু রাজসিক এবং তমঃপ্রাবল্যবশতঃ তামসিক হইয়া থাকে। স্থূলতঃ স্বাভাবিক পার্থক্য এইরূপেই হইয়া থাকে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, গুণ-বৈষম্যই তত্তদ্‌গুণপ্রাধান্যের কারণ। গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন:——

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃসত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১৪ অঃ ॥

সত্ত্বগুণ, রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়; রজোগুণ, তম ও সত্ত্বকে এবং তমঃ, সত্ত্ব ও রজ অভিভূত করিয়া প্রকাশ পায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি বা স্বভাবহিসাবে মনুষ্য স্বভাবসাত্ত্বিক, স্বভাবরাজসিক ও স্বভাবতামসিক এবং এই গুণত্রয়ের অবান্তরভেদে গৌণরূপে নানাপ্রকৃতির হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলরাম বিদ্যারত্ন সাংখ্যভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোকবার্ত্তা। গত ৩০ ভাদ্র দশানীর অক্লান্তকর্ম্মা মহাত্মা চন্দ্রকান্ত দাস মহাশয় অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। চন্দ্রবাবু কর্ম্মের

অবতার ছিলেন। তিনি উদ্যম, সহিষ্ণুতা, বিবেকিতা ও সাধুতার সম্বল লইয়া সদ্ভাবে কার্য্য করিয়া আশাতিরিক্ত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবাবুর জীবনেতিহাস দেশের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার অকালপ্রয়াণ দুঃখকরই বটে।

নির্ব্বাচনে বিভাগ। যশোহরজেলা হইতে বেঙ্গলকাউন্সিলের জন্য যে দুইজন অমুসলমান্ সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের একজনের নির্ব্বাচন করিবেন উত্তরযশোহরের ভোটারগণ এবং অপর একজনের নির্ব্বাচন করিবেন দক্ষিণযশোহরের ভোটারগণ। যশোহর সদর ও নড়াইলমহকুমা দক্ষিণ-যশোহর, আর মাগুরা, বনগ্রাম ও ঝিনাইদহ-মহকুমা উত্তরযশোহররূপে বিবেচিত হইয়াছে। এত বিভাগবাহুল্য অসুবিধাকরই হইয়া থাকে।

মহাত্মা গান্ধি ও সহযোগিতাবর্জ্জন। মহাত্মা গান্ধি ও তাঁহার অনুবর্ত্তন-কারীরা কৃতযত্ন হইয়া বিশেষকংগ্রেসের শেষসময়ে বহুসংখ্যক প্রতিনিধির প্রস্থানের পর সহযোগিতাবর্জ্জন-প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছেন। প্রাচীন-কংগ্রেসসেবকেরা অনেকেই ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদী ছিলেন, তথাপি ভোটের জোরে গান্ধিপন্থিগণের জয়লাভ হইয়াছে। সহযোগিতাবর্জ্জন কার্য্যতঃ অস-ম্ভব ও অকল্যাণকর, ইহা পরে বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

ত্যাগের দুইদিক্। সহযোগিতাবর্জ্জননীতির অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত পেটেল প্রভৃতি কাউন্সিল ত্যাগ করিলেন, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কাউন্সিলে প্রবেশপ্রার্থী হইবেন না—ঘোষণা করিলেন, কোনও কোনও উকীল-মোক্তার ব্যবসায় ছাড়িলেন, অন্যদিকে পণ্ডিত গোকর্ণনাথ, শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি, সহযোগিতা-বর্জ্জন-সমর্থক কংগ্রেস্ ত্যাগ করিলেন। দুইদিকেই ত্যাগ। উভয়তঃপাশারজ্জুঃ।

সাধুজীবনের মহাপ্রয়াণ। দিনাজপুরের মহাপ্রাণ পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় গত ১৯ ভাদ্র দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিতধামে গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত ভুবনমোহন একজন খাঁটী মানুষ ছিলেন। আজীবন পরোপকারে জন-সেবায় তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার অভাবে দরিদ্রেরা একজন অকপট বন্ধু হারাইয়াছে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড
৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক।

১৩২৭ সাল।
১৮৪২ শকাব্দ।

ক্ষমা ভিক্ষা।

রূপবিবর্জ্জিত প্রভু তুমি নিরাকার
করিয়াছি ধ্যানে আমি রূপের বর্ণনা
রহিয়াছ ব্যাপি তুমি ব্রহ্মাণ্ড মাঝার
করিয়াছি নষ্ট, তীর্থ করিয়া কল্পনা।
বাক্যাতীত, আনিয়াছি বাক্যের ভিতর
এই দোষত্রয় মোর ক্ষমিও ঈশ্বর।

শ্রীপশুপতি সরকার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) মূঢ়া (অবিবেকিনো) জন্মনি জন্মনি (প্রতিজন্মে) আসুরীং যোনিং আপন্না (প্রতিপন্না) মাং (ঈশ্বরং)

অপ্রাপ্য এব ততঃ (তস্মাদপি) অধমাং (নিকৃষ্টতমাং) গতিং যান্তি (অধো-গচ্ছতি) ২০

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন তাদৃশ মূঢ় ব্যক্তিরা প্রতিজন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়। আমাকে না পাইয়া ক্রমশ অধোগতি লাভ করে। ২০

আলোচনা। পাপে পাপ বৃদ্ধি পুণ্যে পুণ্য বৃদ্ধি উভয়েই ক্রমোন্নতির পথ। তমোগুণ আসুরীগুণ, তমোগুণিপুরুষের বিবেক ও ভক্তির অভাব। বিবেক ভক্তি ভিন্ন পুণ্যপথে চলিবার উপায় নাই। সুতরাং একবার দুষ্টপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুপথে উঠা দুর্ঘট। পাপবুদ্ধির আপনা আপনি সৎকার্য্যে মতি হয়না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবানে আদৌ ভক্তি হয়না। অতএব বুদ্ধিমানগণ বিচারপূর্ব্বক তমোগুণের আস্পদ আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় দৈবীসম্পৎ লাভে সচেষ্ট হইবেন। ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কাম ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥

সান্বয়ব্যাখ্যা। উক্তানামাসুরদোষানাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষ ত্রয়ং বর্জ্জনীয়মিত্যাহ কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ (ইতি) ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং (অতএব) আত্মনো নাশনং তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। ১২

বঙ্গানুবাদ। জীবের অধোগতির কারণ কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার স্বরূপ অতএব ইহাদের পরিত্যাগ করিবে। ২১

আলোচনা কাম ক্রোধ লোভ প্রভাবে মানবগণ সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। দোষের মধ্যে এই তিনটী দোষই মানবের প্রধান শত্রু। কারণ ইহারা আপাততঃ সুখকর। আপাত সুখই মনুষ্যকে পরিণামসুখে বঞ্চিত করে, অতএব বুদ্ধিমান্ বিচারপূর্ব্বক যত্ন সহকারে এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবেন। সৎসঙ্গ এবং সৎগ্রন্থ আলোচনা এই তিনটী শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায়।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়—তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচারত্যাত্মনঃশ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) তমোদ্বারৈঃ (তমসঃ নরকস্য দ্বার ভূতৈঃ) এতৈঃ ত্রিভিঃ (কামাদিভিঃ) বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ। শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ সাধনং শাস্ত্র বিহিতং কর্ম্মাদিকং তপোযোগাদিকং) আচরতি (অনু-তিষ্ঠতি) ততঃ (তেনৈব অনুষ্ঠানেন চিত্তশুদ্ধিদ্বারেণ) পরাং গতিং (মোক্ষং যাতি প্রাপ্নোতি। ২২

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন নরকের দ্বারস্বরূপ এই কাম ক্রোধ লোভকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য শ্রেয়ঃ সাধনপূর্ব্বক পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে। ২২

আলোচনা। যিনি সদসৎ কর্ত্তব্য বিচার পূর্ব্বক আপাততঃ তৃপ্তিকর কামাদি এই শত্রু তিনটীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনি উত্তোরোত্তর জন্মে পুণ্য পথের পথিক হইয়া শ্রেয়ঃ গতি মোক্ষ লাভের অধিকারী হন। ২২

যঃশাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম চারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। কামাদি ত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভব ইত্যাহ। যঃ শাস্ত্রবিধিং (শাস্ত্রং বেদ স্মৃত্যাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রং তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান কারণং বিধিনিষেধাখ্যম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) কামচারতঃ (যথেচ্ছং) বর্ত্ততে স সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং চিত্তশুদ্ধিং) ন অবাপ্নোতি (ন প্রাপ্নোতি) ন সুখং ন চ পরাং গতিং (মোক্ষং প্রাপ্নোতি) ২৩

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় না, সুতরাং ইহলোকে সুখলাভ ও পরলোকে মুক্তিলাভ হয় না। ২৩

আলোচনা। স্বধর্ম্মাচরণ ব্যতীত কামাদি ত্যাগ অসম্ভব। বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি নিষেধ শাসনই মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়ামক শাস্ত্র, শাসনই মনুষ্যকে কর্ত্তব্যপথে গতি চালন করে। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির উপায়, যাহারা সেই শাস্ত্র বিধান লঙ্ঘন করিয়া আপন ইচ্ছামত আপাতঃ সুখকর কার্য্য করে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে শান্তি ও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

সান্বয় ব্যাখ্যা। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (ইদং কার্য্যং ইদং অকার্য্যং ইত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং) শাস্ত্রং (বেদস্মৃতি প্রমাণাদিকং) তে প্রমাণং (অতঃ) ইহ (কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ সন্) শাস্ত্রবিধানোক্তং (কর্ম্ম) জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি (যোগ্যোভবসিঃ) ২৪

বঙ্গানুবাদ। অতএব শাস্ত্রানুসারে কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ করিয়া শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। ২৪

আলোচনা। কোনটী কার্য্য কোনটী অকার্য্য শাস্ত্রই তাহার প্রমাণস্বরূপ এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে কার্য্য না করিলে কার্য্যসফল হয় না ! এবং অকার্য্যে আসক্ত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি শাস্ত্র বিধি অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া ঐহিক সুখ স্বর্গ-ফলও অপবর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। যাহা শাস্ত্র বিহিত এবং কার্য্যক্রম ধর্ম্মরূপ তাহা তোমার আপাত রুচিকর হউক বা না হউক তাহার অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। তাহাই তোমার কল্যাণকর হইবে। ২৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতানূপনিষৎসুযোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে দেবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগনাম।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

সীতাউদ্ধার।

দেহলঙ্কামাঝে ওগো নিকষা-মায়ার
জনমিল এককন্যা দুইটী তনয়,
জ্যেষ্ঠপুত্র মোহ নাম রাবণ দুর্ব্বার
কুম্ভকর্ণ তম, যার নিদ্রা অতিশয়।

কলহরূপিণী কন্যা সূর্পনখা আর
ভীষণা মূরতি ধরি ভ্রমে এ ভুবন
একদা প্রভাব হেরি ভকতি সীতার
তাহারে হরিতে মোহে করে নিবেদন।

তাই মোহ ভক্তি-সীতা করিয়া হরণ।
দুর্দ্দশা করিল যবে অশেষ প্রকার
কর্ম্ম হনুমান তাহা করি নিরীক্ষণ
পরমাত্মা রামে ডাকে কাঁদি অনিবার।
আর কি থাকিতে পারে গুণনিধি রাম
উদ্ধারিলা ভক্তি সীতা আসি লঙ্কাধাম।

শ্রীপশুপতি সরকার।

ষট্চক্র নিরূপণ।

প্রথম অধ্যায়।

তন্ত্র অনুসারে ষটচক্র নাড়ীচয়।
পরমানন্দের তরে কহি ক্রমাম্বয় ॥
ইড়া ও পিঙ্গলা নামে খ্যাত নাড়ীদ্বয়।
মেরুদণ্ড বাহিরেতে বাম দক্ষে রয় ॥
শশিসূর্য্যসম হয় উভয়ের জ্যোতিঃ।
সুষুম্না মেরুর মধ্যে করে অবস্থিতি ॥
চন্দ্রসূর্য্য অগ্নিরূপা ত্রিগুণা-সে হয়।
স্ফটিক ধুস্তুর পুষ্প সদৃশী নিশ্চয় ॥
মূলাধার পদ্ম হতে শিরোপরি স্থিত।
সহস্রদলকমলে সুষুম্না বিস্তৃত ॥
সুষুম্নার মধ্যস্থল-ছিদ্র মধ্য দিয়া।
প্রবেশে বজ্রাখ্যা নাড়ী তথা শিরে গিয়া ॥
মেঢ্রদেশ মূলধার জানিবে নিশ্চয়।
প্রদীপ্তা এ নাড়ী তথা দীপশিখা প্রায় ॥
বজ্রানাড়ী মধ্যস্থলে চিত্রিণী সুস্থিতা।
যোগীগণ বোধগম্য প্রণব জড়িতা ॥
লতাতন্তু সম সূক্ষ্ম, মেরুদণ্ড মাঝে।
ষট্পদ্ম ভেদকরি চিত্রাণী বিরাজে ॥
শুদ্ধ বুদ্ধি বিনা এই নাড়ীর বিষয়।
সহজে কেহই কভু বিদিত না হয় ॥
তার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মূলাধার স্থিত।
হরমুখ গর্ভ হতে সহস্রারে নীত ॥
ইহাতে মন সংযোগে সুষম্না কম্পিত।
তাহাতে অখিল দেহ হয় উচ্ছ্বসিত ॥
উদ্ভাসিত হয় ইহা বিদ্যুতের ন্যায়।
মুনির হৃদয়ে শোভে যজ্ঞসূত্র প্রায় ॥
অতিসূক্ষ্মা শুদ্ধজ্ঞান নিত্য সুখময়ী।

বিমল জ্ঞানস্বভাবা তথানন্দময়ী ॥
ব্রহ্মদ্বার এর মুখে হয় অবস্থিত।
সদা সুধাধারা তাতে হ'তেছে ক্ষরিত ॥
অতি রমণীয় ইহা পদ্মগ্রন্থি রূপ।
সুষুম্না নাড়ীর হয় বদন স্বরূপ ॥

মূলাধার পদ্ম।

আধার সরোজলগ্ন সুষুম্নার মুখে।
লিঙ্গ-নিম্নে মধ্যদেশে স্ফুট অধোমুখে ॥
রক্তবর্ণ চতুর্দ্দলে 'ব' 'শ' 'ষ' 'স' রয়।
তপ্ত স্বর্ণ সম তাহা উদ্ভাসিত হয় ॥
চতুষ্কোণ ধরাচক্র তন্মধ্যে শোভিত।
শূলাষ্টক দ্বারা উহা আছে পরিবৃত ॥
পীতবর্ণ, কোমলাঙ্গ তড়িৎ সমান।
মধ্যে 'লং' ধরাবীজ রহে শোভমান ॥
তাতে চতুর্ভুজ ভূষা গজেন্দ্র বাহন।
কোলে শিশু নবভানু লোহিত বরণ ॥
চতুর্ভুজ শ্রেষ্ঠ বলি ইনিই কথিত
মুখপদ্মে চারিবেদ আছে বিরাজিত।
তাহাতে ডাকিনী নামে দেবী অবস্থিতা।
রক্তনেত্রা, চতুর্ভুজ হয় সুশোভিতা ॥
যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশার্কের প্রায়।
শুদ্ধবুদ্ধি ব্রহ্মারূপে দেবী শোভা পায় ॥
বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখে কর্ণিকার মাঝে।
ত্রৈপুর নামক যন্ত্র ত্রিকোণ বিরাজে ॥
বিদ্যুতের সম দীপ্ত দৃশ্য মনোহর।
বিলাসের একমাত্র পাত্র শ্রেষ্ঠতর ॥
তথায় কন্দর্প বায়ু করি অধিষ্ঠান।
জীবাত্মায় বশ্যকরে ভ্রমি সর্ব্বস্থান ॥
কোটী সূর্য্যসম সেই প্রদীপ্ত পবন
বান্ধুলীকুসুমসম রক্তিম বরণ ॥

তাহাতে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ অধোমুখে স্থিত।
কোমল, কাঞ্চন যথা হলে বিগলিত॥
নবীন পল্লব বর্ণ, শারদীয় শশী—
সমসমুজ্জ্বল কান্তি যেন কাশীবাসী।
বিলাসা, বর্ত্তুলাকৃতি নদ্যাবর্ত্তপ্রায়।
তত্ত্বজ্ঞান, ধ্যানযোগে জানিবে তাহায়॥
তদূর্দ্ধে মৃণালতন্তুসম সূক্ষ্মা অতি।
বিশ্বমোহিনী মায়া করে অবস্থিতি॥
ব্রহ্মদ্বার মুখাবৃত করিয়া সতত।
আপনি পীযূষ পান করে অবিরত॥
শঙ্খাবর্ত্তাকৃতি নব চপলার প্রায়।
সার্দ্ধত্রয়াবর্ত্ত তথা ভুজঙ্গের ন্যায়॥
স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পরে আছেন শায়িতা।
ইনি কুলকুণ্ডলিনী নামে অভিহিতা॥
গুঞ্জে কুলকুণ্ডলিনী অলি পুষ্প প্রায়।
কাব্য ও প্রবন্ধ ভেদে কোমল ভাষায়॥
সদা শ্বাসোচ্ছাসে করি গমনাগমন।
ইনিই জীবের প্রাণ করেন রক্ষণ॥
মুলাধার কমলেতে করি অধিষ্ঠান।
তেজোময়ী দীপ্তাবলী করেন প্রদান॥
অতিজ্ঞান প্রদায়িনী, সূক্ষ্মা অতিশয়।
নিত্যানন্দ স্বরূপিনী প্রকৃতি তথায়॥
সর্ব্বদা দেদীপ্যমানা সৌদামিনী সম।
তাহার প্রভায় বিশ্ব শোভে অনুপম॥
শ্রীপরমেশ্বরী রূপে তিনি বিরাজিত।
নিত্যজ্ঞানোদয়ে সেই কারণ নিশ্চিত॥
মুলাধার কমলের ত্রিকোণ বিবরে।
কোটী সূর্য্য সম দীপ্ত কুণ্ডলিনী, নরে—
একাগ্র মানসে যদি করে সদা ধ্যান।
হবে নরশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রী গুরুর সমান॥

সদা সুস্থ, শুদ্ধশীল, প্রফুল্ল অন্তরে।
নানাকাব্যে দেবগুরু স্তবে তুষ্ট করে॥

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম।

লিঙ্গমূলে সুষুম্নায় চিত্রানী যে স্থিত।
তাহাতেসিন্দুরসমবরণলোহিত॥
মনোরম ষট্‌দল একটী কমল।
তড়িতের ন্যায় তাহা শোভে সমুজ্জ্বল॥
ষড়দলে বা-দিনান্ত এই বর্ণ হয়।
ক্রমে সমন্বিত এরে স্বাধিষ্ঠান কয়॥
স্বাধিষ্ঠানপদ্ম মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার।
ধবল বরণ চক্র কিম্বা জলাধার॥
তন্মধ্যে নির্ম্মল শুভ্র শারদায় শশী।
মকরবাহন বংবীজ অধিবাসী॥
তার ক্রোড়ে পীতবাস সুনীলবরণ।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ভূষা নবীন যৌবন॥
চতুর্ভুজ দেব দেব নারায়ণ স্থিত।
তিনি তোমাদের রক্ষা করেন বিহিত॥
তথায় ডাকিনী শক্তি অবস্থিত রয়।
নীল ইন্দিবর সম দেহ কান্তি হয়॥
নানা অস্ত্র ধরে করে, উন্মত্ত অন্তরে।
নানাবস্ত্রবিভূষিতা দিব্য অলঙ্কারে॥
স্বাধিষ্ঠান পদ্ম যিনি করেন চিন্তন।
নাশে অহঙ্কার আদি তার রিপুগণ॥
অজ্ঞান তিমিরে সূর্য্য প্রকাশের প্রায়।
যোগীর প্রধান স্থান দেখিবেক তায়॥
পদ্য গদ্য নানারূপ প্রবন্ধ রচিয়া।
সুখকাব্যে ধরা রাখিবেক মাতাইয়া॥

মনিপুর পদ্ম।

স্বাধিষ্ঠান পদ্মউর্দ্ধে নাভিমূলে রয়।
দশ দল পদ্ম এক গাঢ় নীলময়॥

সানুস্বার ডাদি ফান্ত বর্ণ ক্রমাম্বয়।
দশ দলে নীলপদ্মসম দৃষ্ট হয়॥
এই পদ্মে বৈশ্বানর-ত্রিকোণ মণ্ডল।
অরুণ প্রভাত ভানু সম সমুজ্জ্বল॥
ত্রিকোণের বাহ্য তিনদ্বার সুশোভিত।
বহ্নিবীজ রং তাতে আছে অধিষ্ঠিত॥
তাহাকে মেষাধিরূঢ় নবভানু প্রায়।
চতুর্ভুজ যুক্ত ধ্যান করিবে সদায়॥
তার ক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তি সদা বিরাজিত।
বিশুদ্ধসিন্দুরসমবরণ লোহিত॥
ভস্মলিপ্ত অঙ্গ ভূষা বৃদ্ধ ত্রিনয়ন।
লোকহিত, বরাভয় করে সুশোভন॥
চতুর্ভুজা শুভঙ্করী লাকিনী ত্রিকোণে।
শ্যাম, পীতম্বরা, শোভে বিবিধ ভূষণে॥
সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে থাকে অবাস্থিত।
মণিপুর নামে তাহা হয় অভিহিত॥
এই মণিপুর পদ্ম যে করে চিন্তন।
সে পারে করিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহনন।
তার মুখ পদ্মে বাণী থাকে বিরাজিত।
সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানি সেই হইবে নিশ্চিত॥

অনাহত পদ্ম।

হৃদয়ে বন্ধুক পুষ্প সদৃশ উজ্জ্বল।
বিরাজে দ্বাদশদলবিশিষ্টকমল॥
নাভি কমলের উর্দ্ধে ইহা অবস্থিত।
অনাহত পদ্ম নামে হয় অভিহিত॥
ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অক্ষর।
প্রতিদলে সিন্দুরাভ শোভে মনোহর॥
কল্পতরুসম ইহা দানে কামফল।
শোভে ধূম্রষট্ কোণে পবন মণ্ডল॥
তাহাতে যং কারাত্মক বায়ুবীজ রয়।

ধূম্রবর্ণ, চতুর্ভুজ, মধুরতাময় ॥
কৃষ্ণসারারূঢ় যিনি সবার প্রধান।
কৃপাময়, শুভ্রবর্ণ, নির্ম্মল ঈশান ॥
করেতে অভয় বর করেন ধারণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন।

বলিদান-সমাধান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিষ্য। গুরো! মনুষ্যমাত্রই যে স্বাভাবিক সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। অধুনা "বিধি" বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে।

গুরু। বৎস! বিধিবিচার অত্যন্ত জটিল, তথাপি তোমার ইচ্ছানুসারে স্থূলভাবে বলিতেছি। "অপ্রাপ্তপ্রাপকোবিধিঃ"—অপ্রাপ্ত বিষয় যাহাদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে বিধি বলে। পূর্ব্বকথিত বাহ্য ও আন্তরধর্ম্ম ও গুণগুলির হ্রাস, বৃদ্ধি, অর্জ্জন ও বর্জ্জন বিধিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিধি দ্বিবিধ যথা,—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। যে বিধি অনুষ্ঠাতার প্রকৃতির বা স্বভাবগুণের অনুকূল বা পরিপোষক তাহাকে স্বাভাবিক বিধি এবং যাহা তাহার প্রতিকূল বা প্রতিষেধক তাহাকে অস্বাভাবিক বিধি বলা যায়। ইহারা প্রত্যেকে আবার দ্বিবিধ যথা; প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনা যে বিধি প্রতিপালকের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক গুণ ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত, উত্তেজিত বা প্রযোজিত করে তাহা প্রবর্ত্তনা এবং যাহা নিবর্ত্তিত বা বাধিত করে তাহা নিবর্ত্তনা। এই নিবর্ত্তনা বিধি আবার দ্বিবিধ যথা—পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ। অর্থাৎ
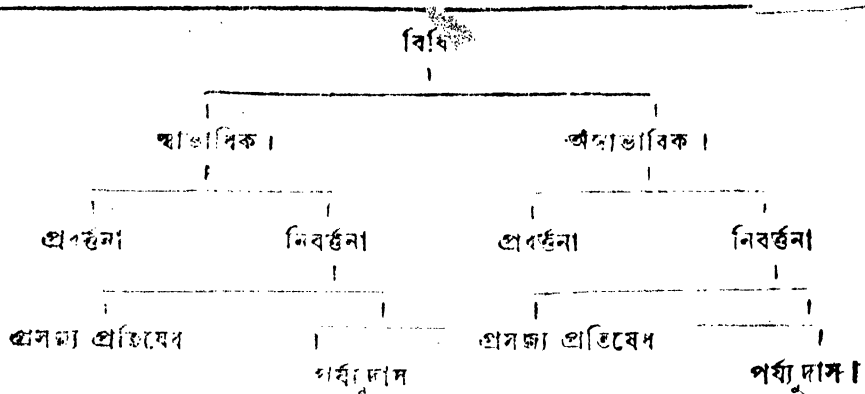
ইহাই বিধির সংক্ষেপে বিচার বা আলোচনা।

শিষ্য। গুরুদেব? বিধির বিভাগ যাহা করিলেন বুঝিলাম কিন্তু ঐ প্রসজ্যপ্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস বুঝিতে পারিতেছি না উহা কিরূপ?

গুরু। বৎস। বুঝাইয়া দিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর :——

নিবর্ত্তনা বিধি নঞ্ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এই নঞ্ দ্বিবিধ বলিয়াই নিবর্ত্তনা দ্বিবিধ বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন :——

"প্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥
অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্য প্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহযত্র নঞ্॥"

যেস্থলে বিধির প্রাধান্য এবং নিষেধের অপ্রাধান্য থাকে সেই স্থলে পর্য্যুদাস নঞ্ হয়; তথায় নঞ্ উত্তরপদে থাকে না পূর্ব্বপদে থাকে। আর যেস্থলে বিধির অপ্রাধান্য এবং নিষেধের প্রাধান্য থাকে সেই স্থলে প্রসজ্য প্রতিষেধ নঞ্ হয়; তথায় নঞ্ ক্রিয়ার সহিত প্রযুক্ত হয়। পর্য্যুদাস নঞের পরপদের সহিত সমাস হয়; প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞের সমাস হয় না। উভয়বিধ নঞের অর্থ একপ্রকার যথা;—"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শিষ্য। পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু বৈধহিংসায় ইহাদের উপযোগিতা কি? অতএব বৈধহিংসাবিধি বলিলে কৃতার্থ হই।

গুরু। বৎস। বৈধহিংসা বিচার করিবার নিমিত্তই বিধিস্বরূপাদি অধুনা বলিয়াছি। তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছি; বৎস? প্রথম

হিংসার স্বরূপ ও জন্য জনকাদি আলোচনা করা যাইতেছে, তাহার পর বৈধ-হিংসার বিষয় হইবে। প্রাণি পীড়াকে হিংসা বলে সুতরাং দেখা যায় ঘোর বা ক্রুরপ্রবৃত্তি ও তৎকার্য্যই হিংসা। অত্যস্ত ঘোর বা ক্রুর প্রবৃত্তিও কার্য্য এই স্থলে হিংসা শব্দবাচ্য। এই হিংসা বা ঘোর প্রবৃত্তি রজোগুণ হইতে সমদ্ভূত হইয়া থাকে বলিয়া রজঃ হিংসার জনক ও হিংসা ইহার জন্য। রজোগুণের স্বরূপ ক্রিয়াশীলতা, প্রবর্ত্তকতা, দুঃখরূপতা ও ঘোর স্বভাবতা। সাংখ্যদর্শন বলেন—"সত্ত্বংলঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভবংচলঞ্চ রজঃ। গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবর্চ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোহন্যাভিভবাশ্রয়জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥ ১৩ কারিকা॥

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ; রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং তমোগুণ মোহস্বরূপ (সুতরাং হিংসা ও তৎকার্য্যের স্বরূপ দুঃখ) সত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজোগুণের প্রবৃত্তি (সুতরাং কার্য্য করিবার ইচ্ছা) তমোগুণের নিয়মন এই গুণত্রয়ের বৃত্তি হইলে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের আবির্ভাবের হেতু, এবং পরস্পর নিত্য সঙ্গী॥ এই কারিকার তত্ত্বকৌমুদী টীকায় ষড়্‌দর্শনাচার্য্য সরস্বতীকল্প বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, "সত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় শান্তামত্মনো বৃত্তিং প্রতিলভতে এবং রজঃ সত্ত্বতমসী অভিভূয় ঘোরাম্‌ এবং তমঃ সত্ত্বরজসী অভিভূয় মূঢ়াম্‌ ইতি অন্যোন্যাশ্রয় বৃত্তয়॥"—সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ অভিভূত করিয়া আত্মার শান্তবৃত্তি লাভ করে। এইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমঃ অভিভূত করিয়া ঘোরক্রুরবৃত্তি এবং তমোগুণ রজঃ সত্ত্ব অভিভূত করিয়া মূঢ়বৃত্তি প্রকাশ করে বলিয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং স্বাভাবিক সাত্ত্বিক সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ শান্তপ্রকৃতি, সেইরূপ স্বভাবরাজসের প্রকৃতি ঘোর বা ক্রুর এবং স্বভাবতামসিকের প্রকৃতি মূঢ় হইয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতায় এই কথাই বলিয়াছেন——

"সত্ত্বং রজস্তম ইতিগুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
তত্রসত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকামনাময়ম্‌।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ১৪।৯॥

সুতরাং বৎস হিংসা ঘোর ক্রুর ব্যাপার অধিকন্ত সত্ত্বগুণের নিকৃষ্ট এই জন্য সত্ত্ববিরোধী হিংসা সাত্ত্বিকের আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিকের স্বাভাবিক স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই হিংসা মানবের দ্বিবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে যথা, জীব হিংসাজন্য অনিষ্ট ও অবৈধ হিংসাজন্য অনিষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু বৈধে জীবহিংসা জন্য মাত্র অনিষ্ট হইয়া থাকে।

শিষ্য। গুরো! ইহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। বৎস! শুনিয়াছ চৌর্য্য পাপজনক, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তই শাস্তিজনক ব্যাপার কিন্তু উহাও অবগত আছ ব্রাহ্মণস্বামিক দ্রব্যাপহরণে শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত বাহুল্য আছে অর্থাৎ চৌর্য্য জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণস্বামিক বা ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ জন্য আর একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত এই উভয় বিধ প্রায়শ্চিত্ত বা কোন গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত সেই পাপক্ষালনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে; সেইরূপ আম্মোদর পুরণাদি জন্য বৃথা জীবহত্যা করিলে হিংসাজনিত অনিষ্ট ও অবৈধত্ববশতঃ আর এক প্রকার অনিষ্ট হয় কিন্তু বৈধেমাত্র জীবহত্যাজনিত অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে সুতরাং হিংসার ন্যায় বৈধহিংসা সদোষ; তবে হিংসা বা অবৈধ বা বৃথা হিংসা অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প বলিয়া লৌকিক-নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে বাস্তবিক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বৈধহিংসা নির্দ্দোষ নহে উহা ইষ্টানিষ্টরূপ মিশ্রফলোপধায়ক। ইহা ষড়দর্শনাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যদর্শনের ২য় কারিকার তত্ত্বকৌমুদী টীকায় ভগবান পঞ্চশিখাচার্য্যের উক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—"স্বল্পঃসঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ"—টীকাকার বলিতেছেন—স্বল্পঃ (প্রধানাপূর্ব্বজন্য সুখাপেক্ষয়া স্বল্পদুঃখজনক ইত্যর্থঃ) সঙ্করঃ (একদা একত্রসত্ত্বম্ জ্যোতিষ্টোমাদি জন্মনঃ প্রধানাপূর্ব্বস্য পশুহিংসাদিজন্মনা অনর্থহেতুনা অপূর্ব্বেণ) সপরিহারঃ (কিয়তাপি প্রায়শ্চিত্তেন পরিহর্ত্তুং শক্যঃ) (অথ প্রমাদতঃ প্রায়শ্চিত্তমপি নাচরিতং প্রধানকর্ম্মবিপাক সময়ে চ পচ্যতে তথাপি যাবদসাবনর্থং সূতেতাবৎ) সপ্রত্যবমর্ষঃ (প্রত্যবমর্ষেণ সহিষ্ণুতয়া সহ বর্ত্তত ইতি মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীত সুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণি-

ক্যাম্) ॥ (বৈধহিংসা) প্রধান অদৃষ্ট জন্য সুখের অপেক্ষায় অল্প দুঃখজনক জ্যোতিষ্টোমাদি প্রধান অদৃষ্টফলের সহিত পশুহিংসাদিজনিত অনর্থহেতু অদৃষ্টের একমাত্র অবস্থিতি। কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা (সেই অদৃষ্ট অনিষ্ট নিবৃত্ত হইতে পারে যদি প্রমাদবশতঃ সেই পশুহিংসাজনিত অদৃষ্ট অনিষ্টের নিবারণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করা হয় তাহা হইলে প্রধান যে যাগাদিকার্য্য তাহার ফলোৎপত্তিকালে ঐ হত্যাজনিত অনর্থ ফলোন্মুখী হইবে এবং তৎকালে পুণ্যসঞ্চারোপনীত সুধাহ্রদে অবগাহনকারী কুশলসাধক পশুহত্যাদি পাপজনিত দুঃখাগ্নিকণা ও ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে থাকিবেন ॥ অতএব বৎস বৈধহিংসা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে।

আরও দেখ বৎস, মৎস্যপুরাণ ১৪৩ অধ্যায়ে বিশ্বভুক্‌ইন্দ্রের উপাখ্যানে পশুঘাতাত্মক যজ্ঞ অধর্ম্মাত্মক স্পষ্টই বলিতেছে, আখ্যায়িকায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে যথা :——

সূতউবাচ :——

"তথা বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ত্ প্রভুঃ।
মন্ত্রান্ বৈ যোজয়িত্বাতু ইহামুত্র চ কর্ম্মসু (সু)
দেবৈঃ সংহৃত্য সর্বসাধনসংবৃতঃ।
তস্যাশ্বমেধে বিততে সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ ॥
যজ্ঞকর্ম্মণ্যবর্ত্তন্ত কর্মণ্যগ্রে তথার্ত্বিজঃ।
হূয়মানে দেবহোত্রে অগ্নৌবহুবিধং হবিঃ ॥
সম্প্রতীতেষু দেবেষু সামগেষু চ সুস্বরম্।
পরিক্রান্তেষু লঘুষু অধ্বর্য্যুপুরুষেষু চ।
আলব্ধেষু চ মধ্যেতু তথা পশুগণেষু চ।
আহুতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভুক্ষু ততস্তদা ॥
য ইন্দ্রিয়াত্মকাদেবী যজ্ঞভাগভুজস্তু তে।
তান্ যজন্তিসদা দেবাঃ কল্পাদেষু ভবন্তি যে ॥
অধ্বর্য্যুপ্রৈষ্যকালে তু ব্যুত্থিতা ঋষয়স্তথা।
মহর্ষয়শ্চ তান্‌দৃষ্ট্বা দীনান্ পশুগণাংস্তদা ॥
বিশ্বভুজং তে হ্যপৃচ্ছন্ কথং যজ্ঞবিধিস্তব।
অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসাধর্ম্মেপ্সয়া তব ॥
। নঃ (নঃ) পশুবধস্ত্বিষ্টস্তব যজ্ঞে সুরোত্তম।

অধ্বর্য্যো ধর্ম্মঘাতায় প্রারব্ধঃ পশুভিস্ত্বয়া ॥
নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোহয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ।
আগমেন ভবান্ ধর্ম্মং প্রকরোতু যদীচ্ছতি ॥
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মেণাব্যসনেন তু ।
যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ ? ত্রিবর্গপরিশোধিতৈঃ ॥
এষ যজ্ঞো মহানিন্দ্র স্বয়ম্ভুবিহিতঃ পুরা ।
এবং বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মানমোহসমন্বিতঃ ।
তেষাং বিবাদোহতিমহান্ জজ্ঞে ইন্দ্রমহর্ষীণাম্
জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈঃ কেন যষ্টব্যমিতি চোচ্যতে ।
তে তু খিন্না বিবাদেন সক্ত্যাযুক্তা মহর্ষয়ঃ ॥
সন্ধায় সমমিন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুঃ খচরং বসুম্ । [illegible]
মহাপ্রাজ্ঞ ত্বয়া দৃষ্টো বাথ যজ্ঞবিধির্নৃপ ।
ঔত্তানপাদে ? প্রব্রূহি সংশয়ং নস্তুদ প্রভো ॥
সুঃ উবাচ শ্রুত্বা বাক্যং বসুস্তেষাং অবিচার্য্য বলাবলম্ ।
বেদশাস্ত্রমনুস্মৃত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ ॥
যথোপনীতৈর্যষ্টব্যমিতি প্রোবাচ পার্থিবঃ ।
যষ্টব্যং পশুভির্মেধ্যৈ রথমূলফলৈরপি ॥
হিংসাস্বভাবো যজ্ঞস্য ইতি মে দর্শিতাগমঃ ।
তথৈতে ভাবিতা মন্ত্রা হিংসালিঙ্গা মহর্ষিভিঃ
দীর্ঘেণ তপসাযুক্তৈস্তারকাদিনিদর্শিভিঃ ।
তৎ প্রমাণং ময়া চোক্তং তস্মাচ্ছমিতুমর্হথ ॥
যদি প্রমাণং স্বান্যেব মন্ত্রবাক্যানি বো দ্বিজাঃ ।
তথা প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো হ্যন্যথা মানৃতং বচঃ ॥
এবং কৃতোত্তরাস্তে তু যুক্ত্যাত্মানং ততো ধিয়া
অবশ্যম্ভাবিনং দৃষ্ট্বা তমধো হ্যশপংস্তদা ॥
ইত্যুক্তমাত্রো নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্
ঊর্দ্ধচারী নৃপো ভূত্বা রসাতলচরোহভবৎ ॥
বসুধাতলচারী তু তেন বাক্যেন সোহভবৎ ।
ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেত্তা রাজা বসুধরো গতঃ ॥

তস্মাৎনবাচো হ্যেকেন বহুশ্রুতেনাপি সংশয়ঃ।
বহুধারস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মত্বাদনুগাগতিঃ॥
তস্মান্ন নিশ্চয়াত্বক্তুং ধর্ম্মঃ শক্যোহি কেনচিৎ।
দেবানৃষীনুপাদায় স্বায়ম্ভূবমৃতে মনুম্॥
তস্মান্ন হিংসাযজ্ঞেস্যাৎ যদুক্তমৃষিভিঃ পুরা।
ঋষি কোটিসহস্রাণি স্বৈস্তপোভির্দিবংগতাঃ॥
তস্মান্ন হিংসাযজ্ঞঞ্চ প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ।
অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমোভূতদয়া শমঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচমনুক্রোশং ক্ষমাধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেব দুরাসদম্॥

সূত বলিলেন, বিশ্বভুক্ তৎকালে প্রভু ইন্দ্র ঐহিক পারলৌকিক সুখ-সাধন মন্ত্রসমূহ সংগৃহীত করিয়া যজ্ঞ সমূহের প্রবর্ত্তন করিলেন, তিনি যজ্ঞ-সম্ভার আহরণ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে কর্ম্মকুশল ঋষিগণ আসিয়া ঋত্বিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন তখন অগ্নিমধ্যে দেবগণোদ্দেশে বহুবিধ হবিঃ দ্বারা হোম কার্য্য আরব্ধ হইল। দেবগণ অতীব হৃষ্ট হইলেন, মেধ্য পশুসকল প্রোক্ষিত হইতে লাগিল, দেবগণ আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়াত্মক দেবগণ যজ্ঞভাগভোজী। ইঁহারা কল্পাদিকালে উদ্ভূত হইয়া থাকেন, তখন সেই যজ্ঞে উক্ত দেবগণই অর্চিত হইয়া ছিলেন। অধ্বর্য্যুগণ পশূৎসর্গের উপক্রম করিলে মহর্ষিগণ দীন পশুগণ দর্শনে করুণাপরবশ হইয়া বিশ্বভুগিন্দ্রকে কহিলেন হে ইন্দ্র? তোমার এই যজ্ঞবিধি কি প্রকার? ইহা মহান্ অধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্ম কামনায় হিংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ। হে সুরোত্তম তোমাদিগের বা আমাদিগের এই যজ্ঞবিধি উত্তম নহে। তুমি এই পশুসমূহ দ্বারা ধর্ম্মঘাতী অধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছ। ইহা ধর্ম নহে পরন্তু অধর্ম্ম, কারণ হিংসা কদাপি ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ? আপনি যদি সতত ধর্ম কামনা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আগমোক্ত বিধানানুসারে বীজদ্বারা ব্যসনদোষহীন ত্রিবর্গ সাধক যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। হে ইন্দ্র এই মহান্ যজ্ঞ পুরাকালে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এইরূপ বলিলেও মহামোহবশে তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন ইন্দ্র ও মহর্ষিগণ মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমের বীজমধ্যে কাহার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া মহান্ বিবাদ আরব্ধ হইল।

তাঁহারা নিজ নিজ-যুক্তি-শক্তি দ্বারা স্ব স্ব মতের সমর্থন করিতে লাগিলেন; সুতরাং উহার কোন মীমাংসা হইল না; সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা গিয়া আকাশচারী বসুধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! কিরূপ যজ্ঞবিধি দেখিয়াছেন? হে উত্তানপাদতনয়, হে প্রভো! আমাদিগের এই সংশয় নিরাশ করুন। সূত বলিলেন, বসুধর তাঁহাদিগের প্রশ্ন শ্রবণান্তর বলাবল-বিচার না করিয়াই বেদশাস্ত্র স্মরণ-পূর্ব্বক যজ্ঞতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে "যথোপনীত মেধ্যপশু, মূল ও ফল দ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। আগমালোচনায় যজ্ঞের হিংসাস্বভাবই জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্ব্ব মহর্ষিগণ যজ্ঞের যে সকল মন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকলও হিংসাত্মক। সেই মন্ত্রোদ্ভাবক মহর্ষিগণ দীর্ঘতপস্যা ও তারকাদি-জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নিদর্শন প্রভৃতির সাহায্যে যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। আমিও তদনুসারে বলিলাম। অতএব আপনারা শান্তি অবলম্বন করুন। আপনাদিগের সেই সমস্ত মন্ত্রবাক্য যদি প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়, তবে তদনুসারেই যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, নচেৎ বৃথা বাক্যব্যয়ে ফল কি?" সেই ঋষিগণ বসুধরের এবম্বিধ উত্তরবাক্য-শ্রবণে গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া অবশ্যম্ভাবি-বিষয়-দর্শনে তাঁহাকে "তুমি অধঃ পতিত হও" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। ঋষিগণ এই কথা বলিবামাত্র সেই ঊর্দ্ধবিহারী বসুধর রাজা রসাতলচারী হইলেন। তিনি ধর্ম্মসমূহের সংশয়চ্ছেদকারী অতীব জ্ঞানী হইয়াও একমাত্র বাক্যদোষে অধঃপতিত হইলেন। অতএব কোন ব্যক্তি বহুজ্ঞ হইলেও একাকী কোন সংশয়-স্থলে সিদ্ধান্তবাক্য বলিবেন না। ধর্ম্ম বহুধারা-সমন্বিত, ইহার গতি সূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয়। এই নিমিত্ত দেব, ঋষি ও মনু ব্যতীত অপর কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিতে সক্ষম নহে। ফলতঃ পুরাকালে ঋষিগণ যজ্ঞে যে হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, উহাই সুব্যবস্থা। দেখুন, বহুকোটি ঋষি, স্ব স্ব তপোমহিমায় স্বর্গগামী হইয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়াই ঋষিগণ হিংসা-যজ্ঞের প্রশংসা করেন নাই। অদ্রোহ, অলোভ, দম, প্রাণিগণে দয়া, শম, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, পরোপকাররুচি, ক্ষমা, ধৃতি এই সকল সনাতনধর্ম্মের সুদৃঢ় মূলস্বরূপ; সুতরাং বৎস, দেখিতেছ, হিংসা কদাপি সম্পূর্ণহিতকরী নহে। হিতকরী হইলে এই আখ্যায়িকায় কদাপি হিংসা সম্বন্ধে দেবতা ও ঋষিগণের দ্বন্দ্বস্থলে বৈধহিংসার নিন্দা কীর্ত্তিত হইত না। এই সমস্ত কারণ হইতেই ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্য হিংসাত্মক যজ্ঞের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষতা

বলেন নাই এবং উহার প্রায়শ্চিত্তই বলিয়াছেন, তা সে প্রায়শ্চিত্ত অধিক হউক বা অল্পই হউক্‌। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলে পঞ্চশিখ কদাপি “স্বল্পঃ সঙ্করঃ” ইত্যাদি কথা বলিতে সমর্থ হইতেন না। দেখিতেছ বৎস, পুরাণে হিংসাত্মক যজ্ঞের কিরূপ অপ্রাশস্ত্য। আরও দেখ বৎস, বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্রে তৃতীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন—এতেঽপি যে যাজ্ঞিকাঃ যজ্ঞকর্ম্মণি পশূন্ ব্যাপাদয়ন্তি তে মূর্খাঃ পরমার্থং শ্রুতের্ন জানন্তি, তত্র কিলৈতদুক্তং অজৈর্যষ্টব্যম্—অজা ব্রীহয়স্তাবৎ সপ্তবার্ষিকাঃ কথ্যন্তে, ন পুনঃ পশুবিশেষাঃ ॥ অর্থাৎ এই যে সকল যাজ্ঞিক যজ্ঞকার্য্যে পশুহত্যা করিয়া থাকে তাহারা মূর্খ, শ্রুতির প্রকৃত অর্থ অবগত নহে। এক-স্থলে উহা উক্ত হইয়াছে যে “অজদ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।” সপ্তবর্ষের পুরাতন ব্রীহিধান্যকে এইস্থলে ‘অজ’ বলা হইয়া থাকে, পশুবিশেষকে নহে।

হিংসাপূর্ব্বক যজ্ঞ যে নিকৃষ্ট, তাহা ঐ যজ্ঞোৎপত্তিস্থান হইতেও বুঝিতে পারা যায়। পাদদেশ শরীরের অপরাপর অবয়ব হইতে যে নিকৃষ্ট তাহাতে সংশয় নাই। যজ্ঞবরাহের পাদসন্ধি হইতে প্রাণিহিংসাকর যজ্ঞসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে যথা :— বাজিমেধগোমেধৌ নরমেধস্তথৈব চ।

প্রাণিহিংসাকরা যে তু তে জাতাঃ পাদসন্ধিতঃ ॥

কালিকা পুরাণ ৩১ অধ্যায় ॥ অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপূর্ব্বক সেই সকল যজ্ঞ বরাহদেবের চরণসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। দেখ বৎস, ভগবান্ মহর্ষি কপিলদেব-মতে বেদবিহিত-কর্ম্ম দৃষ্ট-উপায়-তুল্য অবিশুদ্ধ, নশ্বর ও তারতম্যময় যথা—“দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ ॥” সাংখ্যদর্শন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, বৈধহিংসা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। ইহা যাজ্ঞবল্ক্যও রাজধর্ম্মনির্ণয় করিতে দানবিধি-প্রসঙ্গে বলিতেছেন “অস্কন্নমব্যথং চৈব প্রায়শ্চিত্তৈরদূষিতম্। অগ্নেঃ সকাশাদ্বিপ্রাগ্নৌ হুতং শ্রেষ্ঠমিহোচ্যতে” ॥ ১ম অঃ ॥ —রাজা ব্রাহ্মণ দিগকে নানাবিধ ভোগসাধন দ্রব্য এবং বিবিধ ধন দান করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণকে যাহা অর্পিত হয়, তাহা রাজগণের অক্ষয়নিধিস্বরূপ। অগ্নিসাধ্য রাজসূয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণা-গ্নিতে আহুতি-প্রদান শ্রেষ্ঠ, কারণ এ আহুতি-দানে অঙ্গহীনতা নাই, পশুহিংসা নাই এবং প্রায়শ্চিত্তক্লেশ নাই। অতএব হইতেছে—দোষবাহুল্যই দুষ্টত্বের ও গুণবাহুল্যই অদুষ্টত্বের ব্যবহারিক পরিচয় মাত্র। বস্তুতঃ কেবল গুণবত্ত্ব ঐরূপ নির্দ্দোষত্বের পরিচায়ক নহে। যেমন দধি কফকারিত্বাদি-দোষযুক্ত, কিন্তু শর্করাসংযোগে তত্তদ্দোষাদি বহুগপরিণামে নিবারিত হয়,

সর্পকর দাধ নির্দ্দোষরূপে ব্যবহৃত হয়। বৈধহিংসাও সেইরূপ নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে। ইহা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা—"বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃণাম্।

হিংসাজন্যন্তু পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬ অঃ

হে বিপ্রেন্দ্র, নরগণের বলিদান দ্বারা দুর্গাপ্রীতি হয়, কিন্তু হিংসাজন্য পাপ হয়, তাহাতে সংশয় নাই। এই জন্যই বোধহয় ভগবান্ পঞ্চানন "অনুসংক্রমঃ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলে তিনি কদাপি ঐরূপ উল্লেখ করিতে সমর্থ হইতেন না। অতএব দেখ বৎস, বৈধহিংসা সম্পূর্ণ নির্ম্মল নহে। আরও দেখ, শ্রুতি বলেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি"—কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। হিংসা সত্ত্বগুণের কার্য্য নহে। সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই গুণ স্বয়ং ক্রিয়াহীন, সুতরাং হিংসাদিকার্য্য কেবল সত্ত্ব দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্॥ ১৪ অঃ॥ নির্ম্মলত্ব-প্রযুক্ত সত্ত্বগুণ স্ফটিক-সদৃশ, প্রকাশক এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রব-শূন্য, সুতরাং এই শ্রুতি স্বাভাবিক সাত্ত্বিকমাত্রেরই স্বাভাবিকপ্রবৃত্তনাবিধি; যেহেতু হিংসা না করা সত্ত্বগুণ-স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সুতরাং "মাহিংস্যাৎ" স্বভাবসাত্ত্বিকের বিধার্থক লিঙ্ নহে, প্রত্যুক্ত কালসামান্যে লিঙ্ বলা যাইতে পারে, কিম্বা সর্ব্বকালজ্ঞাপক 'মা'-যোগের লুঙের অপবাদপক্ষে লিঙ্, সামান্যে লট্‌ও হইতে পারে। পক্ষান্তরে ত্রিগুণাত্মিকপ্রকৃতিসম্ভূত জীব ত্রিগুণাত্মক, যে হেতু—

অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বেসর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্বরজসী উভে।
উভয়োঃ সত্ত্বরজসোর্মিথুনং তম উচ্যতে॥
নৈষামাদিসম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে॥

সাংখ্যদর্শনমতে সর্ব্ববস্তু তিনগুণের মিশ্রণ, রজের মিথুন সত্ত্ব, সত্ত্বের মিথুন রজঃ, তমঃ সত্ত্ব ও রজো মিশ্রিত, ঐ সত্ত্ব ও রজঃ আবার তমো মিশ্রিত, ইহাদের প্রথমসংযোগ বা বিয়োগ স্থির করা যায় না। সেই রজোগুণের কার্য্য হিংসাদি, অতএব এই হিংসাপ্রবৃত্তি সত্ত্বগুণপ্রধানে গৌণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে; সেই গৌণরজঃকার্য্য হিংসা স্বভাবসাত্ত্বিকের দমন করা কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রুতি "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুতরাং

ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিকনিবর্ত্তনা প্রসজ্যপ্রতিষেধ; বিধি। এই সনঞ্‌ লিঙ্‌কে বিধ্যর্থক বলা যাইতে পারে। এই স্থলে বৎস, 'মা' এইটী নঞর্থক হওয়ায় ইহা "হিংস্যাৎ" এই ক্রিয়ার সহিত যুক্ত। এই শ্রুতিবাক্য জীব-মাত্রেরই প্রতিপাল্য, বিশেষতঃ স্বভাবসাত্ত্বিকের, তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না।

শিষ্য। গুরো! বুঝিলাম হিংসা পাপজনক, সুতরাং বৈধহিংসা কখনই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নহে, নিষ্পাপ হইলে "বৈধ" এই বিশেষণশব্দটী কদাপি "হিংসা" শব্দটীতে প্রযুক্ত হইয়া সাধারণভাবে বা যদৃচ্ছাতঃ প্রাণি-পীড়া হইতে পৃথক করিত না। অর্থাৎ বৈধ হিংসা না বলিয়া বৈধ আরকিছু বলাভাল ছিল। এখন বেশ বুঝিতেছি, বৈধহিংসাও এক প্রকার হিংসা, সাধারণ হিংসা হইতে প্রভেদ এই যে, বৈধে বিবিধ অনিষ্টনা হইয়া একপ্রকার অনিষ্ট হয়। গুরো, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" এই শ্রুতি অবশ্য পালনীয়, কিন্তু তাহা হইলে "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" এই শ্রুতিও নিরর্থক হইয়া পড়ে; অতএব ইহার মীমাংসা কিরূপ হইবে?

গুরু। বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, যথাসাধ্য ইহার মীমাংসা করিতেছি। "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ"—যজ্ঞ ব্যতীত সর্ব্বভূতকে হিংসা না করিয়া ইত্যাদি এই যে শ্রুতি বলিতেছে—ইহা রজোগুণের প্রতিকূল, সুতরাং রজঃ-প্রধান বা রাজসিকের পক্ষে অস্বাভাবিকনিবর্ত্তনা প্রসজ্যপ্রতিষেধবিধি বা সূক্ষ্মরূপে প্রবর্ত্তনা বিধিও বলা যাইতে পারে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জাগতিক বস্তু ত্রিগুণাত্মক হিংসা অনিষ্টজনক-প্রবৃত্তি, সুতরাং পুরুষার্থলাভের প্রতিকূল, রজঃপ্রধান বা ব্যবহারিকভাবে স্বাভাবিক রাজ-সিকের স্বাভাবিক-হিংসা-প্রবৃত্তি নিয়মিত করিতেই এই বিধি উপযুক্ত। ব্যাপক হিংসা অর্থাৎ সর্ব্বত্রহিংসা বা সদাহিংসার এই শ্রুতি দ্বারা বহু পরিমাণে সঙ্কোচ করা হইতেছে এবং রাজসিকের যাগাদিতে বৈধহিংসায় সাত্ত্বিকের যে দোষ তাহাও হইবে না-বিধান করা হইতেছে, কারণ তাহা হইলে স্বভাবনাশে স্বরূপনাশ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। প্রত্যুত যাগজন্য ইষ্টপ্রাপ্তি রাজসিকের অনিবার্য্য, কিন্তু সাত্ত্বিকের তাহাতে পূর্ব্ব-কথিত অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু সত্ত্বাধিক্যই সাত্ত্বিকতা। হিংসাজনক রজোগুণের প্রবলতা থাকিলে তাহার স্বরূপনাশ-আপত্তি ঘটে। রাজসিকের এই হিংসায় যে অনিষ্ট হইবে না—তাহা উক্তশ্রুতি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। শ্রীভগবান্ গীতায় স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩য় অঃ

বিগুণ অঙ্গহীন নিজধর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরকীয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ॥ মনুও বলিয়াছেন:—

"বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ ১০অঃ॥

সকলাঙ্গপরিপূর্ণ পরধর্ম্ম অপেক্ষা নিজধর্ম্ম বিগতগুণ বা কিঞ্চিদঙ্গহীন হইলেও বরং অনুষ্ঠেয়। পরধর্ম্মাবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিলে সদ্যঃ পতিত হইতে হয়॥

সুতরাং দেখ বৎস, হিংসার ঐরূপ সংযত বিধি না থাকিলে রাজসিকপ্রকৃতি যথেচ্ছ জীবহিংসা সম্পন্ন করিত। তাহা হইলে সত্ত্বগুণসাপেক্ষ পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ বা অপ্রাপ্য হইত। আর দেখ, সত্ত্বপ্রতিকূল রজঃ-কার্য্য হিংসা কখনও রজঃপ্রতিকূল সত্ত্বকার্য্য অহিংসার উৎকৃষ্ট বিধি হইতে পারে না। হিংসায় কখনও শ্রেয়োলাভ হয় না। মোক্ষরূপ পুরুষার্থ সত্ত্বোৎকর্ষ নিবন্ধনই লাভ হয়। বৈধহিংসাদি রজঃকার্য্যদ্বারা যে ফললাভ হয় তাহা নশ্বর। অহিংসাদি সাত্ত্বিক কার্য্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ অক্ষয়ফল লাভ হয়। এই চিত্তশুদ্ধিই মুক্তির প্রধানতম সাধন। অতএব বৎস, স্বাভাবিকরাজসের পক্ষেই এই বৈধহিংসা বিধেয়, সুতরাং শুভফলপ্রদ, সেকারণ বেদ কৃপাপরবশ হইয়া রাজসিকের উন্নতিকল্পে সর্ব্বব্যাপক ভীষণ-হিংসাব্যাপার-প্রশমনমনা হইয়া বৈধহিংসাবিধান করিয়াছেন এবং শ্রুতি-সংহিতা-পুরাণতন্ত্রপ্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ নানা প্রকারে ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন—"যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা" ইত্যাদি, "দেবোদ্দেশং বিনা যস্তু" ইত্যাদি প্রথমপ্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি; অতএব বৎস, "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ও "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" এই দুই শ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ সে বিরোধ নাই। ইহা অধিকারিভেদে নির্ব্বিরোধ হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সামান্য-বিশেষভাব নাই যে "উৎসর্গাপবাদয়োরপবাদবিধির্ব্বলবান্"—সামান্যবিধি ও বিশেষবিধির স্থলে বিশেষের প্রাধান্য হইবে, কারণ বৈধহিংসা বিষয়ে বিধি ও নিষেধের তুল্য ফল দৃষ্ট হয়। বিধিবিষয় প্রথম বল্লীতে উক্ত হইয়াছে, পরে নিষেধ বলিব। বিধি-

নিষেধের বলাবল সমান বলিয়া কে বিশেষ ও কে সামান্য তাহা স্থির করা যায় না; স্থির হইলেও বৈধহিংসা-স্থলে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না, যেহেতু বিশেষ [illegible] সামান্যবিধিও এইস্থলে সামান্য—অর্থাৎ বিশেষ ও সামান্য স্থলে যে বিশেষেরই নিত্য সর্ব্বত্র প্রাধান্য, তাহা নহে, কারণ—"ক্বচিদুৎসর্গস্যাপি সমাবেশঃ"—অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধিবিষয়ে কখনও কখনও দেশ, কাল বা পাত্রানুরোধে সামান্যের বা উৎসর্গের সমাবেশ হইয়া থাকে; সুতরাং [illegible] বিধিনিষেধের তুল্যবলহেতু পাত্র বা অধিকারিনির্দ্দেশই [illegible] বিহিত। এই হেতু বলিয়াছি, যে যাহার অধিকারী, সে তাহা সদোষ হইলেও অনুষ্ঠান করিবে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ইত্যাদি। অপরের নির্দ্দোষ ধর্ম্মও তাহার পক্ষে শ্রেয় নয় বলিয়াছি।

শিষ্য। গুরো! "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ও "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্য-[illegible]" [illegible] শ্রুতিদ্বয়ে সামান্যবিশেষভাব নহে, হইলেও বিশেষের [illegible] নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতেছি, হিংসা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ [illegible] অধিকারিভেদে সদোষও নির্দ্দোষ। তাহা হইলে যাগপূজা প্রভৃতি [illegible] রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, কারণ যাগাদির অধিকারী [illegible] বৈধহিংসা-বিধানে এই হিংসার যথেষ্ট প্রশংসা [illegible] এবং বলিশূন্যপূজাও সর্ব্বফলদায়ক নহে, অতএব এই সন্দেহ দূর করুন।

[illegible] আমিত বলিয়াছি, তোমার সন্দেহে যদৃচ্ছাক্রমে জিজ্ঞাসা [illegible]। এখন। মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে 'বলি' শব্দের ব্যাপ্তি স্থির করিতে হইবে, তাহার পর অন্যান্য বিষয় মীমাংসিত হইবে। বলি শব্দের অর্থ প্রথমবল্লীতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইলেও পুনরপি স্মরণার্থ বলিতেছি "বল" ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ইন্ বা ই প্রত্যয় করিয়া বলি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বল্ ধাতুর অর্থ নিরূপণ দান ও বধ যথা—"বলঙ দানে বধে চ বলকৃচ নিরূপে" কবিকল্পদ্রুমঃ। "বলদানে নিরূপণে হিংসায়াঞ্চ" ধাতু [illegible] বলতে (বল্ আ-আ) দদাতি, হিনস্তি নিরূপয়তীতি বলি: অর্থাৎ উপাস্যস্য প্রীতিং দাতুঃ পুণ্যং বা দদাতি (উপাস্যের প্রীতি বা বলিপ্রদাতার পুণ্য দান করে) প্রীতিকালং নিরূপয়তি (প্রীতিকাল নির্দ্দেশ করে) বলিয়া বলি, অথবা [illegible]

বলিঃ (বহু অনিষ্ট নাশ করিয়া অল্পমাত্র শুভ প্রদান করে বলিয়া বলি বলা যায়।) আভিধানিক অর্থ—উপহার পূজাসামগ্রী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উক্ত দ্বিবিধ অর্থ লইয়া শাস্ত্রসমূহ বলির বিধান করিয়াছেন। এই হেতু বলি অর্থে হিংসা বা উপহার। ইহার অর্থ এই নয় যে [illegible] উপহার" বা হিংসা" ব্যতীত উপহার হয় না, অতএব হিংসা [illegible] নহে। হইলে কদাপি হিংসাব্যতীত বলির ব্যবস্থা শাস্ত্রে [illegible] না— এই ব্যবস্থা পরে বলিব।

অধুনা পশুযাগে হিংসার মুখ্যত্ব বা গৌণত্ব আছে দেখা যাউক। [illegible] বা অঙ্গিত্ব—যে যজ্ঞ পশুহত্যাপ্রধান বা [illegible] পশুহত্যা যে যজ্ঞে বিহিত আছে, তাহা মুখ্য পশুঘাত-যজ্ঞ [illegible] এই যজ্ঞে অশ্বই প্রধান বলিয়া যজ্ঞের নাম অশ্বমেধ, [illegible] নরমেধ ইত্যাদি। কদাচিৎ পশুঘাত মুখ্য হইলেও [illegible], যেমন জ্যোতিষ্টোম। সুতরাং এই সকল যজ্ঞে পশু [illegible] অঙ্গী, যেহেতু বিধিমতে তত্তত্ পশুহত্যাই তত্তত্ কর্ম্মের [illegible] বা প্রধানফলপ্রাপ্তির বিশিষ্ট-হেতু। এই স্থলে [illegible] ঐ যজ্ঞ-জন্য ফল কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্থাৎ যে যজ্ঞে পশুঘাতের সত্তাতেই যজ্ঞফলের সত্তা, তাহার অসত্তায় তাহাও অসত্তা, সেই যজ্ঞেই পশুঘাত মুখ্য বা প্রধান বা অঙ্গী; আবার অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞে পশুর অবান্তর-কল্প থাকায় পশু গৌণ বা অঙ্গ বা অপ্রধান। মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন—"মুখ্যফলাজনকত্বে সতি [illegible]" যাহা মুখ্যফল উৎপাদন করিতে পারে না, অথচ [illegible] উৎপাদক, তাহাকে অঙ্গ বলে। এই মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব শ্রৌতকর্ম্ম যাগা-দিতেই বিচার্য্য। বৈদিক কোন কোন যজ্ঞে পশুঘাত অপরিহার্য্য যেমন অশ্বমেধ, গোমেধ ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে পশুঘাতের সত্তায় যজ্ঞফলের সত্তা বিহিত হয় বলিয়া বৈধহিংসা এস্থলে মুখ্য বা অঙ্গী বলা যায়। দেখ বৎস, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক পূজাদিকর্ম্মে বৈধ-হিংসাকে সেইরূপ মুখ্য বা অঙ্গী, গৌণ বা অঙ্গ বলা যায় না বলিয়া, উহার অন্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই অন্যত্ব কিরূপে হয়, ক্রমশঃ বলিতেছি। প্রথমে দেখা যাউক, "বলি" পূজার কিরূপ সামগ্রী—অর্থাৎ উহা উপচার বা উপহার। বলির আভিধানিক অর্থ উপহার, উপচার নহে। এই উপহার ও উপচারে

বিশেষ পার্থক্য আছে। যথা উপহার :—"আহরণে, উপঢৌকনে, নৈবেদ্যে, বলৌ" (শব্দরত্নাকর।) উপচারঃ আরাধনায়াং, সেবায়াং, উৎকোচে, উপ-চর্য্যায়াং, পূজাদ্রব্যে, বস্ত্রে, শমে" (শব্দরত্নাকর।) এখন দেখা যাইতেছে যে, উপচার কখনও উপহার হইতে পারে না, কিন্তু উপহার উপচার হইলেও হইতে পারে। উপহার না থাকিলে প্রধান ফলের কোন হানি হয় না, কিন্তু প্রধানফলোপধায়ক উপচার ব্যতীত কোনরূপে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে না, সে কারণ শাস্ত্রবিহিত পূজার সামগ্রীকে উপচার বলা হইয়াছে, উপহার বলা হয় নাই। প্রচলিত প্রথা হইতে চৌষট্টী প্রকার পূজার দ্রব্যের প্রত্যেকটীকে উপচার বলা হয়। উপহারের অভাব হইলে ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হয় না। ইহার সহিত প্রধান ফলের কিছুমাত্র আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই। দেখ বৎস, তুমি যেন শ্যামকে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর-অভ্যর্থনা-সহকারে অন্নপানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছ, কিন্তু তাহাকে তাহার বা তোমার কোন প্রিয় বস্তু উপ-হার প্রদান করিলে না; বল দেখি, তাহাতে কি তাহার অতৃপ্তি বা তোমার নিমন্ত্রণের অঙ্গহানি বা ত্রুটি হয়? না, কখনই তাহা হয় না। উপহার দাও উত্তম, না দাও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; প্রধান ব্যাপার নিম-ন্ত্রণের সহিত উহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া এটী একটী স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিন্তু অভ্যর্থনাদির অভাব হইলে নিমন্ত্রণব্যাপারের যে ত্রুটী হইত, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই স্থলে নিমন্ত্রণ-কার্য্যের উপহার যেমন অন্য পদার্থ, পূজাদিতেও সেইরূপ। বলিব্যাপারও প্রধান কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্যামের প্রীতি-উৎপাদনরূপ প্রধান ফল যেমন নিমন্ত্রণ ব্যাপারদ্বারা লাভ করা যায়, কেবল আদর বা অন্নাদির প্রত্যেকটী দ্বারা লাভ হয় না, কিন্তু এই আদরাদি পৃথক্ ভাবে ঐ প্রীতির আংশিক কারণ হয় বলিয়া "অঙ্গ" রূপে কথিত হয়, সেইরূপ পূজাদিতে "বলির" প্রধানফলের সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না, যেহেতু উহার উপহারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উহার মুখ্যত্ব বা অঙ্গিত্ব, গৌণত্ব বা অঙ্গত্ব হইতে পারে না, বলিয়া অন্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অন্যত্বরূপ বলি—ফলের অভাবে অসম্পূর্ণত্বরূপ পূজাফলের অভাব অর্থাৎ বলিশূন্যপূজা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ। বলির অঙ্গত্বহেতু মুখ্যফলব্যতিরিক্ত আর একটী ফললাভ হয় মাত্র।

শিষ্য। আচ্ছা। বেশ বুঝিলাম "বলি" "উপহার" উপচার নহে, কিন্তু পূজাদ্রব্য বলিলে নৈবেদ্যও ত বুঝায়, অতএব বলি উপহার হইলেও উহাকে উপচার বলা যাইতে পারে।

গুরু। বৎস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপহার উপচার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উপচার উপহার হইতে পারে না। উপহারের উপচারত্ব বৈকল্পিক অর্থাৎ হইলেও হইতে পারে, এবং নাও হইতে পারে; এই জন্য যদিও "পূজাদ্রব্য" বলিলে নৈবেদ্য বুঝাইতে পারে, তথাপি উপচার মধ্যে "নৈবেদ্য" শব্দটীর পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, উহার উপচার হইতে পার্থক্য বলিতে হইবে; কারণ এক, দুই ও ছত্রিশ প্রকার বিভিন্ন উপচার-মধ্যে নৈবেদ্যের উল্লেখ নাই—অর্থাৎ উপচার শব্দদ্বারা "নৈবেদ্য" বুঝায় না বলিয়া, যে যে স্থলে নৈবেদ্যের আবশ্যকতা আছে, সেই সেই স্থলে তাহার উপচার-মধ্যে পৃথক উল্লেখ আছে; অতএব বৎস, উপচার উপহার নহে। আর "বলি"কে পূজার দ্রব্য ধরিয়া "নৈবেদ্য" এইরূপ মনে করিতে পার না; কারণ নৈবেদ্য-নিবেদনে অর্চ্চনা ভিন্ন কোন প্রকার সঙ্কল্পবিশেষ করিতে হয় না, প্রত্যুত "বলি"-প্রদানের স্বতন্ত্র সঙ্কল্পবিশেষ একটী মহাবাক্যবিধি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—উহা কেবলমাত্র "বলি"-নিবেদনেই ব্যবহৃত হয়। সেই মহাবাক্যটী পরে বলিব। অন্য-পূজাসামগ্রীদানে তাদৃশ কোন বাক্য করিতে হয় না। বলিশূন্য পূজা দেবীর অমনোনীত হইলে, কালিকা-পুরাণে কদাপি এইরূপ উক্ত হইত না:——

"যত্র যত্র নরঃ পূজাং নির্জ্জনে কুরুতে চ যঃ।
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥"

নির্জ্জনে যে মনুষ্য পূজা করে, দেবী স্বয়ং তাহার প্রদত্ত পত্র পুষ্প ফল ও জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস, "বলিশূন্য" পূজা হইলে যে পূজা অসম্পূর্ণ হইবে—তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও অলৌকিক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! বুঝিলাম, উপচার ও উপহারে পার্থক্য আছে এবং উপহারাভাবে কোন ক্ষতি হয় না। ১ হইতে ৬৪ প্রকার উপচার কি কি এবং "বলি" তাহাদের মধ্যে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। শুনিলে বুঝিতে পারিব, পূজায় বলির কিরূপ আবশ্যকতা।

গুরু। বৎস, একে একে বলিতেছি। ইহা হইতেও দেখিতে পাইবে, "বলি" পূজায় কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে। শুন বৎস, পশুবলি যদি সর্ব্বপ্রকার পূজার প্রধান উপচার হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকটীতে উহা

অপরিহার্য্যরূপে ও অবিসংবাদিভাবে শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিয়া থাকিত, কিন্তু সেরূপ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। উপচারসমূহ একে একে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একোপচার যথা—"কেবলেন পুষ্পেণ, কেবলেন অক্ষতেন,
কেবলেন জলেন বা (শব্দকল্পদ্রুম পূজাপ্রকরণ)
—কেবল জল বা পুষ্প কিম্বা অক্ষত দ্বারা পূজা।

দ্ব্যুপচার যথা—"গন্ধপুষ্পাভ্যাং"—গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা পূজা।

ত্র্যুপচার যথা—"ধূপদীপৌ বিনা যদি"—ধূপদীপ শূন্য
পঞ্চোপচার দ্বারা।

পঞ্চোপচার যথা—"গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তাঃ পূজা পঞ্চোপচারিকাঃ"
"গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেবচ।"
প্রয়োগসারে।

সপ্তোপচার যথা—"অর্ঘ্যং গন্ধস্তথা পুষ্পং অক্ষতং ... মেবচ।
দীপং নৈবেদ্যং সপ্তাঙ্গী সপর্য্যোত্যপরে জগুঃ॥
কালীতন্ত্রে।

দশোপচার যথা—"অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ ততশ্চাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধপুষ্পেততঃপরম্॥
ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং দশোপচারকাঃ স্মৃতাঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং মধুপর্কাচমং তথা
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥
(তন্ত্রসারে)

ষোড়শোপচার দেবীপক্ষে যথা———
"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কঃ স্নানজলং বস্ত্রং ভূষণচন্দনে॥
পুষ্পং ধূপশ্চদীপশ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃপরম্।
নৈবেদ্যাচমনীয়ে তু উপাচারাস্ত ষোড়শ॥
ঐ মহাবলিতে।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনন্ততঃ।
তাম্বূলমর্চ্চনাং স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্কৃতিং।

প্রযোজয়েদর্চ্চনায়াং উপচারাংস্ত ষোড়শ ॥

অষ্টাদশোপচার :—কেৎকারীতন্ত্রে যথা—

"আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্।
স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানিচ সর্ব্বশঃ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপাবন্নঞ্চ তর্পণন্তুতঃ।
মাল্যানুলেপনেচৈব নমস্কারবিসর্জ্জনে॥
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রীপূজাং সমাচরেৎ

ষট্ ত্রিংশদুপচার—নিবন্ধে যথা :—

"আসনাদৌ দন্তকাষ্ঠমুদ্বর্ত্তনবিরূক্ষণে।
সম্মার্জ্জনং সর্পিরাদিস্নাপনাবাহনে ততঃ॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি স্নানীয়মধুপর্ককৌ।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ নমস্কারোঽথ নর্ত্তনম্॥
গীতবাদ্যে চ দানানি স্তুতিহোমপ্রদক্ষিণম্।
আদর্শ-দর্শনঞ্চৈব চামরব্যজনং তথা।
শয্যানুলেপনে বস্ত্রমলঙ্কারোপবীতকে।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বলিদানঞ্চ তর্পণম্॥
স্বাভীষ্টাত্মার্পণঞ্চৈব ততোদেববিসর্জ্জনম্।
উপচারাইমে জ্ঞেয়া ষট্ ত্রিংশচ্চণ্ডিকার্চ্চনে॥

ঐ একাদশীতত্ত্বে যথা :—

"আসনাভ্যঞ্জনে তদ্বদুদ্বর্ত্তনবিরূক্ষণে।
সম্মার্জ্জনম্ সর্পিরাদিস্নাপনাবাহনে ততঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি স্নানীয়মধুপর্ককৌ।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতকে॥
অলঙ্কারো গন্ধপুষ্পধূপদীপাস্তথৈবচ।
অনুলেপঞ্চ শয্যাচ চামরব্যজনংতথা॥
আদর্শদর্শনঞ্চৈব নমস্কারোঽথ নর্ত্তনম্।
গীতবাদ্যেচ দানানি স্তুতিহোমপ্রদক্ষিণম্॥
দন্তকাষ্ঠপ্রদানঞ্চ ততোদেববিসর্জ্জনম্।
উপচারাইমেজ্ঞেয়াঃ ষট্ত্রিংশৎ সুরপূজনে॥

অষ্টাত্রিংশদুপচার—জ্ঞানমালায়াং—যথাঃ—

"আসনং প্রথমন্তেষাং আবাহনমুপস্থিতিঃ।
সান্নিধ্যানাভিমুখ্যঞ্চ স্থিরীকৃতিপ্রসাদনে॥
অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনে মধুপর্কমুপস্পৃশং।
স্নানং নীরাজনং বস্ত্রমাচামঞ্চোপবীতকম্॥
পুনরাচামভূষেচ দর্পণালোকনং ততঃ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চ ততঃক্রমাৎ॥
পানীয়ং তোয়মাচামং হস্তবাণস্তুতিঃ পরম্।
তাম্বুলমনুলেপঞ্চ পুষ্পদানং পুনঃ পুনঃ॥
গীতং বাদ্যং তথানৃত্যং স্তুতিশ্চৈব প্রদক্ষিণম্।
পুষ্পাঞ্জলিনমস্কারাবষ্টত্রিংশৎ সমীরিতাঃ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলরাম বিদ্যারত্ন সাংখ্যভূষণ।
(ভট্টপল্লী)

রাজা রামমোহন রায়। *

ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ। যখনই ভারতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে, তখনই ভগবান্ এক একজন মহাপুরুষরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভারতে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখ, যখন আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মের নামে কেবল যাগ-যজ্ঞ, পূজা হোম, উৎসব চলিতে লাগিল, যখন আর্য্যজাতির হৃদয় হইতে অহিংসা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নৈতিক ভাবসমূহ অন্তর্হিত হইল, তখন বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমধর্ম্ম"-বাদ লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্বদ্বারা নূতন ধর্ম্মমত গঠন করিলেন

* প্রবন্ধটী—রামমোহনলাইব্রেরীতে অনারেবল ডাঃ স্যার শ্রীযুত নীলরতন সরকার এম্ এ এম্ ডি কে টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত। সভার তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২০।

কিন্তু, সাধারণ লোকে তাঁহার ধর্ম্মমত বুঝিতে না পারায়, শঙ্করাচার্য্য, বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ধ্বজা লইয়া জগদ্বক্ষে অবতীর্ণ হইলেন। রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য তাঁহাদের ধর্ম্মমত-প্রচারে রত হইলেন। তদনন্তর মুসলমানেরা ভারতে আগমন করিলে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদু প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিমার্গের পথ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর যখন ইংরাজজাতি পাশ্চাত্য-সভ্যতা লইয়া এদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন ভারতের সনাতন প্রাচীনসভ্যতা সেই পাশ্চাত্যপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ভারত-বাসী পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সংস্পর্শে আসিয়া, দিন দিন ত্যাগের পথ ছাড়িয়া ভোগ-বিলাসের পথে চালিত হইতে লাগিল। তাহারা আধ্যাত্মিক চিন্তা ছাড়িয়া আভিজাত্যের উপাসনা করিতে লাগিল। ছদ্মস্থ-চিতানলে সতোনিধবা স্থাপন করিয়া, সতীদাহের তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল। যখন অবলানারীকুলের হৃদয়ভেদী চীৎকারে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে হাহাকার উত্থিত হইল, তখন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীজেলার অন্তর্গত খানাকুলকৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর-নামক গ্রামে রামমোহন জন্মপরিগ্রহ করিলেন। তখন এদেশের রাজ-নৈতিক গগন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। মোগলের গৌরবরবি কেবল অস্তমিত হইতেছে, ধীরে ধীরে ব্রিটিশের শাসন-চন্দ্রিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে বঙ্গের শ্যামল মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। বঙ্গের এই শুভ গোধুলি-লগ্নে পুরাতনের বিস্মৃতি ও নূতনের অভ্যর্থনার শুভপ্রদোষকালে-প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই মঙ্গলময় সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহন রায় অকস্মাৎ সান্ধ্যনক্ষত্রের ন্যায় বঙ্গের গগনপটে উদিত হন। তিনি যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরই ভারতে বড়লাটের রাজপাট এবং তাঁহার মন্ত্রণাসভা স্থাপিত হয় এবং সেই বৎসরই এদেশে সুপ্রীম্‌কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুলীন—উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া "রায়" উপাধি লাভ করেন, তদবধি কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ "রায়" উপাধিতেই প্রসিদ্ধ। যেমন সকল বালকের হইয়া হইয়া থাকে, তেমনি রামমোহনেরও বাল্যশিক্ষা গুরুমহাশয়ের পাঠশালে আরব্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী এবং মৌলবীসাহেবের আরবী ও পারসী-বিদ্যালয়—এই তিনটী শিক্ষার স্থান ছিল। নবমবৎসর বয়সে রামকান্ত পুত্রকে পাটনায় আরবীভাষা-শিক্ষার্থে প্রেরণ করেন। রামমোহনের

অনন্যসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রভাবে আরবীভাষায় এরূপ বুৎপন্ন হন যে, নূন্যাধিক দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ইউক্লিড, আরিস্টটল্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থপাঠ করিতে সক্ষম হন। কে জানিত, নবমবর্ষীয় বালক রামমোহনের সুকুমার ও সুকোমল চিত্তে কোরাণপাঠ-হেতু যে একেশ্বরবাদের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা কালে মহামহীরূহে পরিণত হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষকে শাখাপ্রশাখা ও পল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে। অতঃপর আরবীভাষায় পুত্র বিশেষ বুৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া, রামকান্ত দ্বাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে রামমোহনকে সংস্কৃত-ভাষা-শিক্ষার্থে বারাণসীধামে প্রেরণ করেন। অলৌকিকপ্রতিভাসম্পন্ন রামমোহন তথায় অল্পকালের মধ্যে বেদাদি গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন রামমোহন মাত্র ষোড়শ বৎসর। রামমোহন "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক-ধর্ম্মপ্রণালী" নাম দিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধমতসম্পন্ন একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তখন সমগ্রদেশ সাকারোপসনায় নিমগ্ন। পিতা রামকান্ত পুত্রের এইরূপ বিসদৃশভাব-দর্শনে ব্যথিত, দুঃখিত, মর্ম্মান্তিক আঘাতপ্রাপ্ত ও পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। ফলে পিতাকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রামমোহন—ষোড়শবৎসরবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু বালক রামমোহন একাকী নিঃসম্বলে পদব্রজে ভারতের নানাস্থান ভ্রমণানন্তর দুর্লঙ্ঘবন্ধুর হিমাচল অতিক্রম করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের পীঠস্থান তিব্বতে গিয়া উপনীত হইলেন। দীর্ঘ চারি বৎসর বনবাস-জীবনযাপন করিয়া, নির্ব্বাসিত রাম গৃহে ফিরিয়া আসিলে, হারাধনকে বুকে করিয়া, পিতা রামকান্ত, শত শত চুম্বন করিলেন। অতঃপর রামমোহন পিতৃঅভিলাষ পূরণার্থ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হইলে কি হয়? দেশের সেবা, সমাজের সংস্কারই যাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি কি সামান্ত কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? রামমোহন পুনর্ব্বার দেশের প্রচলিত কুসংস্কাররাশি দূর করিবার অভিপ্রায়ে পিতার সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—ফলে আবারও রামমোহন গৃহবহিষ্কৃত হইয়া রাস্তার দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর ১২১০ সালে রামকান্ত স্বর্গারোহণ করিলে, রামমোহন পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিয়া, অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। রামমোহন রংপুরের কালেক্টরীর অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম লইয়া পরিশেষে দেওয়ানী-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮০০ সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন গবর্ণমেণ্টের

অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, এই কর্ম্ম করিবার সময় রামমোহন ইংরাজীশিক্ষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, ডিগ্বী সাহেবের ভাষায় বলিতে হয়—"তিনি ইংরাজী ভাষায় এপ্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি শুদ্ধরূপে ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।"

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রামমোহন কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সাধারণ কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁহার কায়, মনঃ, বাক্য-এই তিনটি এই সময় হইতে স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত হয়। তখন হিন্দুসমাজের অবস্থা এরূপ সুসংস্কৃত ছিল না। বলি, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণব-সেবাই তখন হিন্দুসমাজের প্রধানতম ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কেহ সন্ধ্যাবন্দনা করুক বা না করুক, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা যে কোন প্রকার পাপ করুক, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাইত। তখন চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর এই কয়েকখানি কবিতা-গ্রন্থই লোকের প্রধান অধ্যয়নোপযোগী গ্রন্থ ছিল। বিষয়কর্ম্মের উপযোগী যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিতে পারিলেই লোকে যথেষ্ট বিদ্যা হইয়াছে বলিয়া মনে করিত। আর কবির লড়াই, ঘুড়ির খেলা তখনকার যুবকদের প্রধান আমোদ ছিল। রামমোহন এই সকল কুপ্রথা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন—জয়-জয়-নাদে তাঁহার বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সংসারে যাঁহারা কোন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন পঙ্গপালের ন্যায় তাঁহাদের শত্রু-সংখ্যাও চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হয়। একথার জাজ্বল্যমান সাক্ষী মহম্মদ। রামমোহনও আপন অভীষ্ট সাধনে বৈরিমুক্ত ছিলেন না। কিন্তু, শত ঝঞ্ঝাবাতেও তিনি অচল অটল স্থাণুর ন্যায় সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি কথোপকথন, বিদ্যালয়-সংস্থাপন, পুস্তকপ্রচার ও সভাস্থাপন এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে দেশের কুরীতিগুলি বিদূরিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৭৩৭ শকে রামমোহন বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যে তিনি সাকারউপাসনার মত খণ্ডন করিয়া, নিরাকার-উপাসনা-প্রতিপাদন-কল্পে ভূমিকায় বলেন—"যদি কোন ব্যক্তি শৈশবকালে শত্রুহস্তে পতিত হইয়া দেশান্তরে নীত হয়, তাহাহইলে সে আপনার পিতার সংবাদ কিছুই জানিতে পারে না। সে যুবা হইলে যে, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে দেখিবে, তাহাকেই পিতা বলিয়া গ্রহণ করিবে, এরূপ হইতে পারে না।

সে যদি পিতার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করে, অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করে, তবে সে সময়ে সে ব্যক্তি বলিবে যে, যিনি জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয়ঃ হউক। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় না হইলেও জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহারকরূপে তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে। নশ্বর সাকার বস্তু কিরূপে উপাস্য হইতে পারে?" রামমোহনের কর্ম্মক্ষেত্র শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বমতে আনিবার জন্য বেদান্তভাষ্যের ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শীঘ্রই দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত রামমোহনের নিরাকারবাদ লইয়া তুমুল আন্দোলন-তরঙ্গ উত্থিত হইল। মান্দ্রাজ হইতে শঙ্করশাস্ত্রী নামক জনৈকপণ্ডিত রামমোহনকে লিখিলেন যে, "একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা বেদসম্মত হইলেও দেবদেবীর উপাসনা মিথ্যা নহে। উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করিতে গেলে যেমন স্তরে স্তরে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করা আবশ্যক, তদ্রূপ নিরাকার পরব্রহ্মকে লাভ করিতে গেলে, সাকাররূপ স্তরগুলি অতিক্রম করা আবশ্যক।" রামমোহন তদুত্তরে লিখিলেন, "পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ করা নিশ্চয়ই কঠিন, এমন কি তাঁহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু, যে ব্যক্তি সহজজ্ঞানসম্পন্ন এবং পূর্ব্ব হইতেই যিনি কুসংস্কারশৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার পক্ষে মনুষ্যের হস্তনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা যত কঠিন, জগৎকার্য্যে পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করা তত কঠিন নহে।" এই ভাবে ভারতের নানাজাতীয় পণ্ডিত-গণের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াও রামমোহন আপন সংকল্পে দৃঢ় থাকিলেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "অনুষ্ঠান" "ব্রহ্মোপাসনা" "প্রার্থনাপত্র" "আত্মানাত্মবিবেক," "ক্ষুদ্রপত্রী" নামে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি লোকের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিত। এস্থলে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত উদ্ধার করিলাম :—

"একদিন যবে হবে অবশ্য মরণ
তবে কেন এত আশা, এত দ্বন্দ্ব কি কারণ?
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে কর এ স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ॥
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগপরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ-নাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ॥"

কি বিশ্বজনীন প্রেম! এ সঙ্গীত শুধু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নয়, এ সঙ্গীত সর্ব্ববাদিসম্মত—বিশ্ববাসীর সঙ্গীত।

রামমোহন শুধু যে হিন্দুপণ্ডিতগণের সহিত বাদানুবাদ করিয়া নিরস্ত হইলেন তাহা নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রীগণও তাঁহার তর্কজালে পড়িল। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি গ্রীক্‌ভাষা শিক্ষা করিয়া বাইবেলের মূলগ্রন্থ এবং হিব্রুভাষা শিক্ষা করিয়া পুরাতন বাইবেলের মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Precepts of Jesus, guidets peace and happiness নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীরামপুরের মার্সমান্ সাহেব উক্ত পুস্তকের নিন্দাবাদ করায় তিনি An appeal to the christian public, ও second appeal to the christian public নাম দিয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রদর্শন করেন যে, "ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও খৃষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি মত বাইবেলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিশনারিগণ বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই ঐ প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন।" ইহাতে সমস্ত খ্রীষ্টানসমাজ রামমোহনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি, তিনি Final appeal নামক পুস্তকখানি মুদ্রিত করাইতে পারিলেন না। তখন তিনি অক্ষরাদি প্রস্তুত করিয়া Unitarian press নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিলেন। Final appeal প্রকাশিত হইল—মার্সমান্ পরাভব স্বীকার করিলেন এবং অনতিবিলম্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার গ্রন্থ-চতুষ্টয় প্রচারিত হইল। অতঃপর রামমোহন চিৎপুররোডের পার্শ্বে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া "ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তথায় সমাজের কার্য্য আরব্ধ হয়। তিনি সেই সমাজের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে Trustdeed পত্রে স্বয়ং লেখেন—"For the worship and adoration of the eternal, unsearchable and Immutable being who is the author and preserver of the universe, but not under or by any other name, designation or title, used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever*

For a place of public meeting of all sorts and descriptions, of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religions and devont manner.

That no graven image, statne or sculpture carving, painting, picture, portrait or the likness of any thing shall be admitted within the said messuage building, land, premises and that no sacrifice, offering or ablation of any kind, or of any thing shall ever be permitted there in and that no animal or living creatures shall within or in the said messuage be deprived of life, either for food or for religious purposes and that no eating and drinking, feasting or rioting be permitted therein or theron" ইত্যাদি। এই Trustdeed এর সমস্ত অংশ পাঠ করিয়া আমি শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে চাহিনা, তবে মহাত্মার আদেশ কত পরিমাণে আধুনিক ব্রাহ্মসমাজে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিগণই বিচার করিবেন।

অতঃপর সতীদাহ-প্রথার কথা স্মরণ করিয়া রামমোহনের শরীর শিহরিয়া উঠে। তিনি এই কুপ্রথার উচ্ছেদ করিবার মানসে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি এই সমস্ত পুস্তকে বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে প্রমাণবাক্যাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করেন যে, স্ত্রীলোক ভগবানে মন নিবিষ্ট করিতে পারিলে, বাল-বৈধব্য অবস্থাতেও চিত্তবৃত্তি অচঞ্চল রাখিতে পারে। যথাঃ—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ রামমোহনের তর্কযুক্তি শুনিয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এই সর্ব্বনাশী প্রথা উঠাইয়া দিয়া বঙ্গের ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুনারীর জীবন রক্ষা করিলেন। ইহার পর রামমোহন বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করিয়া বঙ্গের কুলবধুগণকে সপত্নীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। অধুনা যেমন পুত্রবিক্রয়ের পদ্ধতি প্রবলবেগে চলিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অনুসারে পাত্রের দর যাচাই হইতেছে, সেইরূপ রামমোহনের সময়ে কন্যাবিক্রয়ের রীতি ছিল। কন্যার পিতা অনেক সময়ে অর্থলোভে বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, শ্বাসকাসগ্রস্ত মৃত্যুপথের পথিক যষ্টিভর বৃদ্ধের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। রামমোহন এ প্রথার বিরুদ্ধেও বিবিধ শাস্ত্রমত উদ্ধৃত করিয়া লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত

করার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া বলিতে লাগিলেন—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ।"

অর্থাৎ জন্ম হইলে সর্ব্বসাধারণ লোক শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ-শব্দবাচ্য হয়, বেদাভ্যাসদ্বারা বিপ্র; আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন।"

অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই শুধু ব্রাহ্মণ, আর কেহই নহেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি "বজ্রসূচি"-নামক জাতিভেদসংক্রান্ত পুস্তকের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

এদেশে ইংরাজীশিক্ষা-প্রচলনের জন্য যে শুধু আমরা মহাপ্রাণে ডেভিড্ হেয়ার ও লর্ড মেকলের নিকট ঋণী, তাহা নহে, রামমোহনও এবিষয়ে আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। দেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করেন যে, শুধু সংস্কৃত ও পার্শী-শিক্ষা দ্বারা দেশের কুসংস্কার গুলি দূরীভূত হইবে না। তিনিই প্রথমে অনুভব করেন যে, এদেশকে অবনতির কুহেলিকা হইতে দীপ্ত আলোকে আনিতে গেলে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানরাশি অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড আম্‌হার্ষ্টের নিকট এ বিষয়ে যে দীর্ঘ চিটি লিখিয়াছিলেন, সে চিটির প্রত্যেক পদে তাঁহার ইংরাজীশিক্ষা-প্রচলনের আবশ্যকতা-আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত। যে তিন জন মহাপ্রাণের চেষ্টায় কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের অন্যতম। এদেশে রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাগদ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সাধারণতঃ আমরা রাজা রামমোহনকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা ও সতীদাহ-প্রথার নিবারণকর্ত্তা বলিয়াই জানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তিনি কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সাহিত্যনীতি সর্ব্বদিকেই আপনার প্রতিভা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারশ্য-ভাষায় দুইখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এই যে দেশে Press act লইয়া এত আন্দোলন, এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলনকর্ত্তা রাজা রামমোহন। রাজা রামমোহন নিয়মতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়া, এতাদৃশ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নিজব্যয়ে টাউনহলে একটি ভোজ দিয়াছিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। দিল্লির বাদশাহ তাঁহাকে "রাজা" সনন্দ দিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া রামমোহন তত্রত্য রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট অশেষ সমাদর পান। ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার "রাজা" উপাধি মঞ্জুর করেন। তিনি তথায়, ১৮৩১ এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে যে একটী কমিটী নিযুক্ত হয়, সেই কমিটিতে, এদেশের রাজস্ববিভাগ, বিচারবিভাগ ও সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়া বলেন—Under both systems the condition of the cultivators is very miserable, in the one, they are placed at the mercy of the Zaminder's avarice and ambition; in the other, they are subjected to the extortions and intrignes of the surveyors and other Govornment revenue officers" ইত্যাদি। এদেশীয় দিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রামমোহন কমিটীর সমক্ষে অনুকূল সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ইহাছাড়া সে দেশে তিনি (1) An essay on the rights of Hindoos over ancestral property (2) Future Govornment of the country. (3) Exposition of the Practical operation of the judicial and Revenue system of India. (4) Translation of several principal books (5) Controversial works on Brahmanical Theology.

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরমাসে রামমোহন বৃষ্টলনগরে গমন করেন। এখানে ২৮ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের গগন হইতে একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়ে। ব্রিষ্টলনগরে তাঁহার সমাধিমন্দিরে অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিগাথা খোদিত রহিয়াছে।

হে বঙ্গের আশাভরসাস্থল যুবকবৃন্দ, তোমরা কি শুধু রামমোহনের জীবনী শুনিবার জন্য আসিয়াছ? যে সত্যে অনুপ্রাণিত হইয়া—যে আদর্শে পরিচালিত হইয়া, রাজা রামমোহন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই সত্য ও আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া, যদি সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পার, তবেই তো তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষিত হয়। রামমোহন শুধু ব্রাহ্মসমাজের রামমোহন নয়, রামমোহন বিশ্বজগতের নায়ক—পরিচালক—সেনাপতি

রামমোহনের জীবনী—রামমোহনের সাধনা আমাদের আদর্শ হোক। আমরা তাঁহারই মত দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সংস্কার করিতে হিমাদ্রির ন্যায় অচল-অটল হই। তবেই তাঁহার স্মৃতি আমাদের মানস-মন্দিরে রক্ষিত ও পূজিত হইবে। আজ তাঁহারই মত আমরা একপ্রাণে—একতানে সমস্বরে গাহি—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া,　　কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ　　সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধানে　　ত্যজ দম্ভ অভিমানে
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, কর সত্যেতে নির্ভর। *

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

হরিভক্তিং বিনা যেচ, ধর্ম্মানুপদিশন্তিহি।
পাতয়েয়ুস্তে বৈ বংশ্যান্, স্বাত্মানং নরকং ধ্রুবং।

যাঁহারা হরিভক্তি বিনা ধর্ম্ম-উপদেশ করেন, তাঁহারা স্বীয়বংশোদ্ভবদিগকে ও নিজেকে নরকে পাতিত করেন। অতএব হরিভক্তি-উপদেশ করাই জীবনের মুখ্যব্রত হওয়া আবশ্যক। সেই নন্দনন্দন ভগবান্ হরিই

---

* মহাত্মা রাজা রামমোহনের ধর্ম্মমত ও সমাজসংস্কার-সম্পর্কের কার্য্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ হিন্দুসমাজ অকাতরে গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা তাহা করিতেও বলি না। তবে, রামমোহনের জীবনকথা হইতে অনেক শিখিবার জিনিষ পাওয়া যায় মনে করিয়া, আমরা এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।
হিঃ পঃ সঃ।

আমাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ, তিনিই আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাকেই ভালবাসি। আমাদিগের যাবতীয় ইন্দ্রিয়, মনোবৃত্তি, বুদ্ধি তাঁহারই প্রীতি-অনুষ্ঠানে উন্মুখ না হইলে সমস্তই বৃথা ও নিন্দনীয়। এমন কি, কামাদি রিপুও যদি তাঁহারই জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাতেও মনুষ্য-জন্ম সফল, নচেৎ সমস্তই বিফল। জন্মজন্ম বিষয়বাসনায় আসক্ত হইয়া জনন-মরণরূপ সংসার-সাগরাবর্ত্তে জীব কখনও ডুবিতেছে, কখনও উঠিতেছে, কখনও ভাসিতেছে,—বিশ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই; নিরবচ্ছিন্ন অশেষ যাতনা। এই সংসার-সাগরের বেলা-ভূমি সেই ভগবানের চরণযুগল। যখন জীব সেই বেলাভূমে উপনীত হইবে, তখনই চিরশান্তি লাভ করিবে। তীর্থ, ধর্ম্ম, দান, ধ্যান, যোগ, যাগ, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, আচার, আহ্নিক, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ সমস্তই সেই প্রেমাস্পদকে পাবার জন্য। যাহাতে তাহা না ঘটে, তাহা বিধিবিহিত হইলেও পণ্ডশ্রম। এই ক্ষুদ্র হৃদয়-মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া দেখিয়াছি, তবুও অতৃপ্তি ঘুচেনা। মন যেন কিছু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। সেই কিছুই বিষয় ভিন্ন স্বতন্ত্রবস্তু, আনন্দময়, রসময়, তৃপ্তিময় ভগবান্। সেই আনন্দসমুদ্রে মিলিতে না পারিলে কিছুতেই অতৃপ্তি ঘুচিবে না, কিছু-তেই জীবনপ্রবাহ বিশ্রান্তিলাভ করিবে না। তিনি অরূপ হইয়াও ভক্তের নিকট বাঞ্ছিতবিগ্রহ, নির্গুণ হইয়াও সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহারই শক্তি বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত। করচরণাদিহীন হইয়াও তিনি ভক্তদত্ত ভক্ত্যুপহার, পত্র, পুষ্প, ফল, জল গ্রহণ করেন। অচক্ষু হইয়াও সমস্ত দেখিতে পান, অশ্রোত্র হইয়াও সমস্ত শুনিতে পান। তিনি ভক্তানুগ্রহার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়া, বিবিধ লীলা-বিলাস-প্রদর্শন-পূর্ব্বক জগদ্বাসীকে শিক্ষা দেন। সেই অনন্তশক্তিশালী পুরুষের শক্তি আমাদের সর্ব্বথা দুরধিগম্য। তাঁহার সত্তা, তাঁহারই কৃপা ব্যতীত কেহই স্বীয়শক্তিতে অনুভব করিতে পারেনা। তিনি পতিতউদ্ধারের জন্য ভক্তহৃদয়ে প্রকট হইয়া পতিতপাবন-নাম সার্থক করেন। আমরা অজ্ঞানান্ধ, তাই তাঁহার অপার করুণার বিভূতি কিছুই দেখিতে পাই না। যাঁহারা স্থিরচিত্তে, জল, স্থল, উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পর্ব্বত, নদী, সাগর, সৌরজগৎ, ভূগর্ভ, মনুষ্যতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা কখনই জগদীশ্বরের অপার মহিমাকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজ-

মান, তাঁহারই প্রতি মনের অবিশ্বাস। অহো কি আশ্চর্য্য। যেদিকে নয়ন ফেলি, সেই দিকেই তাঁহারই বিভূতি দেখিতে পাই, তবুও ভ্রান্ত মন, তাঁহাকে চিনিতে পারে না। যেমন নলিনীনালদণ্ডতলস্থিত ভেক, কর্দ্দম আস্বাদন করিতে থাকে, কখনও নলিনীর মকরন্দবিন্দু আস্বাদনের সুখ পায় না; সেইরূপ বিষয়বিষস্বাদাসক্ত জীবও হৃদয়বর্ত্তী রসময়ের রসস্বাদ প্রাপ্ত হয় না। যাহার আস্বাদ পাইলে, তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হয়, যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা চিরতৃপ্তি লাভ করে, সে তাহা চিরদিনই অজ্ঞাত থাকে। অবিজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত নিধির ন্যায়, সে তাহা জানিতে বা ভোগ করিতে পায় না। তাহার দুঃখ, দৈন্য, কখনই ঘুচে না। তখন প্রাণের তৃষ্ণার তীব্র তাড়নায়, ধন, যশ, বিদ্যা, বিভব, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী, ভৃত্য, দেহ, গেহ প্রভৃতির অবিতৃপ্ত নেশায় সেই তীব্র তৃষ্ণা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু, নেশার অপগমে ঘোর অবসাদ, আবার সেই দারুণ তৃষ্ণা জাগিয়া উঠে। এ জগতে, ধনে, মানে, বিষয়-বিভবে কে কোথায় সুখী হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তাহা ক্ষণিকের জন্য তীব্র যাতনা ভুলিবার জন্য। সে বিকারের তৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। প্রাণ ভরিয়া পান কর, তবু পিপাসা মিটিবে না। পুত্রকে জরা-ভার দিয়া যযাতি রাজা, পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু, কিছুতেই পিপাসা ঘুচিল না। তখন রাজা বুঝিলেন, এভাবে পিপাসা মিটিবার নহে। লোকে যোগ-তপস্যা করে, স্বর্গাদি-প্রাপ্তির জন্য। স্বর্গেও সে মর্ত্তলোকের মত, রম্যগৃহ, শয্যা, যান, বাহন, তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যার কামনা করে। এখানে যে পিপাসা বিদ্যমান ছিল, স্বর্গেও সেই পিপাসা। তবে প্রাণান্ত কষ্টের ফল কি হইল? তখন ব্যাকুল হইয়া যাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়! আমার এই প্রাণান্ত পিপাসা মিটিবে কিসে?" তিনিও তাহারই মত একজন; উত্তর দিবেন কি, তিনিও নিরুত্তর। আবার যাকে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়! আমার এ প্রাণান্ত পিপাসা নিবৃত্ত হইবে কিসে?" সবাই তারই মত, সুতরাং উত্তর মিলিবে কি? ঘুরিতে ঘুরিতে যদি মহানুভব সাধুর দেখা পায়, তখন তাঁহাকেও ঐ প্রশ্ন করে। তিনি বলেন,—"বৎস! যোবৈ ভূমা তৎসুখং। নাল্পে সুখমস্তি।" সেই ভূমা, সেই বিরাট্‌পুরুষ, তিনিই একমাত্র সুখময়, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর, তবেই তোমার প্রাণান্ত পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। দেশকালপরিচ্ছিন্ন সসীম কোন বস্তুতেই সুখ নাই। তখন তৃষ্ণাতুর পথিক বলে,—"তিনি কোথায়, পাইব কিরূপে?" সাধু বলেন—"ঈশ্বরঃ

সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" সেই ভূমা বহু দূর নহে, তোমার হৃদয়েই আছেন। মায়াযবনিকাচ্ছন্ন তোমার নয়ন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। যবনিকা সরাইয়া দাও, দেখিতে পাইবে, সেই সজলজলদ অঙ্গভঙ্গী হৃদয় মাঝে, হেরিলে মনপ্রাণ শান্তিসাগরে ডুবিবে। তখন বুঝিতে পারিবে, জগতে তদপেক্ষা অন্য কোন বস্তু লাভই তাহার পরার্দ্ধ অংশের একাংশ-তুল্য নহে। চির পিপাসা—চির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নিবৃত্ত হইবে। মায়ার কুহকে প্রতারিত হইয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলে। অপারদুঃখ পেয়ে তুমি তাকে ছাড়িতে চাও, কিন্তু, সে তোমায় ছাড়েনা। ছেলেরা খেলাকরে, বুড়ি ছুইলে আর কেঁদে পড়েনা, সেইরূপ সেই প্রাণ-বল্লভকে ছুঁইলে আর মায়া তোমার কাছে দাঁড়াইবে না। তবেই দেখ, সমস্ত দুঃখের অবসান হবে সেই দিনে; যেদিন, দীনবন্ধুর দর্শন পাইবে। তিনি আনন্দঘনরূপী, রসময় প্রেমময়, তাঁর দয়া হ'লে হৃদয়েই দেখা পাইবে।

ভগবদ্বিষয়ক দৃঢ়নিশ্চয় একদিকে, আর সমস্ত শাস্ত্র অন্যদিকে, তৌলদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, কোনটী শ্রেষ্ঠ হইবে।

সেই দৃঢ়নিশ্চয়কে বনিয়াদ করিয়া তাহার উপর ভক্তি-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই সেই প্রেমাস্পদকে পাইবে। ভক্তিবশঃ সবৈপুরুষ ইতি শ্রুতেঃ॥ সেই পুরুষোত্তম পুরুষ এক মাত্র ভক্তির অধীন। তাঁহাকে হৃদয়-আবাসে বাঁধিতে হইলে ভক্তিরজ্জু দৃঢ় করা আবশ্যক। ইহাতে বিত্ত-বিভব কিছুই আবশ্যক করে না, একমাত্র মনের দ্বারাই তাঁহাকে ধরিতে পারা যায়। যে ধরিতে জানে, সেই ধরিতে পারে। হতভাগ্য ব্যক্তি অসম্ভব মনে করিয়া কাচমূল্যে মণি বিক্রয় করে—আপাতরম্য বিষয়সুখেই আত্মবিসর্জ্জন করে। বিশ্বপাবন সাধু মহাত্মারা সেই হত-ভাগ্যদিগের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। কেহ, একটু জড় বিজ্ঞানের নূতন একটা কিছু আবিষ্কার করিল, কেহ অতুল বিত্ত-বিভব অর্জ্জন করিল, অমনি জগতে লোকসমাজে "ধন্য ধন্য" শব্দ উত্থিত হইল। কিন্তু, তাহাতে পারত্রিকের কি লাভ হইল? এই আত্মাই আপনার বন্ধু, আবার কার্য্য-বশতঃ এই আত্মাই আপনার শত্রু। যে স্বীয় গুণে আত্মাকে মায়ামুক্ত করিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেই কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া, জীবনের আরাধ্যধন সেই নন্দনন্দনকে না পাইয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে না। তাহাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সচরাচর মানব, সাংসারিক বিষয়ে যতটা প্রবল আসক্তি প্রদর্শন করে, তাহার এক চতুর্থাংশ ও ধর্ম্মের জন্য আসক্তি প্রকাশ করে না। পতির পত্নীর জন্য, পত্নীর পতির জন্য, তদুভয়ের অপত্যের জন্য, পরস্পর মনের যে আকর্ষণ, ভগবানের জন্য তদপেক্ষা ও উৎকট মনের আকর্ষণ হওয়া উচিত। যেহেতু, তিনিই প্রকৃত প্রেমাস্পদ, তিনিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা সচরাচর যাহা প্রেম মনে করি, তাহা প্রেম নহে, মনের দীর্ঘ প্রবণতা মাত্র। কারণ, তাহাতে ভাববিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ দুঃখ আছে, হর্ষ বিষাদ আছে। যথার্থ প্রেমে উহা কিছুই নাই; প্রেমাস্পদকে সর্ব্বস্ব দান করাই সুখ, প্রতিদানের আশা তথায় নাই। এখন সকলেই ভাবিয়া দেখুন ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রতি গোপীদিগের যে প্রেম, সে এইরূপ সুতরাং তাহা কত উচ্চ অনুধাবন করাই দুঃসাধ্য। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম সাধারণ নায়ক নায়িকার ভালবাসা মনে করেন, তাঁহারা স্বভাবতই ভ্রান্ত। যদিও উহা মূঢ়ের হস্তে বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে উহা দেবাদির ও দুর্লভ, মনুষ্যের অনুভব যোগ্য নহে। যিনি ভাবময়, যিনি জ্ঞানময়, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি, তাঁহাকে মনের ভাব জানাইতে আর কষ্ট পাইতে হইবে কেন? তিনি মনেরও অধীশ্বর সুতরাং মনের ভাব তাঁহার কাছে জানাইতে হইবে না; তিনি হৃদয়েই বিরাজমান আছেন। দূরে যাইতে মন্দিরে, কান্তারে চত্বরে, ভূধরে সাগরে, তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবেনা। প্রভু ভাবে, সখ্যভাবে, পুত্রভাবে, ঈশ্বর ভাবে, পতি ভাবে, যে ভাবেই তাঁকে ভাব, সেইভাবেই তাঁকে পাইবে। মিথ্যা কথা নহে, প্রলোভন নহে, যাহারা পাইয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁকে পাওয়া যায় কি না? ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সম্মুখে বিদ্যমান আছে, আর বলিতে হইবে কেন? যদি বল ও পথে বড় কষ্ট, বড় ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। বলি তোমার বাঞ্ছিত পথে কষ্ট নাই স্বার্থ ত্যাগ নাই? এমনকি, ধন, জন দারা পুত্রের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত লোকে বিসর্জ্জন দিতেছে। তবে সে স্থলে ফলাভিসন্ধান মূলকত্যাগ, সুতরাং সে ত্যাগে মুক্তি নাই, বরং বন্ধন আছে। আর ভগবানের জন্য মুক্তির জন্য যে স্বার্থত্যাগ, যে সংসারত্যাগ, যে জীবন ত্যাগ, তাহা বন্ধের কারণ নহে, সুতরাং তাহাই প্রকৃত ত্যাগ, ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন, ত্যাগী না হইতে পারিলে প্রাণেশকে পাওয়া যায় না। যদি কেহ পদ্ম পত্রের ন্যায় সংসারসলিলে থাকিয়া ও সেই প্রাণধনের রাতুল চরণে

দেহ মন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, অবশ্য তিনি মহাজন, তিনি ধন্য। তবে বিষয়ের এমনই প্রবল আকর্ষণ যে, নারিকেল বৃক্ষের শাখা পতিত হইলেও যেমন চিহ্ন থাকে, সেইরূপ সংসার ত্যাগ করিলেও সংস্কার দেহ পতনাবধি থাকে। সূত্রে মুক্তারাজি গাঁথা হইলে, তাহাকে মালা বলে। কিন্তু যেমন সূত্রই মালা নহে, মালার সহায়ক মাত্র। সেইরূপ ভগবান্ সর্ব্ব-বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও সর্ব্ববস্তু ও ভগবান্ একবস্তু নহে। এই জগৎ সৎ ও নহে, অসৎও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণ। সূর্য্য হইতে মেঘ উৎপন্ন হয় বলিয়া মেঘও সূর্য্য একবস্তু নহে। তবে, সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যের সম্বন্ধ তাহাতে আছে, ইহা বলিতেই হইবে। সেইরূপ, ভগবান্ হইতে জগৎ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া জগৎ ও ভগবান্ একই বস্তু নহে। তবে তাহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া একেবারেই মিথ্যা নহে। প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে চৈতন্যের সাড়া পাওয়া যায়। অনেকে বলেন জীবাণুপুঞ্জই স্থূল জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাহউক, এই জগৎ, জড় ও অজড়ের সংমিশ্রণ ইহা নির্ণীত হইয়াছে। কার্য্যরূপে বিনশ্বর, কারণরূপে অবিনশ্বর। যদি মহাপ্রলয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, পরবর্ত্তী সৃষ্টি কালে তত্তৎ বস্তুর বীজ বা কারণ কোথা হইতে আসিবে? যদি বল, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তাহাহইলে, তাঁহাকে সাবয়ব, অর্থাৎ হস্তপদাদি বিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, তিনিও বিনশ্বর হইবেন, কারণ, সাবয়ব মাত্রেই নশ্বর। বিশেষ প্রয়োজনাভাবে তাঁহার সৃষ্টি করাও অসম্ভব প্রতীতি হয়। সুতরাং প্রকৃতিতে অর্থাৎ ভগবানের কোষাগারে সমস্ত বস্তুর বীজ সূক্ষ্মাকারে নিহিত থাকে এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে ভগবানের ইচ্ছায় তত্তৎ বীজ হইতে তত্তৎ বস্তু উদ্ভব হইতে থাকে। সৃষ্টির বৈচিত্র্যবিধানমাত্র জড়ের কার্য্য মনে করা যায় না। সুতরাং চৈতন্য নিরপেক্ষ মাত্র প্রকৃতি হইতে বিচিত্র কৌশলময় জগৎ উৎ-পন্ন হওয়া অসম্ভব। শূন্য হইতে জগৎ বিকাশ হওয়াও অসম্ভব। কখন অভাব হইতে ভাববস্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ভাবচৈতন্যের সর্ব্বকারণ কারণত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেখানেই প্রকৃতধর্ম্মের আরম্ভ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ, জ্ঞান, সবাই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। যতদিন না আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিতে না পারি, ততদিন সেই জগতের অতীত অনন্ত প্রেম সমুদ্রের আভাস পাইবারও আমাদের আশা

নাই। অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির চরম গতি লাভ করিবার সেই ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ। যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই জগৎকে ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কে পাইব! সংসার মায়া পাশ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া। যেখানেই এই জগৎ আছে, সেইখানেই কার্য্যকারণ শৃঙ্খল বর্ত্তমান। কিন্তু এই জগৎকে ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকেই সংসার ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে সংসার ত্যাগের দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে। একটীকে নিবৃত্তি মার্গ বলে, উহাতে নেতি নেতি (ইহা নহে ইহা নহে) সমুদয় ত্যাগ করিতে হয়। আর একটীকে প্রবৃত্তি মার্গ কহে, উহাতে ইতি ইতি করিয়া সমস্ত বস্তু ভোগ করিয়া তারপর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল বিশেষ উন্নতমনাঃ প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষদের সাধ্য। তাঁহারা কেবল বলেন, আমি ইহা চাই না, বলিবা মাত্র শরীর মন তাঁহা-দের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়। তখন তাঁহারা সংসারের বাহিরে চলিয়া যান। অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তিমার্গই গ্রহণ করে, তাহাতে এই জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। এই বন্ধন গুলিকেই বন্ধনভঙ্গের সহায়তারূপে গ্রহণ করিতে হয়। তবে উহাতে ত্যাগ, ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ। উহাতে সমস্ত পদার্থকে জানিতে হয়, ভোগ করিতে হয়।

এইরূপে উহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, উহাদের স্বরূপদেশ করিয়া জানিতে পারিলে মন তবে উহাদিগকে ছাড়িতে পারিবে। প্রথমোক্ত মার্গের সাধনবিচার, আর শেষোক্তের কার্য্য। প্রথমটী জ্ঞানীর জন্য, তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন; দ্বিতীয়টী কর্ম্মযোগ। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই জগতে কার্য্য করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, তাহাদের কর্ম্ম না করিলেও চলে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। একটী জলস্রোত স্বভাবতঃ কোন নদীর অভিমুখে স্বাধীনভাবে গমন করিতে করিতে একটী গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বহির্গত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যজীবন এই স্রোতের তুল্য। উহা ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়াছে—নামরূপাত্মক জগতের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কিছু সময়, আমার বাপ, আমার মা,

আমার নাম, আমার যশঃ প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করিতেছে, অবশেষে উহা আবার বাহির হইয়া নিজের মুক্তভাব পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছে। সবাই এই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে আবার ঘুর্ণির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আমরা দেখিতেছি সমুদয় জগৎ কার্য্য করিতেছে, কিসের জন্য? মুক্তির জন্য, ভগবান্‌কে পাইবার জন্য। পরমাণু হইতে মহোচ্চপ্রাণী পর্য্যন্ত সেই একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছে। সবাই বন্ধন হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। যখনই আমরা আপনাকে কার্য্যের সহিত মিশাইয়া ফেলি তখনি আমরা নিজেকে দুঃখী বলিয়া মনে করি। নিজের ক্ষতি হইলে নিজেকে দুঃখী মনে করি, পরের ক্ষতিতে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিনা। চিত্তের যে কোন তরঙ্গ হইতে আমি আমার উত্থিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাস করিয়া তুলে। যতই আমরা, আমি, আমার বলি ততই আমারা দাসত্বের ক্রীতদাস হই, দুঃখ ততই বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য শাস্ত্র বলেন, জগতের যত ছবি আছে, সমুদয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর, কিন্তু উহাদের সহিত আত্মাকে মিশাইওনা, আমার কখনও বলিও না। ছেলেকে লইয়া আদর কর, তাহাকে লইয়া আনন্দ কর, কখনও আমার বলিও না। স্বার্থজাল বিস্তৃত হইলেই দুঃখ বাড়িবে। সমুদয় কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে পারিলেই অনাসক্তি জন্মে। যাঁহারা তাদৃশ ব্যক্তি, তাঁহারা নিজকে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র মনে করেন। তাঁহার নিকট মন, প্রাণ বলি স্বরূপে দান করেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির পরিবর্ত্তে তাঁহারা দিবারাত্র এই অহংকে আহুতি দানরূপ মহাযজ্ঞ করেন। জগতে ধন অন্বেষণে গিয়া তোমাকে একমাত্র ধন পাইয়াছি, আমি তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। সমুদয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মনে করিতেছি—এসবই তাঁহার। আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়াছি এই জন্যই আমরা ধন্য। আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি মাত্র। কে জানে আমরা ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি। উত্তমরূপে করিলেও আমরা ফল প্রার্থনা করিব না। মন্দভাবে করিলেও তাহার জন্য চিন্তান্বিত হইব না। যাহাকে সচরাচর কর্ত্তব্য বলা যায়, তাহা আর কি? উহা কেবল আসক্তি, কর্ম্মপরতন্ত্রতা মাত্র। কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা তাহাকে কর্ত্তব্য আখ্যা দিয়া থাকি। যেমন স্ত্রীর পরতন্ত্রতা নিবন্ধন বিবাহ এখন কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। উহা এক প্রকার চিরস্থায়ী ব্যাধি মাত্র। আসক্তি

প্রকৃতিগত হইয়া গেলে, আমরা উহাকে কর্ত্তব্য ঝগলম্বাচোড়ানামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই, ঢেঁট্‌রা পিটিতে থাকি, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া লই। কিন্তু উহা সর্ব্বথা গর্হিত, পরিত্যজ্য। সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ কর, এই সংসার ভয়ানক অগ্নিময় কটাহে যেখানে কর্ত্তব্যরূপ অনল সকলকে ঝল্‌সাইয়া ফেলিতেছে—তথায় এই ঈশ্বরার্পণরূপ অমৃত পান করিয়া সুখী হও। আমরা কেবল তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেছি মাত্র, পুরস্কার বা শাস্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ সুখের ভাব লইতে হইলে, সেই সঙ্গে দুঃখের ভাবকে লইতে হয়, উভয়েই একসূত্রে গ্রথিত। একদিকে সুখ, একদিকে দুঃখ, একদিকে জীবন, অপরদিকে মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় জীবনের আশা পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিষ এক জিনিষেরই বিভিন্ন দিক্ মাত্র। অতএব দুঃখশূন্য সুখ এবং "মৃত্যুশূন্য" জীবন কথাগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেদের পক্ষে শুনিতে খুব ভাল বটে কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, এগুলি কতকগুলি স্ববিরোধী বাক্যাংশ মাত্র। কোন কার্য্যের জন্য পুরস্কারের আশা করিও না, কারণ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ, দুঃখ পরিহার করিতে হইলে বাসনাও ত্যাগ করিতে হইবে। সুখ দুঃখ, ফল, অফল বিষয়েই নিস্পৃহ থাকিতে হইবে। সমস্তই ভগবৎ প্রেরণায় সাধিত হইতেছে মনে করিয়া নিরহঙ্কার হইতে হইবে। সকল কর্ম্মই তাঁহার, সকল শক্তিই তাঁহার আজ্ঞাধীন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সব এবং তিনিই সকলে বিরাজিত। আমরা কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে পারি মাত্র। ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নহে। মুক্তি ও সুফল হইতে পারে, কিন্তু হরিভক্তিই সুদুর্ল্লভা। ভগবানের প্রিয় ভিন্ন অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না। ভক্ত যেমন তদ্‌গত প্রাণ, তদ্রূপ তাঁহারও ভক্তগত প্রাণ, তাঁহাকে পাইতে, তাঁহাকে দেখিতে সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া তাঁহারই চরণ মূলে, দেহ, গেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হইবে। একদম্ কাঙ্গাল হইতে হইবে, তবে সেই দীনবন্ধু কৃপাবিন্দু দানে দীন হীনে চরি-

স্বার্থ করিবেন। তবে আমাদের যাহা কিছু সমস্তই মন লইয়া, মনই জগতে অনন্তপুস্তকাগার। বহির্জ্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজককারণ। কিন্তু নিজ মনই সকল সময়েই অধ্যয়নের বিষয়। অজ্ঞানের আবরণ ক্রমশঃ যতই সরিয়া যাইতে থাকে ততই নব নবতত্ত্বের জ্ঞান মনে উদয় হয়। আবিষ্করণ প্রক্রিয়া যতই চলিতে থাকে ততই জ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। অজ্ঞানের আবরণ যাঁহা হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। যেমন একখণ্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত আছে, তেমনি জ্ঞান মনের মধ্যেই রহিয়াছে উদ্দীপক কারণটী ঘর্ষণ স্বরূপে সেই অগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাবও কার্য্যসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে আমাদের যাবতীয় মনোভাব বহির্জ্জগতের বহু ঘাত প্রতিঘাত হইতে সমুৎপন্ন। উহার ফলেই আমাদের চরিত্র গঠিত। এই সমুদয় ঘাতগুলিকে একত্রে কর্ম্ম বলে। কর্ম্মই আমাদের অবস্থার নিয়ামক; আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। আর আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যদি পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হয় তবে ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইবে যে, আমরা ভবিষ্যতে যাহা হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মদ্বারা তাহা হইতে পারি। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থ-পরতা, এগুলি নীতিবিষয়ক আলঙ্কারিক বর্ণনা নহে। ঐগুলি শক্তির মহান্ বিকাশ বলিয়া সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। সংযম হইতে মহান্ ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। উহা এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করিবে, যাহা ইঙ্গিতে জগৎ পরিচালনা করিতে পারে। অজ্ঞলোকেরা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, অথচ তাহারা এর রহস্য জানে না। আমরা যেন একটা ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ, আর উহাই আমাদের সমগ্র জগৎ। আমরা উহার অতীত আর কিছু দেখিতে পাইনা, এবং তজ্জন্যই অসাধু ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পড়ি। ইহা আমাদের দুর্ব্বলতা—শক্তিহীনতা। উন্নত হইতে হইলে প্রথম নিজের প্রতি ও পরে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নাই, নিজের প্রতিও বিশ্বাস নাই, তাহার ঈশ্বরের প্রতি ও বিশ্বাস আসিতে পারে না। সুতরাং আত্মার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে ঈশ্বরের প্রতিও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে না। যিনি মনুষ্যকে পরমার্থ জ্ঞান দিতে পারেন, তিনি মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী। আধ্যাত্মিক

জ্ঞানই জীবনের অন্যান্য কার্য্য সমূহের ভিত্তি। মানুষের ভিতর আধ্যাত্মিক বল না আসিলে, শারীরিক অভাবগুলি পর্য্যাপ্ত পূরণ হয় না। জ্ঞানই প্রকৃত জীবন, অজ্ঞানই মৃত্যু। সুতরাং আদৌ জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যক।

জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে মনকে অন্তর্মুখ করা নিতান্ত আবশ্যক। মনকে অন্তর্মুখ করিতে হইলে শমদমাদির আবশ্যক। কারণ মন সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ দাঁড়ায়, তখন আর মনকে সহজে ফিরান যায় না। সুতরাং কোন অসৎ সংস্কার না জন্মিতে পারে সেজন্য খুব সতর্ক থাকা আবশ্যক। যেমন কূর্ম্ম পদও মস্তক তাহার খোলার ভিতর গুটাইয়া রাখে তাহাকে বল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেও সে বাহিরে আসিবে না। যে ব্যক্তির বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কেন্দ্রগুলির উপর সংযম লাভ হইয়াছে তাহার চরিত্র ও সেইরূপ। সর্ব্বদা সচ্চিন্তার প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা শুভ সংস্কারগুলি মনের উপরিভাগে সর্ব্বদা ভ্রমণ করাতে শুভ সংস্কার প্রবল হয়। তাহার ফল এই যে, আমরা ইন্দ্রিয় জয় করি। তখনই চরিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সত্য লাভ সম্ভবপর হয়। এইরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ্ ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তাহা দ্বারা কোনও অন্যায় কার্য্য সম্ভব হয় না। তাহার পক্ষে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এজগৎ আমাদের বাসভূমি নহে, আমাদের নানা সোপানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, জগৎ ও একটী সোপান বিশেষ। সাংখ্য বলিয়াছেন, সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজন এই যে, আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। আর জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা আপনাকে মুক্ত করিতে পারে। আমরা যদি ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি, তাহা হইলে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইবনা। আমরা জানিব প্রকৃতি আমাদের পাঠ্যপুস্তক মাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভের পর আমাদের নিকট আর উহার মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া আমরা প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৬ আশ্বিন কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন। গণ্যমান্য সামাজিকবর্গও আহূত হইয়াছিলেন। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে একখানি নূতন সারণীগ্রন্থ রচিত হইবে এবং তদনুসারে পঞ্জিকা গণিত হইবে। পঞ্জিকা গণনার জন্য প্রাচীন সারণী যাহা আছে, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ গতিবিধির ব্যতিক্রম হওয়ায় প্রাচীন সারণীতে দোষ ঘটিয়াছে। অতএব সংস্কার চাই। কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান, আহার পানের ব্যয় বহন করিয়াছেন। সারণী না দেখিয়া সভার কার্য্যকারিতা বুঝা যাইতেছে না।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্রীতদাসেরা স্বাধীনতা লাভ করে। মানুষ স্বেচ্ছায় মানুষের দাস থাকিতে চাহেনা। মুক্তি জীবের স্বাভাবিক চরম লক্ষ্য।

পলাণ্ডুমহিমা। সাময়িকপত্রে প্রকাশ—পলাণ্ডু বিষ-নাশক। দেহের অভ্যন্তরস্থ বিষাক্ত পদার্থের প্রকোপ নষ্ট করিতে পলাণ্ডুর শক্তি প্রচুর। বাটীর চতুর্দ্দিকে পলাণ্ডু ছড়াইয়া রাখিলে নাকি নানাবিধ সংক্রামক-রোগের বীজাণু বিনষ্ট হয়। এহেন পলাণ্ডু কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে অভক্ষ্যরূপে কীর্ত্তিত! তবে আয়ুর্ব্বেদ পলাণ্ডুর ও লশুনের আময়িক প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন।

বজ্রাহতের জীবনরক্ষা। বিশেষজ্ঞ লোকের নিকট অবগত হওয়া যায় যে বজ্রাহতের মস্তকে ও সর্ব্বশরীরে তৎক্ষণাৎ প্রচুর মাত্রায় শীতলজল ঢালিয়া দিতে হইবে ও পরে তাহাকে ব্রাণ্ডী পান করাইতে হইবে। অনন্তর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবহনের চেষ্টা করিতে হইবে। অল্পকাল মধ্যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বজ্রাহত ব্যক্তির জীবনরক্ষা হইতে পারে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩২[illegible] সাল। ১৮৪[illegible] শকাব্দ।

আশা।

অকুল পাথারে, আকুল হইয়ে,
ডাকিহে তোমারে আমি।
পতিততারণ, দুখনিবারণ,
তুমিহেজগৎস্বামী।
তরঙ্গ-তাড়নে, ভাঙ্গে মোর হিয়া
নয়নসলিলে ভাসি।
কোথা দয়াময়, ঢালি শান্তি ধারা
দেখা দাও মোরে আসি।
ভবদব-দাহ, দহন শিখায়
জ্বলিনুগো! নিরবধি।
স্বজন কুজন, দুখ না নিবারে
লিখিলা যা ভালে বিধি।
মরীচিকাসম, ইন্দ্রজাল-মোহে
বিগত কাঁদিয়ে পরাণি।
অন্তিমে এখন, লইনু শরণ
রাতুল চরণ-তরণি।

তব করুণায়, হব না বঞ্চিত
আছেরে জীবনে আশা।
বুঝিব সেদিন, কেমন দয়ালু
কেমন "ও" ভালবাসা।

শ্রী——

গীতার সার-সঙ্কলন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতএব এমত যুদ্ধে আততায়িদিগের বধে শাস্ত্রতঃ তোমার পাপভাগী হইতে হইবে না। স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে তোমার ক্ষত্রপ্রবৃত্তি সাময়িকভাবে তিরোহিত আছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়প্রকৃতিগতগুণ বিলুপ্ত হয় নাই। আহারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি খাদ্যবস্তুর বিচার করিতে পারে বটে, কিন্তু না খাইয়া চলিয়া যায় না। অর্জ্জুনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। ভগবান্ বুঝাইয়া দিলেন, আত্মা অবিনাশী, তাঁহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। আত্মা কর্ত্তা নহে—অর্থাৎ আত্মা কাহাকেও বধ করে না, আত্মাকেও কেহ বধ করে না। নাস্তিক ও তার্কিক উভয়কে দোষ দিয়া ভগবান্ বলিলেন, আত্মা হত হয় না, ও কাহাকেও বধ করে না—অর্থাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব নাই। তাহার পর অর্জ্জুনের সন্দেহ, আত্মা যে অবিনাশী-তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে ভগবান বলিলেন, এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড কখনই অসৎ অর্থাৎ শূন্য হইতে ধপ করিয়া পড়ে নাই। ইহা সদ্বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একমাত্র সৎবস্তু আত্ম বা ব্রহ্ম। শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা বলেন, এই জগৎ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মলোম, গগনকুসুমবৎ তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে কারণ ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তিরূপ প্রবল-দোষাপত্তি ঘটে। অতএব সর্ব্বকারণকারণশেষ এক নিত্য চৈতন্যসত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। মাত্র জড়ের ক্রিয়ায় বা শক্তিতে এই বিচিত্রতাময় জগৎ কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না। জগতের সমস্ত শক্তি সেই এক শক্তির বিকাশ মাত্র। সুতরাং এক হইতেই অনেক হইয়াছে—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শূন্যবাদীরা ইথারে প্রাণের কম্পন ধরিতে না পারিয়াই শূন্য হইতে জগৎ উদ্ভব বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় "আকাশাৎ বায়ুর্বায়োরগ্নির-গ্নেরাপঃ" আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, উৎপন্ন ইত্যাদি। ইথারের কম্পন হইতেই বায়ুর উৎপত্তি, ইথারেই প্রাণের কম্পন। প্রাণ, মন, চৈতন্য এই তিন লইয়া আত্মার সত্তা উপলব্ধি হয়। অতএব আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই যে বিশ্বের উৎপত্তি, ইহা বিজ্ঞান সম্মত।

ইহাদ্বারা অর্জ্জুনকে বলা হইল, যে আত্মা অবিনাশী ও সৎ অর্থাৎ নিত্য। সেই নিত্যস্বরূপ আত্মা প্রত্যেক জীবেই চেতনারূপে বিদ্যমান আছেন, কেহই তাঁহার বিনাশ করিতে পারে না। কঠোপনিষৎ হইতে প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় বাক্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন। "নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতাবা ন ভূয়ঃ। অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো নহন্যতে হন্যমানে শরীরে।" এই আত্মা কখনও জন্মে না ও মরে না অথবা একবার জন্মিয়া আবার হয় না; ইহা অজ, নিত্য সকলকালেই একরূপ, ও পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহা বিনষ্ট হয় না। অতএব যাহার জন্য শোক করিবার বিষয় নাই, তাহার জন্য শোক করা বৃথা। অন্যান্য প্রমাণ ভ্রমদুষ্ট হইতে পারে বলিয়া বৈদান্তিকেরা আপ্তবাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যেই প্রবল ও প্রধান প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন। ; ইহা-দের বক্তব্য এই যে, আপ্তেরা ধরিতে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সত্যই জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য স্বতই প্রমাণ। মহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বীরা মহম্মদের বাক্য, খ্রীষ্টানেরা যিশু খ্রীষ্টের বাক্য, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। তাহার কারণ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ, সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা আপ্ত। তাঁহাদের বাক্য সেইজন্যই প্রমাণস্বরূপ। অস্মদ্দেশীয় ঋষিগণ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা আপ্ত। তাঁহাদিগের বাক্যও প্রামাণ্য। ভগবান্ এই আপ্তবাক্যেই প্রবল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপর আত্মার অবিনশ্বরত্ব পক্ষে ভগবান অনেক যুক্তি ও প্রমাণ দিলেন এবং বলিলেন, বেদসকল কর্ম্মফলপ্রতিপাদক, তোমাকে নিষ্কামভাবে সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য মনে করিয়া সুখদুঃখাতীত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। বুদ্ধির শরণাপন্ন হও, জ্ঞান অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম নিকৃষ্ট। আত্মজ্ঞানীর

বেদাদি কোন শাস্ত্রেরই আর আবশ্যক করে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮ ও ৫৯ শ্লোকে অর্জ্জুনকে উদ্দেশ্য করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী। বিষয়ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে সংকোচন করিতে হইবে। কূর্ম্মের অঙ্গসংকোচন উদাহরণ-স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহারা ভোগবাসনা অবিতৃপ্ত থাকিতে বলপূর্ব্বক অর্থাৎ অনশন বা ঔষধবলে ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অন্তরে ভোগবাসনা থাকিয়াই যায়, সুতরাং তাঁহারা যোগী হইলেও বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাদিগকে পাতিত করে। পুরাণাদিতে এবিষয়ে অনেক ঋষির উপাখ্যান আছে। এই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান কখনও পরিপক্ক হয় না। সুতরাং চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবে। সেই কর্ম্ম আবার সকাম হইলে চিত্তশুদ্ধির পরিবর্ত্তে চিত্ত সমল হইয়া উঠিবে। সেই সমলচিত্তে কখনই ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইবে না। এবিষয়ই ভগবান্ অনেকরূপে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। সমস্ত উপনিষদেই প্রধানতঃ আত্মজ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, গীতাতেও প্রধানতঃ তাহাই বলা হইয়াছে। এই জন্যই গীতাকে সমস্ত উপনিষদের সারসঙ্কলন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আত্ম-জ্ঞান ও আত্মার উন্নতি, আত্মার শান্তি মনুষ্য মাত্রেরই প্রার্থিত হইতে পারে। সুতরাং গীতোক্ত ধর্ম্ম, সকলজাতির ও সকল সম্প্রদায়েরই উপ-যুক্ত। আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য নাস্তিকের পক্ষেও গীতোক্ত উপদেশ গ্রাহ্য। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন,—যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আপনি আমায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন কেন? যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই আমায় নিশ্চয় করিয়া বলুন। তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন হে অর্জ্জুন! আমি এই জগতে দ্বিবিধ নিষ্ঠা বলিয়াছি, কর্ম্মযোগিদিগের কর্ম্মদ্বারা ও জ্ঞানিদিগের জ্ঞান দ্বারা শ্রেয়োপ্রাপ্তি হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত মনুষ্য কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। মাত্র সন্ন্যাস হইতে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানের ভিত্তি ও পরিণতি কর্ম্মে। কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্ম, নিষ্কামকর্ম্ম হইতে সহজেই অনাসক্তি জন্মে। অনাসক্তিবলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই তখন আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হইতে থাকে। তাহার ফলও জ্ঞানের ফল তুল্যই, সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। তাহার পর অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য, অনিচ্ছাসত্ত্বেও

পুরুষ কাহাদ্বারা বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত হইয়া থাকে? ভগবান্ বলিলেন—রজোগুণ-সমুদ্ভূত কাম ও ক্রোধ দ্বারা মলে যেমন দর্পণকে আবৃত করে। সেইরূপ দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র ঐ দুই শত্রু জ্ঞানকে আবৃত করতঃ পুরুষকে পাপে নিয়োজিত করে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি উহাদের অধিষ্ঠান-স্থান, উহারাই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞান আবৃত করিয়া দেহীকে মুগ্ধ করে। পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আপনি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই বলিতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ আমায় নিশ্চয় করিয়া বলুন। ভগবান্ বলিলেন,—কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কর্ম্মত্যাগ হইতে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। যাহারা মূর্খ, তাহারই জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। ঐ উভয়ের একটীকে ভালরূপে আশ্রয় করিলেই উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। অঙ্গ ও প্রধানরূপে উভয়ই মুক্তি প্রাপ্তির কারণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি দ্বেষ করেন না ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। তাদৃশ রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কর্ম্মযোগ ভিন্ন সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান দুঃখলাভের হেতু হয়, কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত মুনি শীঘ্রই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা কর্ম্মযোগেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর ষষ্ঠাধ্যায়ে যোগের বিষয় অনেক বলিলেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কেহ যোগ-ভ্রষ্ট হয়, তাহার কি গতি হইবে? ভগবান্ বলিলেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বহুবর্ষকাল পুণ্যবান্‌দিগের লোকে বাস করিয়া সদাচারিধনবান্‌দিগের গৃহে অথবা যোগিদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। তাহার পর বলিলেন—আমার দুইটী প্রকৃতি আছে, পরা ও অপরা। একটী ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন। আর একটী প্রকৃতি আছে, তাহাকে শ্রেষ্ঠা কহে—সেইটী জীবস্বরূপ। সমস্ত ভূত আমা হইতে জন্মে আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন ও আমাতেই সমস্ত লয় হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যং বিশন্তি জীবন্তি চ" ইত্যাদি শ্রুতির বিষয় এখানে বলা হইল। আর্ত্তিপীড়িত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু ভোগৈশ্বর্য্যকামী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ব্যক্তিই আমাকে ভজনা করে। তন্মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানীই আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়। অন্যান্য মূর্ত্তির উপাসক ব্যক্তিদিগের

ফল বিনশ্বর, মদ্ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। জ্ঞানবান্ বহুজন্মান্তে আমায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহার পর দশমাধ্যায়ে স্বীয় বিভূতি বর্ণনা করিলেন। তৎপর একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। অনন্ত বাহূদেরবক্ত্রনেত্রং। পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং ইত্যাদি শ্লোকে জীব ভগবানেরই বিভূতি বিকাশ ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ১১শ অধ্যায়ে ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুনঃ। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চতত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ কোনরূপ ফলাভিসন্ধানরহিত একমাত্র ভক্তি বলেই মানব যথার্থরূপে আমায় জানিতে বা দেখিতে বা আত্মাতে বিলীন হইতে সমর্থ হইতে পারে বলিলেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"ময্যাবেশ্য মনো যে-মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।" আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহাদিগকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞান অভিন্ন। তাঁহার অলৌকিক মহিমা জানিতে পারিলে স্বতই ভক্তি জন্মে। তবে বৈষ্ণবগ্রন্থকর্ত্তারা বলেন যে, আদিতে জ্ঞান না থাকিলেও সাধনভক্তির বলে পরে অহৈতুকী ভক্তি আপনিই জন্মে। ইহার পর সগুণ ঈশ্বরেও নির্গুণ ঈশ্বরে আসক্ত উভয়বিধ পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ভগবান্ বলেন,—উভয়েই আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। অতিকষ্টে তাহারা অব্যক্তবিষয়া নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। আর যাহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করিতে থাকে, তাহাদিগকে আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

পরে ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রভৃতির পরিচয় দিয়া সাংখ্যমত ব্যক্ত করেন। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, ইহাও ব্যক্ত করেন। এবং ইহাও বলেন যে, প্রকৃতি আমার যোনি, আমি তাহাতে নিখিল জগতের বীজরূপ চিদাভাস নিঃক্ষেপ করি, তাহা হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি-স্থান প্রকৃতি, আমি বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদিগুণ দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে। যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তি-বলে

আমার উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করিতে পারেন। আমারই অংশ জীবভাবপ্রাপ্ত সনাতন আত্মা সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হয়। মন সংসারভোগের জন্য ইন্দ্রিয়দিগকে জীবলোকে আকর্ষণ করে। বায়ু যেমন গন্ধবহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা এক দেহ আশ্রয় বা ত্যাগকালে ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া আসেন ও লইয়া যান। এই জীব, ইন্দ্রিয় ও মনকে সহায় করিয়া বিষয় ভোগ করেন। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বিষয় বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। পরে সপ্তদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির বিষয় এবং ত্রিবিধ প্রকৃতি-সম্পন্ন নরনারীগণের আহার ও চেষ্টার বিষয় বর্ণনা করা হয়। পরে বলেন, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, স্পর্শ করিয়া ওঁ এই বর্ণের উচ্চারণ হয় এবং আদিতে ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া ঐ প্রণব উত্থিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মবাদিগণ ঐ প্রণব উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হন। 'তৎ'পদ উচ্চারণ করিয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ কর্ত্তৃক দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অস্তিত্ব, সাধুভাব ও প্রশস্তকর্ম্মেও 'সৎশব্দ' প্রযুক্ত হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন পুনরায় বলিলেন হে মধুসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগ পৃথক করিয়া বুঝাইয়া বলুন। ভগবান্ বলিলেন সুধিগণ কাম্যকর্ম্ম সমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মের ত্যাগকেই ত্যাগ বলেন। একদল পণ্ডিত কর্ম্মদোষ যুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলেন। অপরদল যজ্ঞদান তপস্যাদি কর্ম্ম চিত্তশোধক বলিয়া অত্যাজ্য বলেন। ভগবান স্বীয়মত ব্যক্ত করিতেছেন, যথা যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম চিত্তশোধক, সুতরাং ত্যাজ্য নহে। কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ তামস ত্যাগ। কায়ক্লেশভয়ে যে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহাকে রাজসত্যাগী কহে। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। অবশেষে অর্জ্জুনকে ভগবান বলিলেন হে সখে! আমিই সর্ব্ববেদ ও বেদান্তগম্য, তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।

১। প্রথম যুদ্ধস্থলে আত্মীয় ও গুরুজনদিগের বধ-শঙ্কায় কাতর হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ভগবান্ প্রিয় সখাকে বুঝাইয়া দিলেন, দেহই জন্মে ও মরে, দেহান্তর্ব্বর্ত্তী চৈতন্য বা আত্মা অবিনাশী। কেহ হত হয় না, বা কেহ কাহাকে হত্যাও করে না। যাহার জন্ম আছে, তাহারই

মৃত্যু আছে। সুতরাং স্বজন-বধ-শঙ্কায় তোমার কাতর হওয়া সঙ্গত নহে। বিশেষ যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গে যাইবে, জয়ী হইলে রাজ্য ভোগ করিবে। এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ, ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরাই প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি ভয়ে রণাঙ্গন হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে শত্রুগণ তোমার অশেষ নিন্দাবাদ করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির নিন্দা মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখপ্রদ। অতএব সন্দেহ ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রোচিত বীর্য্য প্রকাশ করতঃ যুদ্ধ কর।

২। ভগবান্ বলিলেন—অজ্ঞানতাবশতঃ তুমি এইরূপ অবধ্যকে বধ্য মনে করিতেছ। বুদ্ধির শরণাগত হও, তাহা হইলে তোমার আত্মজ্ঞান জন্মিবে, তাহা হইলে সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইবে ও সংসার-বন্ধন মুক্ত হইবে।

৩। অর্জ্জুনের প্রশ্ন, কর্ম্ম হইতে যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমায় কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন কেন? সন্দেহ-মিশ্রিত বাক্যে আমায় মুগ্ধ করিতে-ছেন কেন? যাহা নিশ্চিত, তাহাই স্থির করিয়া আমায় বলুন।

৪। ভগবান্-বলিলেন কর্ম্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান পরিপক হয় না, সুতরাং সবাইকেই প্রথম জ্ঞানের অঙ্গভূত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবেই। নতুবা পতনের সম্ভাবনা আছে। বিষয়ভোগ ব্যতীত বাসনা ত্যাগ করা যায় না। বলপূর্ব্বক বা ঔষধ শক্তিতে বিষয় ত্যাগ করি-লেও বাসনা মন হইতে তিরোহিত হইবে না সুতরাং পতন হইবার সম্ভাবনা থাকিয়াই যাইবে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হইলে আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না।

৫। তাহার পর সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুনের এ প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ বলিলেন; সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই শেষ ফল মুক্তি। মুর্খেরাই জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করে। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আসক্তিশূন্যতা জন্মে, তাহা হইতে চিত্ত বিশুদ্ধ ও শান্ত ভাবাপন্ন হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে। উহাই জীবের একমাত্র প্রার্থিত। দেহাভিমানী জীবের আত্মজ্ঞান না থাকায় বাহ্য-বিষয়-স্পর্শে সুখী বা দুঃখী বোধ জন্মে। অধিকন্তু মৃত্যু ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত হইয়া শান্তি হীন হইয়া থাকে। আমি কে, ও কোথা হইতে আসিয়াছি, ও মৃত্যুর পর আমার আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে কিনা—ইহাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই জিজ্ঞাস্য। এ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ দেখাইয়াছেন, শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ তত্ত্ব তত্ত্ব, অর্থাৎ ইহা তাহা নহে, অর্থাৎ আত্মা নহে, এইরূপ সন্ধান করতঃ

শেষে নিত্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন; তাহাই আত্মা। যাহা নিরাকার ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এবং নিত্য, তাহার বিনাশ কখনও সম্ভবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থূল বস্তুর বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ স্থূলতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। স্থূল-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থূলের অভ্যন্তরে চৈতন্যের সত্তা উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্যেরা চৈতন্যশক্তি জড়ের সংমিশ্রণ সম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে মস্তিষ্কের বিকারে জ্ঞানের লোপ, উপবাসাদি হইতে মোহ বা মৃত্যু ঘটে,—ইহা দেখাইয়া চৈতন্য দেহেরই ক্রিয়াশক্তিবিশেষ ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব অসঙ্গত, অসৎ হইতে সৎ বা জড় হইতে চেতনোৎপত্তি যুক্তি-সঙ্গত নহে। জড়ের অভ্যন্তরে চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান আছে-ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও সপ্রমাণ করিয়াছে। উপবাসাদি জন্য যে জ্ঞান-লোপ হয়, তাহার কারণ দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রাহিণী শক্তির অভাব। যাহা হউক্ যদি জানা যায়, কোন অনির্ব্বচনীয় নিত্য চিদ্বস্তু আমাতে আছে, যাহা দেহ বা ইন্দ্রিয় নহে; যাহা বিনশ্বর দেহ হইতে স্বতন্ত্র ও অবিনাশী এবং আমি তাহাই; মৃত্যুর পর আমি যাহা থাকিব, এখনও তাহাই আছি, পরেও তাহাই থাকিব, তাহা হইলে নিশ্চিত বিনশ্বর দেহ-নাশে শোক, ভয়, হইতে পারে না। যদি মনে করা যায় যে, যেমনটী আছি, এমত আর থাকিব না এবং এখনকার বন্ধু-বান্ধব আর ত পাইব না, তবে দুঃখ না হইবে কেন? সেজন্য দুঃখ করিলে চলিবে না, কারণ যতদিন সংসার-নিবৃত্তি না হইবে, ততকাল এই সংসার মরুভূমে যাতায়াত করিতে হইবে। যাতায়াতের কারণই কর্ম্ম, এই জন্যই ভগবান্ জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-জন্য নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সংসার বন্ধন খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দেহাত্মবাদীরা ঐহিক সুখের লালসায়, প্রবল কামনার তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়। ইউরোপবাসীরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। জড় বিজ্ঞানশক্তির বলে যদিও আধুনিক পাশ্চাত্যবাসীরা অর্থে সামর্থ্যে অতুলনীত বটে, কিন্তু তাঁহারা কামনার অবিতৃপ্ত তাড়নায় স্বতই শান্তিহীন। এই কারণে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জীবহিংসা, বধ, বন্ধন, অশান্তি প্রতিনিয়ত বিরাজ করিতেছে। অধ্যাত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া আর্য্যেরা বাহ্য সম্পদে পশ্চাৎপদ হইলেও শান্তিহীন হন্ নাই। "অশান্তস্য কুতঃ সুখং?" শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? বস্তুতঃ কামনা প্রেরিতবিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির কখনই সুখশান্তি হইতে পারে না।

৬। তাহার পর সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ বলিলেন,—উভয় উপাসকেরই শেষফল মুক্তি। তবে নির্গুণ উপাসনা অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। ইহা বলার পর সগুণ উপাসনার প্রভূত প্রশংসা করতঃ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন। তবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার প্রশংসা করিলেও প্রতিমাপূজাদি নিম্নস্তরের উপাসনা মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

৭। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, পঞ্চোপাসক, বা যাঁহারা একেশ্বরবাদী, বা বুদ্ধমতাবলম্বী, বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বা মহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বী, সকলের পক্ষেই গীতোক্ত ধর্ম্ম আচরণীয় হইতে পারে। আত্মজ্ঞান, দুঃখনিবৃত্তি, শান্তি প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রেরই অভিপ্রেত হইতে পারে। এ বিষয়ে এক মাত্র দেহাত্মবাদী ভিন্ন অন্য কেহই বিমুখ বা বীতস্পৃহ হইতে পারেন না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের আশা রাখিলে নাস্তিকের পক্ষেও গীতোক্ত অতুল অত্যুদার ভগবদুপদেশ, সর্ব্বথা গ্রাহ্য। জাতি, বর্ণ, নর, নারী নির্বিশেষে গীতোক্ত ধর্ম্ম আচরণীয় হইতে পারে। সর্ব্বোপনিষদের সারসঙ্কলন বিধায় আর্য্য হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিদিগের গীতোক্তধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

৮। গীতার কোন কোন শ্লোকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া উপনিষদ্‌গণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সার তাৎপর্য্য লইয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান বুঝাইয়া দিয়াছেন, জীবাত্মা স্বতঃ সিদ্ধ, বদ্ধ বা দুঃখী নহে। প্রকৃতির গুণে স্বয়ং জবাকুসুমরাগরঞ্জিত স্ফটিকবৎ অভিমানী হওয়ায় নিজকে বদ্ধ বা সুখদুঃখভাগী মনে করিতেছেন। তিনি যে স্বতঃ প্রকৃতির গুণে বিযুক্ত আছেন, ইহা জানিতে পারিলেই মুক্ত হইবেন। এই সৃষ্টিপ্রবাহ, অনাদি ও অনন্ত, চিরদিনই এই ভাবে চলিতেছে। সুতরাং বীজ বা বৃক্ষ কোন্‌টী পূর্ব্বে, এতাদৃশ তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারেনা।

৯। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে কিরূপে সগুণ দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হইল, এই সন্দেহ প্রত্যেকের মনে উদিত হয়। এই সন্দেহ নিরসার্থে বেদান্তমতে মায়া ও সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ উভয়ই ত্রিগুণময়ী এবং পরব্রহ্মের বীজাধান স্থান। সরল ভাষায় বলিতে গেলে, এই বলা যায় যে, প্রকৃতির গুণ আশ্রয় করিয়া ভগবান্ এ বিশ্বরূপে পরিণত হন। অথবা প্রকৃতিতে চিদংশ প্রবিষ্ট হওয়ায়, প্রকৃতি

তাঁহার সান্নিধ্যে জগৎ প্রসব করে, পুনরায় প্রলয় কালে প্রকৃতিতে সমগ্র লীন হয়। প্রকৃতি বা মায়ার গুণ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর, সগুণ হন। এই বিশ্ব চিজ্জড়ের সংমিশ্রণ জাত। অথবা সমস্তই চিদংশ সম্ভূত, জীবাণুপুঞ্জে জগৎ ব্যাপ্ত।

১০। তীর্থ, ধর্ম্ম, শাস্ত্রপাঠ, যোগ, তপস্যা সমস্তই চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত, নচেৎ সমস্তই বিফল। ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞানই সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য তাহা হইয়া গেলে শাস্ত্রাদির বা ক্রিয়াকাণ্ডের আবশ্যক করে না। আত্ম জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত বিধি নিষেধের অতীত হইয়া যান। মুক্তি বা মোক্ষ অর্থে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া। তাহা হইলে আর জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভবে না। প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সতত মুক্তির আশায় ছুটিতেছে। যে বারি বিন্দু বারিধি হইতে উৎপন্ন, তাহা পুনরায় সাগরেই মিশিতে ছুটিতেছে। ইহাই বিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। সমস্তই আদি ও অন্তে অব্যক্তভাবাপন্ন, মধ্যে ব্যক্তাবস্থা, মৃত্যুই স্বভাব, জন্ম বিকৃতি, ইহা জ্ঞানিগণ জানিতে পারেন। কামরাশি যাহার চিত্তে প্রবেশ করে, সে কখনও স্থির থাকিতে পারে না। বাসনা ত্যাগেই প্রচুর শান্তি। এজন্যই ভগবান্ কর্ম্মফলাসক্তিত্যাগকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

১১। অনুকূল শাস্ত্রযুক্তি, ভূরিদৃষ্টান্ত, শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ, গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন, প্রভৃতি শ্রদ্ধা দ্বারা দৃঢ় করা আবশ্যক। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ক্রমশঃ সাধনাদিতে রতি জন্মে। সাধনা হইতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে। আসুর প্রকৃতিক মনুষ্যগণ প্রতিনিয়ত সংসারে যাতনাভোগ করে ও গতায়াত করিতে থাকে। গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হয়, তদনুকূল আহার বিহার করা কর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা বুদ্ধিমান্ ও দীর্ঘজীবী এবং নিরাময় হইয়া থাকেন।

১২। গীতায় আত্মার উদ্ধারের বহুপ্রকার উপায় কথিত হইয়াছে, যিনি যেপথ ভালবাসেন, তিনি সেইপথ আশ্রয় করতঃ শ্রেয়োলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, যে কোন পথ আশ্রয় করিয়া আত্মশ্রেয়ঃ সাধনের জন্য যত্ন করিতে পারেন। যদি কেহ কিছুই করিতে না পারেন, তবে তিনি পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম সমস্তই ভগবানে সমর্পণ করতঃ একান্তভাবে তাঁহার শরণ লইতে পারেন। ভগবান্ স্বয়ং [illegible] দিয়াছেন। তবে তিনি [illegible], সকামকর্ম্মকে অত্যন্ত

নিন্দা করিয়াছেন। জীবের অত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই ভগবানের অভিপ্রেত। যেমন নানা নদীর গন্তব্য পথ ভিন্ন হইলেও সরিৎপতি সঙ্গমই সকলের উদ্দেশ্য; সেইরূপ, ধর্ম্মের নানামত থাকিলেও ঈশ্বরপ্রাপ্তিই সবকার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং মতামতের অসামাঞ্জস্য নিবন্ধন পরস্পর বিরোধ করা উচিত নহে। সবাই নিজের প্রকৃতির অনুরূপ সাধনা করিতে চাহে। কাহারও প্রবৃত্তির বাধা জন্মান সঙ্গত নহে। তবে প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নহে। তাহাতে পরগাছা বড়িয়া মূলবৃক্ষকে নষ্ট করে। আত্মজ্ঞান জন্মিলে আর পরস্পর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না সূর্য্যোদয়ে যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর হয় তদ্রূপ আত্মজ্ঞান উদিত হইলে সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব ভয়, তাপ, দুঃখ, মায়া পরিহারার্থ সকলেরই আত্মজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, ইহাই গীতার সারতাৎপর্য্য। ওঁ শান্তি

শ্রীআত্তনাথ কাব্যতীর্থ।

গীতা।

দ্বাপরেতে প্রকাশ তোমার করতে কলি কলুষনাশ,
শ্রীনাথের শ্রীমুখপদ্মে ফুটলে তুমি অর্জ্জুন পাশ।
ক্ষরিল তাতে অমলমধু ওগো সারাটী ভারতবর্ষে.
পিয়ে জ্ঞানীর মনোভ্রমর বিভোর বিমলহর্ষে।
হৃদ্‌মাঝারে রেখেছ ধরে তুমি শ্রীনাথের পুণ্যবাণী,
তাইতে তোমার চরণে প্রণত সকলে ভাগ্যমাণি।
ক্ষুদ্রবীজে বিশালবৃক্ষ তুমিই তার জনম ভূমি,
ত্যাগ বিভূতি, পুনঃনরে কর্ম্মক্ষেত্র দেখাও তুমি।
ভোগবিলাসী অলসনরের ভোগের তৃষায় শান্তি দিতে,
শঙ্কর জটাপরিহরি যেন গঙ্গা এলেন অবনীতে।
কার পুণ্যে এলে তুমি ওগো নন্দন পারিজাতমালা।
ত্রিতাপী মানবে সুধা দিতে "ওগো" হরি তার সকলজ্বালা।

জ্ঞানের তুমি উজ্জলসিঁড়ি ভক্তিরসের স্নিগ্ধধারা,
ভবের তুমি পরশমণি, ছুঁইলে নর আপনহারা।
তুমিই যেগো আঁধারধরার অমলজ্যোতির বিমল আলো,
মিছা মায়া মিছা সংসার তোর, যে তোমারে বুঝেছে ভালো।
বন্ধনর তোমার কৃপায় চিন্‌লো ওগো মুক্তির পথ,
তোমার স্বরূপ সেইজানে কল্পনা যার ভাবের রথ।
নাইক আমার জ্ঞানবুদ্ধি, ভাবেরত নাইক লেশ,
[illegible]ল ধবল তোমার চিত্র কেমন ক'রে আঁক্‌ব বেশ!

শ্রীপশুপতি সরকার।

বলিদান-সমাধান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় বল্লা।

চতুঃষষ্ট্যুপচার——(শক্তিবিষয়ে মাত্র) সিদ্ধযামলে যথা :—

১। আসনারোপম্ ২। সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গঃ ৩। মজ্জনশালাপ্রবেশনম্ ৪। মাজ্জনমণি পীঠোপবেশনম্ ৫। দিব্যস্নানীয়ম্ ৬। উদ্বর্ত্তনম্ ৭। উষ্ণোদকস্নানম্ ৮। কনককলসস্থিতসকলতীর্থাভিষেকঃ ৯। ধৌতবস্ত্রপরিমার্জ্জনম্ ১০। অরুণদুকূলপরিধানম্ ১১। অরুণদুকুলোত্তরীয়ম্ ১২। আলেপমণ্ডপপ্রবেশনম্ ১৩। আলেপমণিপীঠোপবেশনম্ ১৪। চন্দনাগুরুকুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরীরোচনাদিব্যগন্ধসর্ব্বাঙ্গানুলেপম্ ১৫। কেশভারস্থ কালাগুরুধূপমল্লিকামালতিজাতিচম্পকাশোকশতপত্রপুগকুহরীপুন্নাগযুথিসর্ব্বর্ত্তুকুসুমমালাভূষণম ১৬। ভূষণমণ্ডপপ্রবেশনম্ ১৭। ভূষণমণিপীঠোপবেশনম্ ১৮। নবমণিমুকুটম্ ১৯। চন্দ্রসকলম্ ২০। সীমন্তসিন্দুরম্ ২১। তিলকরত্নম্ ২২। কালাঞ্জনম্ ২৩। নাসাভরনম্ ২৪। অধরযাবকম্ ২৫। গ্রথণভূষণম্ ২৬। কনকচিত্রপদকম্ ২৭। মহাপদকম্ ২৮। মুক্তাবলিঃ ২৯। একাবলিঃ ৩০। দেবচ্ছন্দকঃ ৩১। কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়ম্ ৩২। বলয়াবলিঃ ৩৩। হারাবলিঃ ৩৪। উর্ম্মিকাবলিঃ ৩৫। কাঞ্চীদামঃ ৩৬। কটিসূত্রম্

৩৭। শোভনাখ্যাভরণম্ ৩৮। পাদবাটকম্ ৩৯। রত্ননূপুরম্ ৪০। পাদাঙ্গুরীয়কম্ ৪১। এককরেপাশঃ ৪২। অন্যকরেঽঙ্কুশম্ ৪৩। ইতরাকরে পুণ্ড্রেক্ষুচাপঃ ৪৪। অপরকরেপুষ্পবাণাঃ ৪৫। শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকা ৪৬। স্বসমানবেশাস্ত্রাবরণদেবতাভিঃসহ সিংহাসনারোহণম্ ৪৭। কামেশ্বরপর্য্যঙ্কোপবেশনম্ ৪৮। অমৃতাসবচষকম্ ৪৯। আচমনীয়ম্ ৫০। কর্পূরবটিকা ৫১। আনন্দোল্লাসবিলাসহাসঃ ৫২। মঙ্গলারাত্রিকম্ ৫৩। শ্বেতচ্ছত্রম্ ৫৪। চামরযুগলম্ ৫৫। দর্পণঃ ৫৬। তালবৃন্তং ৫৭। গন্ধঃ ৫৮। পুষ্পম্ ৫৯। ধূপঃ ৬০। দীপঃ ৬১। নৈবেদ্যম্ ৬২। পুনরাচমনীয়ম্ ৬৩। তাম্বূলম্ ৬৪। বন্দনঞ্চ॥

বৎস! প্রচলিত ও অপ্রচলিত যতপ্রকার উপচারবিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একে একে সমস্ত তোমাকে বলিলাম। অধুনা পূজার সাধারণ সূত্রসকল বলিতেছি শ্রবণ কর;

তোড়লতন্ত্রে তৃতীয় পটলে যথা ঃ——

সূত্রকারেণ দেবেশি পূজাবিধিরিহোচ্যতে।
স্বস্তিবাচ্য চ সঙ্কল্প্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
মন্ত্রেণাচমনং কার্য্যং সামান্যার্ঘ্যং ততোঽন্যসে।
তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ॥
ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসারণং ততঃ।
আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য গুরুদেবং নমেৎসুধীঃ।
করশুদ্ধিং তালত্রয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ॥
বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ।
মাতৃকায়াং ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তর্মাতৃকান্॥
মাতৃকাধ্যানমুচ্চার্য্য বাহ্যেতুমাতৃকাং ন্যসেৎ।
পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥
ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ।
ষোঢ়ান্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরম্॥
এবং সমাহিতমনাস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ॥
জীবন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ।
মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ॥
বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সমেতকম্।
[illegible]

ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মুদ্রাপূজনম্।
আজ্ঞাপ্রার্থনস্নানং কালাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ॥
খড়্গাদীন্ গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ।
বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং পুনশ্চরেৎ।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চাত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ।
শিবোঽহমিতি সংভাব্য সংহারেণ বিসর্জয়েৎ॥
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট পূর্ব্বকং।
অর্ঘ্যং সংধার্য্য শিরসি চন্দনঞ্চ ললাটকে।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

তোড়লতন্ত্রে তৃতীয় পটলে :—

সংক্ষেপপূজামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ।
আধারন্যাদি বিন্যস্য কায়শুদ্ধিস্ততঃ পরম্॥
অঙ্গুলীব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ।
তালত্রয়ঞ্চ দিগ্‌বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্॥
ধ্যানং মানসযাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপনমেব চ।
পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততশ্চাবাহনঞ্চরেৎ॥
জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাম্।
অঙ্গপূজাঞ্চ কাল্যাদীন্ ব্রাহ্ম্যাদীংশ্চাষ্টভৈরবান্
মহাকালং পূজয়িত্বা গুরুপংক্তিং যজেত্ততঃ।
খড়্গাদীন্ পূজয়িত্বা তু পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
দেব্যা হস্তে জপফলসমর্পণমথাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ
স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ।
আত্মসমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জয়েৎ॥
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট পূর্ব্বিকাম্।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

পিচ্ছিলাতন্ত্রে দ্বাদশ পটলে :—

আচম্য বাস্তুদেশে তু সামান্যার্ঘ্যং সমাচরেৎ।
লিপিন্যাসাদিবিন্যাসৌ মূলেন করশোধনম্।

করব্যাপকবিন্যাসং কৃত্বাঙ্গানি ন্যসেৎ সুধীঃ।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়স্তথা॥
ধ্যাননিষ্ঠৈব পূজা জপশ্চ কালিকার্চ্চণম্।
অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষাং যজনক্রমঃ॥
উপচারৈঃ ষোড়শৈশ্চ তন্তবেৎ পূজনং মহৎ।
নিত্যে দশোপচারস্তু পঞ্চ বা বিচরেচ্ছিবে॥
অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুষ্পেণ তদভাবতঃ।
তদভাবে যজেৎ পত্রৈস্তন্তুলেন জলেন বা॥
মানসীং তদভাবেঽপি পূজাং ন লঙ্ঘয়েৎ ক্বচিৎ॥

যামল তন্ত্রে :—

আত্মাবৃষ্যাদিবিন্যাসং করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্।
অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব চ॥
তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্।
ধ্যানং পূজা জপশ্চৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ॥

বৎস, সাধারণতঃ যতপ্রকার পূজা বিধি আছে তাহাও বলিলাম এখন দেখ, বলিদান যদি পূজার অপরিহার্য্য উপচার হইত, তাহা হইলে প্রতি উপচার ও পূজাবিধি প্রকরণে বলি শব্দের অবশ্য বিধান বা উল্লেখ থাকিত, এমন কি এক উপচার স্থলে মাত্র বলিই সেই উপচার হইত; কিন্তু তাহা দূরে থাক, 'বলি' মাত্র ষট্‌ত্রিংশদুপচার মধ্যে ও বৃহৎ পূজাসূত্র মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মাত্র দেবী পক্ষে বিহিত যে চতুঃষষ্টি প্রকার উপচার তাহার মধ্যেও 'বলি' নাই, সুতরাং বলির উপচার রূপে যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা বলা যায় না। পিচ্ছিলাতন্ত্রে দ্বাদশ-পটলে যে পূজাবিধি কথিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে ষোড়শোপচার দ্বারা পূজাই মহাপূজা বা বৃহৎ পূজা, অতএব বলির একান্ত আবশ্যকতা থাকিলে ষোড়শোপচার মধ্যে তাহার স্থান অবশ্য হইতই হইত। এই হেতু পূজায় বলির প্রয়োজন নাই বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। গুরো? বুঝিতেছি বলির প্রাধান্য অস্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু মাতৃকাভেদ তন্ত্রে—"বলিদানং বিনা যস্তু পূজয়েৎ ত্রায়িণীং নরঃ" ও নিরন্ধে— "পশুদানং বিনা দেবীং পূজয়েন্ন কদাচন" ইত্যাদি যে উক্ত হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সুতরাং "বলি" পূজার অঙ্গ বলিতে হয়।

গুরু। পূর্ব্বে বলির অঙ্গত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং উহা উপচার হইতে পৃথক্ বলিতে হইবে, তাহার আর একটী কারণ এই যে উপচার দানে অর্চ্চনা ভিন্ন কোন্ পৃথক্ মহাবাক্য করিতে হয় না, পরন্তু বলিদান নিমিত্তই একটী সঙ্কল্পবৎ মহাবাক্য করিতে হয় যথা অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতা প্রীতিকাম ইমং অমুকপশুং বহ্নিদৈবতং শ্রীমদমুকাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে বা দদানি। সুতরাং বলি পূজাতিরিক্ত একটী ব্যাপার, তবে উপচারাদি দানান্তে পূজাকাল মধ্যে উহার প্রদানকাল হইতে পারে বলিয়া দুই একস্থলে উল্লেখ আছে তাহা তোমাকে বলিয়াছি। বলিদ্বারা উপাস্যের পূর্ণাঙ্গ পূজা ফলাতিরিক্ত প্রীতি হয় মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া উহার অভাবে পূজা অসিদ্ধ বা অপূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্য পূজা বলি ভিন্ন অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ হওয়ায়, বিগ্রহের দেবত্বলোপ হইয়াছে সুতরাং পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে তাহার প্রমাণ রাঘবভট্ট ধৃত বচন যথা—

একাহপূজাবিহিতাকুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চণম্।
দ্বিরাত্রেতু মহাপূজাং সংপ্রোক্ষণমতঃপরম্॥
ম্যাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে।
প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রিয়াঃ॥

একাহ পূজা অবিহিত হইলে দ্বিগুণ অর্চ্চণা করিতে হইবে, দ্বিরাত্র হইলে মহাপূজা ও তাহার পর সংপ্রোক্ষণ বিধেয় একমাসের উর্দ্ধ অনেকাহ যদি পূজাব্যাহত হয়, তাহা হইলে কেহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন কেহ বা অভিষেকক্রম বা সংপ্রোক্ষণ বিধি বলিয়া থাকেন। অতএব নিত্য বলির অভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দেবত্বের লোপ হইয়াছে বলিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বলিপূজার সর্ব্বস্ব নহে, উহার অভাবে পূজা অসিদ্ধ হয় না। বলিদানের অধিকারীর পক্ষে উহা আদরের সন্দেহ নাই সাধারণভাবে ঐ বচনগুলি বলির প্রশংসার জন্যই বলা যাইতে পারে। বলিপূজার মুখ্য নহে, মুখ্য হইলে অশ্বমেধাদিবৎ বলির নিমিত্তই পূজা হইত, কিন্তু তাহাত নহে; অতএব বলি মুখ্য নহে। উহা গৌণও নহে; গৌণ হইলে অঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে উহার অনঙ্গত্ব প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে মুখ্যও গৌণাতিরিক্ত ব্যাপার বলিতে হয়। তাহা হইলেই অন্যত্ব অপরিহার্য্য হইতেছে। পশুদানের অধিকারীর পক্ষেই "পশুবলিং বিনা দেবীং পূজয়েন্ন কদাচন", এই

প্রাণিবলিদানের অধিকারীর পক্ষেই "বলিদানং বিনা যস্তু পূজয়েত্তারিণীং নরঃ।" এখন বুঝিতে পারিলে বৎস, বহ্নির অসত্তায় যেমন ধূমের অসত্তা হয়, সেইরূপ বলির অসত্তায় পূজার অসত্তা হয় না এইহেতু পূজাপক্ষে বহ্ন্যভাব-স্থানে ধূমাভাবরূপ ব্যাপ্তি নির্ণয় হইতে পারে না। ইহাই হইল বলির ব্যাপ্তি নিরূপণ।

শিষ্য। গুরো বলির ব্যাপ্তি বেশ বুঝিতে পারিলাম। বলি প্রশংসার জন্যই ঐ বলিবিধি কীর্ত্তন। কিন্তু গুরো—বলিদানের অধিকারীও পশুদানের অধিকারী কি আপনি ভিন্ন বলিতেছেন। আমি উভয়ের অধিকারী এক বলিয়া জানি। আপনি ভিন্ন বলিতেছেন কেন?

গুরু। বৎস, উহাদের পার্থক্য শুন। বলি শব্দে কুত্রাপি পশু জ্ঞান হয় না, হইলে পূর্ব্বোক্ত পূজাবিধিতে যেস্থলে বলিদানের উল্লেখ আছে সেই স্থানে পশুদান বলিলে কোন সন্দেহ বা বিপত্তি হইত না। তন্ত্রশাস্ত্রের যাহা লক্ষ্য তাহার কোন হানি হইত না অর্থাৎ অক্ষর সংখ্যা, লঘুগুরু ইত্যাদির কোন ক্ষতি হইত না, অথচ এইরূপ বিরুদ্ধ বা ভিন্ন ধারণা জন্মাইতে পারিত না।

শিষ্য। তাহা হইত না বটে, কিন্তু তাহাতে অর্থাৎ বলিদান স্থানে পশু দান বলিলে এই আপত্তি হইত যে, উপচারদানবৎ পশুদান হইত অর্থাৎ দান অর্থে সাধন ত্যাগার্থ প্রকাশ করিত বলিয়া পশুঘাতে আপত্তি হইত সুতরাং পশুহিংসা বুঝাইত না।

গুরু। বৎস, তোমার এইরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে কারণ দান শব্দ প্রসিদ্ধ স্বত্বধ্বংস ও পরস্বত্বোৎপত্তিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও এই স্থলে প্রসিদ্ধ ত্যাগার্থক দা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এই দান শব্দ অদাদি গণীয় লবন বা ছেদনার্থক (যথা "দাপস্তু লবনে প্রোক্তঃ" ॥ ধাতু কৌমুদী ॥ "দাল লুনৌ" ॥ কবিকল্পদ্রুমঃ ॥) দাপ (দা) ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট (অনট) করিয়া বা দিবাদি গণীয় ছেদনার্থ দো ধাতুর উত্তর লুট্ করিয়া দান হইয়াছে ঐ ধাতুর অর্থ ছেদন যথা "দোয়ছেদে" ॥ . কবিকল্পদ্রুমঃ। "দো অবখণ্ডনে "ছেদে" ॥ ধাতু কৌমুদী ॥ নিষ্পন্ন করিলে ছেদন ব্যাঘাত হইতে পারে না। অতএব বৎস বলিদান অর্থে পশুঘাত নহে বলিয়াই শাস্ত্রে উহারা এক পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হয় নাই। বলিদান ব্যাপক ; পশুদান ব্যাপ্য সুতরাং উহারা এক নহে। সাধক মাত্রেই

বলিদানে অধিকারী কিন্তু পশুদানের বিশেষ সাধক আছে বলিয়াই বিভিন্নরূপেউহানির্দ্দিষ্টহইয়াছে। এখনবুঝিলেবৎস কেন বলিদান ও পশুদান একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অধিকারী নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে পূজাভেদ নিরূপিত না হইলে কিছুই বুঝিতে পারিবে না বলিয়া পূজাভেদ নিরূপিত হইতেছে শুন বৎস? উপাসকের প্রকৃতি অনুসারে উপাসনার ও কোন কোন স্থলে এমনকি উপাস্যের মূর্ত্তি ভেদ হইয়াও থাকে। যদি সাধকের গুণ সাপেক্ষ সাধনা না হইত তাহা হইলে ত্রিবিধ পূজা শাস্ত্রে কদাপি বিহিত হইতে পারিত না। পুরাণ তন্ত্রাদিশাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই মূল ত্রিবিধ পূজাবিধি বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে :—

"সাত্ত্বিকী তামসী চৈব ত্রিধা পূজা চ রাজসী।

কালিকাপুরাণ, দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও বৃহন্নন্দীকেশ্বরে :—

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী তামসী চৈব রাজসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥

রুদ্রযামালে :—"ভাবত্রয়ং হি পূজানাং সত্ত্বরজস্তমোময়ম্।"

রাঘবভট্টে :—"পুনস্ত্রিধা মতা পূজা উত্তমাধমমধ্যমা।"

অন্নদাকল্পে :—"সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু"
সাত্ত্বিকী দ্বিভুজা গৌম্যা মূর্ত্তি র্যস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা।

অতএব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ পূজানির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই বিধিত্রয়ের মধ্যে প্রথম সাত্ত্বিক পূজা স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে তাহা হইলে অপর দ্বিবিধ পূজা গুণানুসারে অনায়াসে স্থির করা যাইবে। সাত্ত্বিক পূজা স্বরূপ কালিকা পুরাণ, দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও বৃহন্নান্দীকেশ্বরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে

যথা—"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা।
দেবীসূক্তং জপশ্চৈব যজ্ঞোদহ্নিষু তর্পণম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে :—"জীবহিংসা বিহীনা যা বরা পূজা চ সাত্ত্বিকী" (বৈষ্ণবী) জীবহিংসা বিহীন যে পূজা তাহাই শ্রেষ্ঠপূজা তাহা সাত্ত্বিক পূজা। নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ, হোম ইত্যাদি সাত্ত্বিক পূজার বিধি। তদিতর রাজসিক

ও তামসিক। এ কারণ বলি ও ত্রিবিধ। কেহ কেহ তামসিক বলিকে রাজসিকের অন্তর্গত করিয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক বলিস্বরূপ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন যথা—

সময়াচারতন্ত্রেঃ—"বলিশ্চ দ্বিবিধো দেবি সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা"

সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জ্জিতঃ

রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে।

কালিকা পুরাণ ও দুর্গোৎসব তত্ত্বে যথাঃ—

রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবদ্যৈঃ সাম্বি ষস্তথা।

সুরামাংসাদ্যুপহারৈা জপযজ্ঞৈ র্বিনা তু যা॥

শিব বলিতেছেন হে দেবি বলি ও দ্বিবিধ সাত্ত্বিক ও রাজসিক, সাত্ত্বিক বলি রক্তমাংসাদি বর্জ্জিত এবং রাজসিক রক্তমাংসাদিযুক্ত। সাত্ত্বিক পূজায় সাত্ত্বিক ও রাজসিক পূজায় রাজসিক বলি কল্পিত হইবে। সাত্ত্বিক সাধক সাত্ত্বিক পূজায় সাত্ত্বিক বলি ও রাজসিক সাধক রাজসিক পূজায় রাজসিক বলিদানের স্বাভাবিক বা মুখ্য বা প্রধান অধিকারী। অন্যথা স্বভাবনাশে স্বরূপনাশাপত্তি হইবেই হইবে। সাধকও ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে যথা—

সময়াচার তন্ত্রে সপ্তম পটলে—

"সাধকাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা।

তামসস্তু তথা দেবি তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্

সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্যুক্তো লক্ষণৈশ্চাপি সুন্দরি।

সাত্ত্বিকো বলিদানানি নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।

রাজসোরজোগুণৈর্যুক্তঃ সত্যং সত্যং বরাননে?

রাজসো বলিদানানি সুরেশে রাজসৈর্যুতঃ।

তামসস্তামসগুণৈরালস্যাদিযুতঃ প্রিয়ে।

ন শ্রদ্ধা বলিদানেষু পূজাদিষু চ সুন্দরি॥

সাধক ত্রিবিধ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক সাত্ত্বিকলক্ষণ-যুক্ত, নিত্য যত্নপূর্ব্বক সাত্ত্বিক বলিদান করিবে, রাজোসিক রজগুণযুক্ত হে বরাননে, রাজস বলিদান সত্য সত্য তাহার অনুষ্ঠেয়। তামসিক তমোগুণযুক্ত হে প্রিয়ে বলিদান ও পূজাদিতে তাহার শ্রদ্ধা থাকে না। পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে বৃহৎ বলিদান সাত্ত্বিক পূজায় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই বলি সাত্ত্বিক বলি বুঝিতে হইবে, সাত্ত্বিক বলি নিরামিষ, পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি।

বৎস ত্রিবিধ পূজা বলিলাম বুঝিতে পারিতেছ সাত্ত্বিক সাধক মাংসাদি বর্জ্জিত; রাজসিক ও তামসিক সাধক মাংসশোণিতাদিযুক্ত বলিদ্বারা পূজা করিতে একান্ত অধিকারী, সুতরাং বলিদান শব্দপ্রয়োগ দেখিয়াই পশুঘাত সিদ্ধান্ত করা বাতুলতা ও জীবহিংসালোলুপতা তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎস ত্রিবিধপূজা ত্রিবিধ বলি ও ত্রিবিধ সাধক বলিলাম, এই বুদ্ধি লইয়া শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে কুত্রাপি বিরোধ ঘটিবে না।

শিষ্য। গুরো! পূজা ও বলিভেদ বেশ বুঝিয়াছি অনুষ্ঠান সবিস্তর অধিকারিভেদ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, দেখিতেছি এই সাধকভেদ বা অধিকারিভেদই সর্ব্বসংশয়ছেদ করিতে সমর্থ।

গুরু। বৎস! ধীরভাবে শ্রবণ কর, পূজাব্যাপার সম্পূর্ণরূপে সাধকের উপর নির্ভর করে বলিয়া সাধককে আধার ও সাধনাকে আধেয় বলিতেছি। সাধক, আধার, অধিকারী বা পূজক এই স্থলে একই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেইরূপ পূজা, আধেয়, সাধ্য বা অধিকার্য্য একরূপ। সাধকের ত্রৈবিধ্য বা ভেদ বলিয়াছি অধুনা এই সাধক কাহারা তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে এই নির্ণয়ই প্রকৃত অধিকারিনির্ণয়। সাধক স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতসংস্কারপরিপুষ্টপ্রকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে, এই হেতু সাধক সাপেক্ষ সাধনা—শাস্ত্রে ত্রিবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। একই পূজা অধিকারিভেদে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ত্রিবিধ সাধকই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে পূজা করিয়া অভীষ্টফল লাভে সমর্থ হয়েন। যে যাহার অনধিকারী সে তাহার অনুষ্ঠাতা হইলে ভীষণ অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে, একারণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক কর্ম্ম, রাজসিক রাজসিক কর্ম্ম ও তামসিক তামসিক কর্ম্ম করিলেই ইষ্টলাভ করিবেন। অনধিকারচর্চ্চা করিলে অনিষ্ট অবধারিত হইয়া থাকে, ইহা জগতে বিঘোষিত করিতেই ত্রেতাবতা ভগবান্ রামচন্দ্র সৎকর্ম্ম পরায়ণ হইলেও অনধিকারচর্চ্চাকারী তপোনিরত শূদ্র শম্বুককে সংহার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান্ প্রাণিহিংসাকর যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ গীতা ৩অঃ

হে কৌন্তেয় নিজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম সদোষ হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। বিগত গুণ নিজধর্ম্ম ও বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। গুরো। সাত্ত্বিকাদি সাধক কাহারা ?

গুরু। বৎস! যাহারা সত্ত্বগুণাধিক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা স্বভাবসাত্ত্বিক, সেইরূপ রজোগুণ ও তমোগুণাধিক্য লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা স্বভাব রাজস ও তামস ইহাদিগকে মুখ্যসাত্ত্বিক মুখ্য রাজসিক বা মুখ্যতামসিক বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। গুরো! তাহা হইলে অস্বাভাবিক বা গৌণ সাত্ত্বিকাদি নিশ্চয় আছে তাহা কিরূপ ?

গুরু। বৎস! ঠিক বলিয়াছ অস্বাভাবিক বা গৌণ সাত্ত্বিকাদি আছে, শুন বলিতেছি যাঁহারা সেই সেই গুণাধিক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই অথচ বর্ত্তমান শিক্ষাসংসর্গাদিদ্বারা অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণকোষে সম্যক্‌রূপ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ঐরূপ গৌণ বা অস্বাভাবিক সাধক বলা যায়। অধিকারী বা সাধক এইরূপ বিভক্ত যথা:—
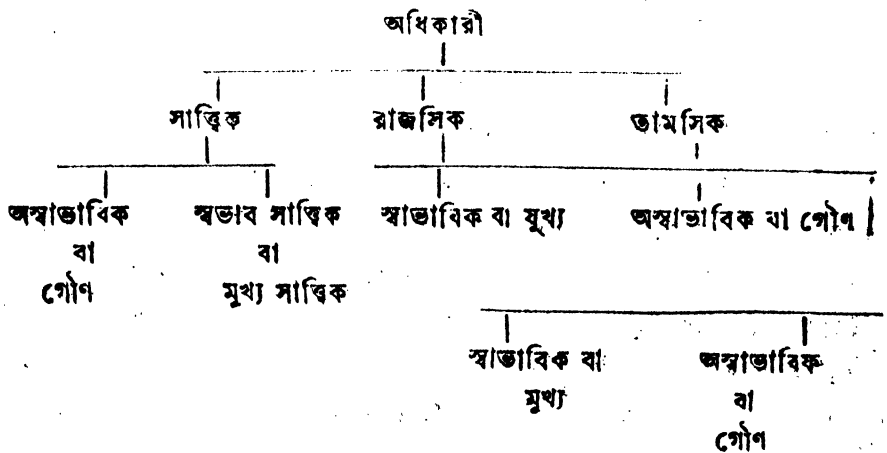
শিষ্য। গুরো! বড়ই মধুর শুনিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বাভাবিক অধিকারী নির্ণয় করুন তাহা হইলে উহা ভিন্ন অস্বাভাবিক অনায়াসে বুঝিতে পারি।

গুরু। শুন বৎস, স্বভাব সাত্ত্বিক নিরূপিত হইতেছে, উৎপত্তি, যোনি, কারণ বা প্রভবের উৎকর্ষাপকর্ষবশতঃ উৎপন্ন, যৌন বা প্রভুতের উৎকর্ষাপকর্ষ

নির্ণীত হইয়া থাকে কারণ শাস্ত্র বলেন, "কার্য্যগুণাঃ কারণগুনাইরভন্তে "কার্য্যকারণয়ো স্তাদাত্ম্যম" "সর্ব্বেকার্য্যগুণাঃ কারণগুণানপেক্ষন্তে"——কারণের গুণ সমূহ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কার্য্য ও কারণ একরূপ ইত্যাদি যেমন ঘটরূপ কার্য্য মৃত্তিকারূপ কারণকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় এবং বস্তুতঃ সম্পন্নঘট মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে সেইরূপ বিরাট পুরুষের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট অংশ সমূহ হইতে সমুৎপন্ন বর্ণচতুষ্টয় উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বলিতে হইবে। ঐ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদিশাস্ত্রে তাহার বহু উল্লেখ আছে শ্রুতি বলেন, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যঃ, উরুস্তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ, পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" ॥ ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত ১২॥ "ব্রহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ মধ্য স্তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ৎ" ॥ অথর্ব্ববেদ ১৯। ৬। ৬॥ "মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত" ॥ তৈত্তরীয়ং সংহিতা (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ) ৭। ১।১।৪ ॥ যজমানের সংহিতায় ১৪।২৮—৩০:— ত্রিস্তৃভিরস্তুবত ব্রহ্মাসৃজ্যত…॥ পঞ্চদশভিরস্তুবত ক্ষত্রমসৃজ্যত…॥ নবদশ-ভিস্তুবত শূদ্রার্য্যাবসৃজ্যেতাম্……।

স্মৃতি বলেন—"লোকানান্তু বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ মনু ১ অঃ ॥

মহাভারতে—"ব্রহ্মণো মুখাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ"

যোগিনীতন্ত্রে—"সর্ব্বদেবময়ো বিপ্রো ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
ব্রহ্মতেজঃ সমুদ্ভূতঃ সাদাপ্রকৃতিকো দ্বিজঃ॥

বশিষ্ঠ বলেন—"প্রকৃতিবিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং সংস্কারবিশেষাচ্চ" ॥ ৮র্থ অঃ ॥

ব্রাহ্মণ এই বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদেশ বৈশ্য ও চরণ শূদ্র ॥ তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নির্ম্মান করিলেন (প্রজাপতি প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা স্তব করায় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল; (হস্ত ও পদাঙ্গুলি দশ, করযুগ ও বাহুযুগ এবং নাভির উর্দ্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বারা স্তব করায় ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইল (দশ অঙ্গুলি ও শরীরের উর্দ্ধস্থ ছিদ্ররূপ নবপ্রাণ এই) উনবিংশতি দ্বারা স্তব করিলে বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্ট হইল ॥ লোক সমূহের বিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত বিরাট পুরুষ মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করিলেন ॥ ব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ বিপ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ, সর্ব্বদেবময়; ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন দ্বিজ

সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত ॥ প্রকৃতি ও সংস্কার ভেদে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ হইয়াছে দ্বাপর যুগাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ ॥ ৪র্থ ॥ ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাবে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণই স্বভাব সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। ইহা যে ঐহিক গুণ বা কর্ম্ম সাপেক্ষ নহে তাহা বশিষ্ঠের ঐ "প্রকৃতিবিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং সংস্কার বিশেষাচ্চ" উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ঐহিকগুণ কর্ম্মাদিজনিত বর্ণবিভাগ কল্পনা অন্যায্য ও বাতুলতা মাত্র। গীতার ঐ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ইত্যাদতি শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান্ আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ "চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণা শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চগুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমদমতপাংসীত্যাদীনি কর্ম্মাণি সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃ প্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতীনিকর্ম্মাণি, তমোউপসর্জ্জনরজঃ প্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজঃ উপসর্জ্জনতমঃ প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যং ময় সৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥

শ্রীধর স্বামী বলেন—"সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি সত্ত্বরজঃপ্রধানা ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যাদীনিকর্ম্মাণি, রজস্তমপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণিতমঃ প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং ত্রৈবর্ণিক শুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণি।

মধুসূদন সরস্বতী বলেন—শরীরারম্ভকগুণবৈষম্যাদপি ন সর্ব্বে সমান-স্বভাবা ইত্যতআহ চতুর্ব্বর্ণ্যমিতি...............সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণা......সত্ত্বোপ-সর্জ্জনরজঃ প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ............ তমউপসর্জ্জনরজঃ প্রধানাঃ বৈশ্যা ......রজউপসর্জ্জনতমঃ প্রধানাঃ শূদ্রাঃ......ইত্যাদ

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলরাম বিদ্যারত্ন সাংখ্যভূষণ।

মুগ্ধ

জানিনাক ধরম করম, নাইক তায় প্রবৃত্তি কভু,
কলুষকালিমা মাখি সদা, নিবৃত্তি যে তাই নাই প্রভু!
থাকি হিয়ার রন্ধ্রতলে, ওগো আমার স্বামী,
যখন যাহা করাও মোরে, মুগ্ধ হয়ে করি আমি।

শ্রীপশুপতি সরকার।

মোহিত হইয়া বিবিধ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি। যিনি এই দেহগেহের অধীশ্বর, যিনি হৃদয়সিংহাসনের রাজা, আমরা এমনই হতভাগ্য যে, একদিনও তাঁর সন্ধান করিলাম না। বৃথাই জীবনজনম বৃথা গত হইয়া চলিল। বিদ্যুত্তাভ্রনিমেষবৎ, পদ্মপত্র জলবৎ এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, কখন এই গেহস্বামী গৃহত্যাগ করিবেন তাহা কে জানে? তাই বলি মন, সেই পরমকারণ ভুবনজীবনকে চিনিবার চেষ্টা কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআন্তনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণ।

সম্প্রতি আমেরিকার মাউণ্ট-উইলসন্-মানমন্দিরে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণ স্থাপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে। ঐ দূরবীণের জ্যোতিষ্কের বিম্ব প্রতিফলনকারী দর্পণের ব্যাস (Diameter of the Reflecting mirror) একশত ইঞ্চি। ইহার পূর্ব্বে যে বৃহত্তম দূরবীণ ছিল তাহার দর্পণের ব্যাস ৬০ ইঞ্চি। যখন মাউণ্ট উইলসন্ মানমন্দিরে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী প্রস্তুত হইতেছিল তখন ব্রিটিশ ক্যানাডার ভিক্টোরিয়া নগরের ডমিনিয়ন মানমন্দিরে ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের দর্পণযুক্ত আর একটী অতিকায় দূরবীণ প্রস্তুত হইতেছিল। এই দূরবীণের স্থাপনাকার্য্যও শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত একশত ইঞ্চির দূরবীণ অপেক্ষাও এই ৭২ইঞ্চির দূরবীণের কল-কব্জার গঠন ও সংস্থাপননৈপুণ্যে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছে। উক্ত ডমিনিয়ন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ প্লাস্কেট এই দূরবীণের যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জ্যোতির্বিদগণের ও কল-কব্জা প্রস্তুতকারী ইঞ্জিনিয়ারগণের চিত্তাকর্ষক পাঠ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দূরবীণের যে অংশ জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণকালে সঞ্চালন করিতে হয় এই ৭২ইঞ্চির দূরবীণের সেই অংশের ওজন ৪৫ টন্ বা ১২৬১৫ মণ। অত ভারী একটা যন্ত্রকে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিখুঁতভাবে কলে চালান বড় সহজ কথা নয়। যাঁহারা ইকোয়েটোরিয়েল মাউণ্টিংএর (A telescope with Equatorial mounting) দূরবীণ ব্যবহার করিয়াছেন

তাঁহারা জানেন যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সহিত ঠিক সমানভাবে দূরবীণ চালনা করিলে জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যবিন্দুতে নিশ্চল থাকে। এইজন্য বড় বড় দূরবীণে ঘড়িকল সংযুক্ত থাকে। ডমিনিয়ন মানমন্দিরের ঐ ৭২ ইঞ্চির দূরবীনে যে ঘড়িকল (Driving clock) সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার কার্য্য এত সূক্ষ্ম যে জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণে উহার গতির কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে নাই। ডাঃ প্লাস্কেট বলিয়াছেন যে উহার কল-কব্জা এত নিখুঁত অথচ সরল যে ঐ দূরবীণ ব্যবহারকালে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হয়।

১৯২০ খ্রীঃ অঃ ২৯শে এপ্রিল তারিখের নেচার পত্রিকায় ১০০ ইঞ্চির দূরবীণের এবং রয়েল য়্যাষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির ক্যানাডা হইতে প্রকাশিত ১৯২০ খ্রীঃ অঃ জুনমাসের পত্রিকায় ৭২ ইঞ্চির দূরবীণের দর্পণ প্রস্তুতের প্রণালী ও কল-কব্জার বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। অবশ্য আমি ঐ উভয় পত্রিকার কোনটাই দেখি নাই, ব্রিটিশ য়্যাষ্ট্রনমিক্যাল য়্যাসোসিয়েসনের পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাই আমার অবলম্বন। পাশ্চাত্য জগতের জ্যোতির্বিদগণ বলিতেছেন যে, এই দুইটী অতিকায় দূরবীণ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহাদের নয়নে দূরগগনের জ্যোতিষ্ক সমূহের নূতন আলোক প্রতিফলিত হইবে। যে সকল জ্যোতিষ্ক এতদিন তাঁহাদের শতবিধ চেষ্টা ও যত্নসত্বেও আত্মগোপন করিয়াছিল, এবার তাহাদিগকে ধরা দিতেই হইবে। যে সকল যৌগ তারা জগত, যুগল নক্ষত্র, বহুরূপী নক্ষত্র ও নীহারিকা কেবলমাত্র রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের বিষয়ীভূত ছিল অথবা কদাপি অতিক্ষীণ কায়ায় ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়িত, অতঃপর তাহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। পাশ্চাত্যদেশের জ্যোতিষীগণের এবম্বিধ অধ্যবসায় সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য, সুদূর-গগনের কতদূরে কোনস্থানে কোন জ্যোতিষ্ক কিভাবে লুকাইয়া আছে তাহারই অনুসন্ধানে যেন তাঁহারা উধাও হইয়া ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম, অধ্যবসায় ও অর্থ যেন ঐ সুদূর গগনের সুদূরতম প্রদেশ হইতে বিশ্বনিয়ন্তা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। হয়ত কোনদিন কোন জ্যোতিষীর দূরবীণের ক্ষীণ দৃষ্টি রেখা সেই বিশ্বনিয়ন্তার মহাসিংহাসনতলে উপনীত হইবে। আর আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞানগরিমায় অন্ধ হইয়া আছি, এবং কখনও বা সেই জ্ঞান তরঙ্গিনীর আদিমনির্ঝরে ফিরিয়া যাইতে চাই। তাই আমাদের "জ্যোতিষ মানমন্দির" কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, এম, বি, এ,এ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

অন্বয়ব্যাখ্যা । (আয়ুঃ জীবিতং) সত্ত্বং (উৎসাহঃ) বলং (শক্তিঃ) আরোগ্যং (রোগরাহিত্যং) সুখং (চিত্তপ্রসাদঃ) প্রীতিঃ (অভিরুচিঃ) বিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুরাদেঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ) রস্যা (রসবন্তঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সারাংশেন চিরস্থায়িণঃ) হৃদ্যাঃ (দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ) (এবম্ভূতাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ । ৮

বঙ্গানুবাদ । আয়ু, উৎসাহ, বল, সুখ, প্রীতির বৃদ্ধিকর, সরস, স্নিগ্ধ স্থায়ী এবং যাহা দর্শনমাত্র আহারে প্রবৃত্তি হয় এই সকল আহার সাত্ত্বিক-দিগের প্রিয় । ৮

আলোচনা । যে আহার আয়ুর্বর্দ্ধনকারী, যাহাতে শরীরের উদ্যম উৎসাহ বৃদ্ধি করে, যাহা বলবৃদ্ধিকর, যে আহারে শরীরকে নীরোগ রাখে, যে আহার্য্য ভোজনে তৃপ্তিকর, যে আহারের সারাংশ শরীরে দীর্ঘস্থায়ী হয়, যে আহার্য্য দেখিলে ভোজনে সতই আকাঙ্খা হয়, এই প্রকার আহার সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রিয় । সাত্ত্বিকেরা এতাবত আহার্য্য শ্রদ্ধার সহিত আহার করেন । ৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

অন্বয়ব্যাখ্যা । অতিকটুঃ (ঝালইতিভাষা) (অতিশব্দ কট্বাদি বিদাহ্যন্ত সর্ব্বেস্বপি সম্বোধ্যতে) অত্যম্লোঽত্যুষ্ণোঽতিলবণ অদিষ্ঠঃ অতিতীক্ষ্ণঃ (উগ্রলঙ্কাদি) অতিরূক্ষঃ (নীরসভর্জিতচপিটকতণ্ডুলাদির) অতিবিদাহী (সর্ষপাদি বিদগ্ধ পাকাপাকে পিত্তবর্দ্ধকঃ) (এতে) দুঃখং (সুখপ্রিয় বোধে আহারান্তে আধ্মানাদি ক্লেশঃ) শোকঃ (আহারোত্থ পীড়াজন্যঃ মৃত্যুর্বা শোকঃ) আময়ঃ (বিবিধ রোগঃ) প্রদান কারিণআহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ (প্রিয়াঃ) (ভবন্তি) ৯

বঙ্গানুবাদ । অতিকটু অম্ল লবণ উষ্ণ তীক্ষ্ণ (লঙ্কাদি) রুক্ষভাজা দ্রব্যাদি পিত্তবর্দ্ধক সর্ষপাদি যাহা অতিমাত্রায় আহারে দুঃখ শোক রোগের কারণ হয় তাহা রাজস ব্যক্তিদিগের প্রিয় হয় । ৯

আলোচনা। অতিকটু অর্থাৎ অত্যন্ত ঝাল, অধিক অম্লদ্রব্য, অধিক লবণ বা লবণাধিক বস্তু, অতিউষ্ণ স্পর্শদ্রব্য, উগ্রগন্ধাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য, ভাজা চিড়া চাউল বা লড্ডুকাদি রুক্ষদ্রব্য, সর্ষপাদি যাহা পরিপাকে পিত্তবর্দ্ধক হইয়া অম্লকর হয় এইপ্রকার যেসকল দ্রব্য শারীরিক পীড়ার হেতু এবং পরিপাকে রোগজন্য শোক জন্মাইতে পারে তাহাই রাজস প্রকৃতির লোকের প্রিয় হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ইহা পরিত্যাগ করেন। ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

সান্বয়ব্যাখ্যা। যাতযামং (যামং প্রহরঃ প্রহরপূর্ব্বকালঃ যাতঃ যস্য তৎ প্রাপ্তং) গতরসং (রসবিযুক্তং রসাস্বাদং প্রাপ্তং) পূতি (দুর্গন্ধং) পর্য্যুষিতঞ্চ (দিনান্তরপক্কং) উচ্ছিষ্টং (অন্যভুক্তাবশিষ্টং) অপি অমেধ্যং (অপবিত্রং স্মার্ত্তাচারে নিষিদ্ধ পলাণ্ডু রসুনাদির সংসৃষ্টং) যৎ ভোজনং (ভোজ্যং) (তৎ) তামস প্রিয়ম্। (তামসস্য প্রিয়ং) ১০

বঙ্গানুবাদ। যে খাদ্য পাক হইয়া ১ প্রহর গত হইয়াছে, যাহা পাকের পর নীরস হইয়াছে, দুর্গন্ধ এবং পূর্ব্বদিন প্রস্তুত, অন্যের ভোজনাবশিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির প্রিয় আহার। ১০

আলোচনা। যে খাদ্য প্রস্তুতের পর অধিক সময় গত হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে দ্রব্য রন্ধনের দোষে বা রন্ধনের পর দীর্ঘকাল গত হওয়া অথবা অনাবৃত থাকায় প্রকৃত আস্বাদের অন্যথা হইয়াছে, যে খাদ্য পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি যাহা অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অপবিত্র অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য ভোজন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবম্বিধ ভোজন তমোগুণীদিগের প্রিয় হয়। সত্ত্বগুণী এই সকল দ্রব্য অস্পৃশ্য বোধে পরিত্যাগ করেন। ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

সান্বয়ব্যাখ্যা। যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধঃ তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ) (পুরুষৈঃ) যষ্টব্যমেব (যজ্ঞানুষ্ঠান মেব কার্য্যং নাতঃ ফলং সাধনীয়ম্) ইতি মনঃ সমাধায় (চিত্তৈকাগ্রং কৃত্বা) বিধিদৃষ্টঃ (বিধিনাদিষ্টঃ আবশ্যকর্ত্তব্য বিহিতঃ যথাশাস্ত্রবিহিতঃ) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) সঃ সাত্ত্বিকঃ। ১১

বঙ্গানুবাদ। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে শাস্ত্র বিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

আলোচনা। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে যজ্ঞ তিন প্রকার। তাহা সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে। প্রথমে সাত্ত্বিক যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। ফল কামনা শূন্য হইয়া কেবল ঈশ্বর প্রীতির উদ্দেশে অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যথা-শাস্ত্র বিধান অনুসারে যে যজ্ঞ করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কতকগুলি যজ্ঞ নিত্য কতকগুলি যজ্ঞ কাম্য। সন্ধ্যা তর্পনাদি নিত্য যজ্ঞ, আর অশ্বমেধাদি কাম্য যজ্ঞ। আত্মসুখ, শত্রুনাশ, স্বর্গ-কামনায় যে যজ্ঞ করা যায় তাহাই ফলা-কাঙ্ক্ষাযুক্ত যজ্ঞ, তাহা প্রণালী ভেদে রাজসিক বা তামসিক হয় আর ঈশ্বর প্রীতি কামনায় ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া যে যজ্ঞ করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

অভিসন্ধায়তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈবযৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠতং যজ্ঞং বিদ্ধিরাজসম্॥ ১২

সান্বয়ব্যাখ্যা। অপি তু ফলং অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্য) এব চ যৎ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) হে ভরত শ্রেষ্ঠ (অর্জ্জুন) তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি। (জানীহি) ১২

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন ফল কামনা অথবা নিজ মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজসিক যজ্ঞ। ১২

আলোচনা। ইহলোকে সুখী হইব, ধন সম্পৎ বৃদ্ধি হইবে, শত্রুনাশ হইবে, দেহাবসানে স্বর্গলাভ করিব, এই কামনা পূর্ব্বক অথবা আমি যজ্ঞ করিব লোকে আমাকে ধার্ম্মিক বলিবে। চতুর্দ্দিকে আমার যশঃ বিস্তার হইবে ইত্যাদি কামনা করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় তাহা রাজসিক যজ্ঞ। ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্যং) অসৃষ্টান্নং (অন্নদান বিহীনং যস্মিন্ যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যোঽন্নং ন সৃষ্টং ন দত্তং) মন্ত্র হীনং (মন্ত্রৈর্হীনং মন্ত্রতঃ উদাত্তানুদাত্তস্বরতঃ বর্ণতশ্চ বিযুক্তং) অদক্ষিণম্ (যথোক্তদক্ষিণারহিতম্) শ্রদ্ধা বিরহিতং (শ্রদ্ধা শূন্যং) যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি শিষ্টাঃ) ১৩

বঙ্গানুবাদ। যে যজ্ঞ শাস্ত্র বিধি বর্জ্জিত, অন্নদান বিহীন, যে যজ্ঞে পরি-শুদ্ধ মন্ত্র পাঠ হয় না, যথোক্ত দক্ষিণা দেওয়া হয় না, যাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনু-ষ্ঠিত হয় না তাহা তামস যজ্ঞ। ১৩

আলোচনা। তমোগুণের লক্ষণ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। তমোগুণীরা স্বেচ্ছাচারী শাস্ত্রবিধি গুরূপদেশ তাহারা গ্রাহ্য করে না। সুতরাং তাহাদের যজ্ঞ শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পন্ন হয় না। দেব দ্বিজে তাঁহাদের যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকায় যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের যজ্ঞ সম্পাদনে সুশিক্ষিত সাত্ত্বিক পুরোহিত আদৃত হন না, সুতরাং তাহাদের যজ্ঞে মন্ত্রাদি ও বিশুদ্ধভাবে উদাত্তানুদাত্তস্বরে উচ্চারিত হয় না। তামসিকলোকেরা আত্ম অহঙ্কারপূর্ণ, সুতরাং দেবদ্বিজে দান কি যজ্ঞ কার্য্য তাহাদের শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হয় না। এই সকল কারণে তামস প্রকৃতির লোকের সকাম যজ্ঞ তামস যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। তামস যজ্ঞ ঐহিক কি পারত্রিক সুফলপ্রদ হয় না। ১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপউচ্যতে ॥ ১৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ (দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ প্রাজ্ঞাগুরব্যতিরিক্তো হন্যোহপি তত্ত্ববিদঃ) তেষাং পূজনং, শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ) আর্জ্জবং (ঋজুত্বং) ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্য্যধারণম্) অহিংসাচ শারীরং (শরীরনির্বর্ত্ত্যং) তপ উচ্যতে। ১৪

বঙ্গানুবাদ। দেবতা দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, অন্তরবাহ্যশৌচ সরলতা ও অহিংসা এইসকল শারীর তপঃ। ১৪

আলোচনা। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্লোকে সত্ত্বাদি ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। অতঃপর শরীরিক বাচিক মানসিক তিন রকম তপস্যার কথা বলিতেছেন। দেবতা ব্রাহ্মণ মন্ত্রদাতা ও উপদেষ্টা গুরু এবং গুরু ব্যতীত ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত শাস্ত্রদর্শী প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদিগকে পূজা ও সৎকার করা পবিত্রমৃত্তিকাও পবিত্রজলাদিদ্বারা বাহ্যিকশুদ্ধি, এবং ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম অন্তরশুদ্ধি সরলতা কামচিন্তা পরিত্যাগ বীর্য্যধারণ অহিংসা এই সকল কার্য্য শারীরিক তপ বলিয়া কথিত হয়। ১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যত্।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে ॥ ১৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। বাচিকং তপ আহ। অনুদ্বেগকরং (অপরুষং) সত্যং (যথার্থভাষণং প্রিয়ং শ্রবণ—সুখকরং) হিতঞ্চ (কল্যাণকরং) বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চ (যথাবিধিবেদাভ্যাসঃ) (ইতি) যৎ (তৎ) বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে। ১৫

বঙ্গানুবাদ। যাহাতে ক্লেশদায়ক না হয় এমন কথা, সত্য প্রিয় এবং হিতজনক বাক্য কথন বেদাভ্যাস করা বাচিক তপস্যা। ১৫

আলোচনা। লোকের সহিত এরূপভাবে আলাপ করিতে হইবে যে, যে বাক্য শুনিলে শ্রোতার মনে ক্লেশবোধ না হয় এবং সত্য প্রিয় ও হিতজনক হয়। অর্থাৎ যথার্থ কথা যাহা শ্রোতার তুষ্টিকর ও তাহার কল্যাণকর হয়। নীতিশাস্ত্রে আছে যে—"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ংব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" এইরূপ, যথা বিধি নিত্য বেদাধ্যায়ন স্তব স্তোত্র পাঠ এই সকল বাচিক তপস্যা। ১৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

লঙ্কা-বিজয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

অবগাহি জলাশয়ে অপ্সরা কিন্নরী
বিনিন্দিতা আনন্দিতা সুন্দরী নিকর
স্নানরতা, নিধুবন নিপীড়িতা, আহা
আকণ্ঠ ডুবায়ে কায় অকুণ্ঠিত চিতে।

বিকসিত শতদল অতুলিত মুখ
সে রমণী নিকরের, মৃণাল সুভুজ,
ভাসমান পদ্মদলে [illegible]
বারি রাশি পরে মরি শোভে সারি সারি
মকরন্দ লোভে ক্ষোভে ভ্রমে অরবিন্দ।
ফিরিবারে মধুকর নিকর কাতরে।

অতঃপর লঙ্কানিতে অন্দর মহল
ছুটিল পবনবেগে পবন কুমার
মহোৎসাহে হায় সেই চিরোৎসব ম
প্রাচীর বেষ্টিত শত স্বর্ণময়ী পুরী
মনোহর কারুকার্য্যশোভিত সুন্দর

দয়াকরি, কহ যাই শিশু রত্ন মোর।
আকাশ দুহিতা ওগো, কহ প্রতিধ্বনি
কোথায় রহিল মোর প্রাণধন গণ।
যাও দেখাইয়া দাসে তব কুলরবি
রাঘবেরে, ওহে রবি মিনতি আমার
ও পদে; হে তাতঃ বায়ু, আকৃতিসন্তানে
কৃপা-করি কহ শীঘ্র নরব্যাঘ্র কোথা?
কহ হে জলদপুঞ্জ, অঞ্জনানন্দনে
দীনের প্রবীণ মোর, শ্রীহরি কোথায়।
কিন্তু রে দুর্দ্দিন দেখি নির্দ্দয় সবাই
চিরদিন, কেহ নাহি শুনিল প্রলাপ
পাবণির, মনে মনে বুঝিলেক হনু
প্রাণ দিলে নাহি মিলে স্বজন সঙ্কটে
হতশ্বাস মৃতপ্রায় পবন-আত্মজ
মহাক্ষোভে; ছুটে পুনঃ বিষন্ন বদনে
অধোদেশে ধরি ক্ষুদ্র বানর আকৃতি
বসিলেক শাখিশাখে সরসীর তীরে
কাতরে; হায়রে কুল নির্ম্মূল হেরিয়া—
বিষণ্ণ বদন, যথা, অবসন্নকায়
অযোধ্যায় চিন্তাকুল সুমন্ত্র যেমতি
যুগপৎ আপনার স্মরি সর্ব্বনাশ।

শুনিল হরষে হনু সে সরসী তীরে
রাক্ষসদল মুখে রামলক্ষণবারতা
নীরবে কহিছে, হায়, রক্ষরাজ আজি
পূজি কালীকায় পদ নরবলী দিবে।
ওই সেই দেবালয় ওই কারাগার
ওই খানে রুদ্ধ, দুটী ক্ষুদ্রসিংহসম
সুপ্ত শিশু; হায় তারা জানে নাই মনে
সন্নিকট সর্ব্বনাশ বিনাশ তাদের।

হরি সেই স্বর্ণকান্তি ভ্রান্তি হয় মনে
সুচরিত্র রাজপুত্র, মিত্র হীন হেথা।

শুনিয়া উল্লাসে হনূ বিদ্যুতের গতি
ধরি পুনঃ মক্ষিরূপ, চক্ষু অগোচর—
ছুটে রক্ষঃ-কারাপানে যমাগার সম—
লৌহের কপাটময় দৃঢ় অর্গলিত।
ভ্রমিছে দুয়ারে দ্বারী পিপীলিকা শ্রেণী-
—সম, অবিরাম গতি ভীষণ আকৃতি।

পশিলেক অলক্ষিতে মুহূর্ত্তে পাবনি
ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে ঘোর আঁধার সে পুরে
নারে প্রবেশিতে সেথা রবি-শশিকর
কিম্বা মন্দ সমীরণ সুগন্ধ বাহন।
অন্ধতম, জরাগন্ধ, রক্ষঃ কারাগারে
হেরে হনু,—কোটী সূর্য্য সম দীপ্তিশালী
দাশরথি বন্দিবেশে অনুজ সহিত
দৃঢ়বদ্ধকরপদ কঠিনশৃঙ্খলে
লৌহময়; মহামোহে অভিভূত তথা
সুপ্তসিংহসম যেন গুপ্ত গুহা মাঝে।
স্বীয় অন্তঃপুরে মহী, মত্ত মহোৎসাহে
ভ্রমে নিঃসঙ্কোচ মনে,—জননী যেমতি
ঘুম পাড়াইয়া শিশু ফিরে নানা কাজে
নিশ্চিন্ত; প্রসন্ন চিত্ত প্রসন্ন বদন।
গুন্ গুন্ রব হনূ, করি কর্ণমূলে
জাগাইল হাস্যমুখে বিশ্ব মূলাধার
রাঘবে, চকিত রাম উন্মীলিয়া আঁখি
পলকের প্রায়, ত্রস্ত হনূরে হেরিয়া;
সুধায়, পাবনি মোরা কেন এ আঁধারে
দুই ভাই মাত্র। কোথা মিত্র বিভীষণ—
সুগ্রীব সুষেণ, আর সেনানী নিকর;—

এ যাজ্ঞা করিবারে মা তোমার পদে
ভুলনা যেনরে বৎস,—"ভিখারী রাঘব
অক্ষম মা সাক্ষাতিতে মুক্ত করি কর
ভাঙ্গি দৃঢ় কারাগার লৌহের নিগড়।

অহ গো প্রসন্নময়ি, সুপ্রসন্নমনে
অযত্ন জীবন তার; কিন্তু কৃপা করি
কর রক্ষা দিনহীন লক্ষ্মণের প্রাণ
দাক্ষায়ণি। এই ভিক্ষা শ্রীপদে তোমার।

হে বৎস যদ্যপি পায় পরিত্রাণ ভাই·
এ সঙ্কটে শঙ্করীর অনুকম্পা বলে
তুমি হে অম্বুজে মোর সরযূর তীরে
রাখিয়া আসিও, মাতা সুমিত্রার কোলে
সোদরস্তা জ্ঞানে স্বীয় উদারতাগুণে
উত্তরিয়া মরুস্থান উত্তর কোশলে।
ভক্তি গদ গদ চিত্তে প্রবোধি রাঘবে
ছুটিল মরুৎবেগে মরুৎকুমার
সানন্দে, আনন্দময়ীদেবীর মন্দিরে
অলক্ষিতে, সেই ক্ষুদ্র মক্ষিকার রূপে।

পশিয়া মন্দিরে হনু হেরেসচকিতে
বিরাটকরালমূর্ত্তি করেকরবাল
তীক্ষ্ণধারলোলজিহ্বা নরমুণ্ডমালী
শায়িত চরণ তলেশশাঙ্কশেখর
শূলপাণিশবরূপেরুক্ষজটারাশি
শিরে মণিময় ফণী গঙ্গা তরঙ্গিণী

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত

মধুর-ভজন ও জাতীয় উন্নতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নারীভাবে ভগবদ্ভজনাও আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ নহে, পরন্তু নারীহৃদয়ের মহনীয় ভাবসমূহ লাভ করিতে পারিলে, বর্ত্তমান অধঃপতনের স্রোত অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইত। আমাদের প্রধান অভাব একতার, এবং নিষ্কৃত্রিম প্রেমই ঐ একতারজনক, আর নারীহৃদয়ই ঐ প্রেমের প্রধান উৎস। আমাদের দ্বিতীয় প্রয়োজন সহানুভূতি, এবং নারীই উহার প্রসূতি, তৃতীয় প্রয়োজন জনসেবা, সে বিষয়েও নারীই শিক্ষয়িত্রী। পতি, পুত্র, ভ্রাতা, রোগশয্যায় মলমূত্রলিপ্তদেহে পড়িয়া ছটফট করিতেছে মাতা, পত্নী ভগিনী, বা কন্যা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিকৃতচিত্তে উভয়হস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে স্নেহসিক্তকরে অঙ্গমার্জ্জনা করিতেছে, অমৃতনিস্যন্দিসহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা হতাশ রোগীর প্রাণে নবীন বলের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। রোগীর একবিন্দু শান্তির জন্য হৃদয়ের শোণিত দিতেও কুণ্ঠিত নহে। পক্ষান্তরে ঐ সমুদয় নারীর রোগে আমরা ডাক্তারের ভিজিট্ দিয়াই কর্ত্তব্যের চূড়ান্ত করিয়া দিই। নারীর প্রেম, নারীর একনিষ্ঠতা, নারীর জনসেবা, সহানুভূতি, সদয়তা ধৈর্য্য সংযম, ত্যাগ প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণনিকর যদি আমরা লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারত উদ্ধার কেন? ত্রিলোক উদ্ধার করিতে পারিতাম। যদি ভালবাসায় কোন ধর্ম্ম থাকে, যদি ভালবাসাদ্বারা জগতের কোন উপকারসাধন হয়, তাহা হইলে নারীই তাহার আদর্শ হওয়া উচিত, এবং নারীভাবলাভই ঐ সাধনার সিদ্ধি। যদি বলেন পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি কি কেবলমাত্র নারীগণেরই একচাটিয়া? ব্যবহারক্ষেত্রে সেরূপ মনে হয় না, পুরুষেও ত ঐ সমুদয় গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। যায়—সত্য; কিন্তু পুরুষদেহত কেবল পুরুষ হইতেই উৎপন্ন নহে উহাতে স্ত্রীর অংশও আছে। সুতরাং নারীজনোচিত কোমলবৃত্তিগুলি মাতা হইতে সন্তানে প্রবিষ্ট হয় ও পুরুষোচিত পুরুষবৃত্তিগুলি পৈতৃক ধন অর্থাৎ পিতা হইতে প্রাপ্ত। তাই বোধ হয় স্বনামধন্য পুরুষ সিংহ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে সৎমাতার প্রয়োজন। নারীতে

তিন অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বায়বীয় (Gaseous) তরল (Liquid) এবং ঘন (Solid) বিকর্ষণের আধিক্যই বায়বীয়তার হেতু, আর আকর্ষণের আধিক্যই পদার্থের ঘনত্বসাধিত হয়। আকর্ষণ বিকর্ষণের সাম্যাবস্থা তারল্যের হেতু। প্রেমের নিয়মও প্রায় এইরূপ। প্রেমের আকর্ষণ যেখানে অতি প্রবল সেখানে একহৃদয় অপরহৃদয়ের অভিমুখে মহাবেগে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। তাহারই আদর্শাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু। প্রেম আকর্ষণীশক্তি, ও মায়া বিকর্ষণীশক্তি। প্রেমের আকর্ষণে জীবের ভগবদাভিমুখ্য ঘটে, প্রেমের আকর্ষণে জীবেভগবানে মাখামাখী হয়। পক্ষান্তরে মায়ার বিকর্ষণীশক্তি (Repulsion) প্রভাবে জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া দূরতম সংসারকূপে নিঃক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং প্রেমই জীবের সারাৎসার, তন্মধ্যে আবার কান্তা প্রেম সারতম, কারণ ইহার অধিকৃত মধুররসে অপর সমুদয় রসের সমাবেশ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে এবিষয় দৃষ্টান্তসহ বিশদভাবেই বর্ণিত আছে। মধুর রসে যে অন্যান্য সমুদয় রসের সমাবেশ আছে তাহা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন অনেক কবিগণের লিপিভঙ্গীতেই প্রকাশ পাওয়া যায়। মহানাটককার সীতাশোক সন্তপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া নির্গত করাইয়াছেন;—"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া চধাত্রী স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা। রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে"—কবিকুলচূড়ামণি ভবভূতি এই দাম্পত্য প্রেমের যে প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি সংস্কৃত পদ্যে অঙ্কিত করিয়াদিয়াছেন ভক্ত পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই পদ্যটি উপহার দিলাম—"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসুযৎ। বিশ্রামোহৃদয়স্য যত্রজরসি যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ। কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎস্নেহসারেস্থিতং। ভদ্রং প্রেমসুমানুষস্যকথমপ্যেকংহিতৎ প্রাপ্যতে"—যে প্রেম সুখে ও দুঃখে একরূপই থাকে, সকল অবস্থাতেই যে প্রেম অনুকূল, শোক দুঃখাভিভূত হৃদয়ের পক্ষে যে প্রেম একমাত্র বিশ্রাম স্থল, বার্দ্ধক্যেও যে প্রেমের হ্রাস বা বিনাশ হয় না দীর্ঘকাল সংসর্গে লজ্জা ভয়াদির আবরণ অপগত হওয়ায় যে প্রেম স্নেহসারে পরিণত হয়। সজ্জনের এইরূপ নিরুপাধি প্রেম প্রকৃতই দুর্লভ. প্রেমের কি জানি কেমন এক উদ্ভ্রান্তভাবে বিমুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্র যখন জানকীর অঙ্গস্পর্শে অব্যক্ত মধুমধুর রসে নিমজ্জিত হইলেন তখন প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—"বিনিশ্চেতুংশক্যো ন সুখমিতি দুঃখমিতিবা

প্রবোধো নিদ্রা বা কিমুবিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ। তবস্পৃষ্টে স্পর্শে মমহিপরিমূঢ়ে—
[ন্দ্রিয়গণো বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সম্মীলয়তিচ।"—হে দেবি! আমি কি সুখে আছি না দুখে আছি, এটি আমার নিদ্রাবস্থা, না জাগ্রদবস্থা, আমার দেহমধ্যে কি বিষ সঞ্চারিত হইতেছে না সম্মোহানন্দে বিভোর হইতেছি? আমিত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার যে অঙ্গস্পর্শ করিতেছি তাহাতেই আমার ইন্দ্রিয়গণ বিমুগ্ধ হইয়া সেই অঙ্গে লীন হইয়া যাইতেছে, এবং চিত্তবিকারে মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কখনও একটু জ্ঞান হইতেছে আবার কখনও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। প্রেমের একটি অলৌকিক ভাব ভবভূতির এই প্রসন্ন গম্ভীর পদ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রেমের অন্যান্যাবস্থায় যে একটু ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় এই প্রেমের প্রবল আকর্ষণে তাহা অপসারিত হইয়া সমধিক নৈকট্য সংস্থাপিত হয়। ইহাপেক্ষাও ব্রজদেবীগণের ভাব আরও গাঢ়তর কারণ এই প্রেম স্বকীয়, ব্রজদেবীগণের প্রেম পরকীয়। স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় প্রেমের আকর্ষণ আরও প্রবলতর। অতএব আকর্ষণ আধিক্যই যদি গাঢ়ত্ব ও নৈকট্যের হেতু হয় তাহা হইলে কান্তভাবে ভগবদ্ভজনই শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং কান্তভাবে ভজনা করিতে হইলে পুরুষাভিমান লইয়া হইতে পারে না, কাজেই নারীভাবে বিভাবিত হইয়া ভাবনাত্মকনারীদেহ লাভ করিয়াই ভজনা করিতে হয়, এই জন্যই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী দেহলাভই বৈষ্ণবসাধক দেহের চরমপরিণতি। ইহা কেবল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নহে পাশ্চাত্যবিদুষী সুইনী একটি দার্শনিক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন;—
The ultimatedestuy of men is to becomeawoman.—অর্থাৎ ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে নারীরূপলাভই মানুষের চরমপরিণতি। পাশ্চাত্য অবতার যীশুর শ্রীমুখের বাণী এই যে;—When that which is perfect is come then that which is imperfect shall bedone away and the two shallbe one the male as the female.—ভাবার্থ এই যে পূর্ণতার আবির্ভাবে মানুষ নারীরূপে প্রকটিত হইবে। অতএব নারীরূপ প্রাপ্তিই যে পূর্ণতার লক্ষণ ইহা কেবলমাত্র নিশ্চেষ্ট অলস কল্পনাপ্রিয় বঙ্গীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণের সর্ব্বনাশকর অপসিদ্ধান্ত নহে। বর্দ্ধমান সতেজ স্বাধীন বিজ্ঞানবিৎ কর্ম্মক্ষম পাশ্চাত্য ধর্ম্মাচার্য্যগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। জগতের সকলেই যদি সেই সুদুর্লভ ব্রজদেবীর ভাবে

নিত্যানন্দ চন্দ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনলীলাতে সমর্থ হন তাহা হইলে আর পুরুষের প্রয়োজনই বা কি? তাহা হইলে যে সেই পুরুষোত্তমই মেয়েদের কাছে বিক্রীত হইয়া পড়িলেন। জগতে পুরুষভাব আছে বলিয়াই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষভাবের প্রয়োজন হয় সেও পালন আদরের জন্য, আর যদি একেবারে পুরুষভাব নাই থাকে তবে স্বকীয় ভাবাবলম্বী দাসীভাব কাহারও উপলব্ধ হয় না সুতরাং তাহার নিরুক্ত সম্পন্ন পুরুষেরও প্রয়োজন নাই, আর এই কল্পনা যদি কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে যে এই কল্পনাটি গোলোকে পরিণত হইবে, তাহা অপেক্ষা আর উন্নতির কল্পনা কি হইতে পারে? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন:—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"—সহস্রমধ্যে একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে, এবং যত্নপরায়ণ সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারে, জানা অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র, তাহা হইলে ১০০০ × ১০০০ = ১০০০০০০ সুতরাং দশ লক্ষে একজন ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর প্রেমের সাধনার অধিকার লাভ জন্মিবে সেই প্রেমের সাধনার চরম মধুর ভাব, এবং মধুর ভাবের সাধনার চরম ফল শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী দেহলাভ! সুতরাং উহা কোটি কোটি জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ব্যতীত লাভ হয় না। সুতরাং ভারত উদ্ধারকারী বীরকুলের অভাব কখনই হইবে না পদ্মানদীতে একরূপ জাল ফেলে উহার নাম বেড় বা জগৎবেড়জাল। ঐ জাল অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ছিদ্র বৃহৎ সুতরাং ঐ জালে ক্ষুদ্র মৎস্য ধরা যায় না জালরন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া যায় বৃহদায়তনের রোহিত দিই আবদ্ধ হয়। চুনাপুটি যাহা থাকে তাহা জালরন্ধ্র দিয়া পালাইয়া যায়। রুই কাৎলার সংখ্যা অতি অল্পই থাকে, কিন্তু নদীর কোন স্থানে রুই আছে, কোন্ স্থানে কাৎলা আছে তাহা বাছিয়া জাল ফেলা অসম্ভব, তাই জালিক জানিয়া শুনিয়াও জগৎবেড় জাল দিয়া সমগ্র নদী ঘিরিয়া ফেলে, রুই কাৎলা যত থাকে বাধিয়া যায় চুনাপুটি জালরন্ধ্র দিয়া পালায়। সেইরূপ বিশ্বগুরু বৈষ্ণবগণও জগৎবেড় জাল ফেলিয়াছেন, ইহাতেও রুই কাৎলা স্থানীয় উন্নত অধিকারীই উন্নীত হইবে বাকী নিয়া চুনাপুটি বাহির হইয়া বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ভারত উদ্ধার করিবে ইহা নিশ্চয়, সুতরাং ভারত উদ্ধারকারীর দুর্ভাবনা করিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তবে যে ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহারা কেবল

"আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহ রস সুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ। কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনু মন, তভু তেঁহ মোর প্রাণনাথ॥" সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণবিনা অন্য নয়॥" ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন, মোরসৌভাগ্যপ্রকটকরিয়াতাসভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ কিবা তেঁহ লম্পট, শঠধৃষ্ট সকপট, অন্য নারীগণ করি সাথ। মোর দিতে মনঃ পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, কভু তেঁহ মোর প্রাণনাথ॥ না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য, মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী। মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি, ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী॥ কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখপায় তাড়ন ভর্ৎসনে। যথা যোগ্য ক'রে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥ সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। নিজ সুখ মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥ যে গোপী মোর করে দ্বেষ, কৃষ্ণে করে সন্তোষ, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ, দাসী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস॥ কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, পতিলাগি কৈল বেশ্যার সেবা। স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি, জীয়াইলে মৃতপতি, তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা॥ কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ। হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ, এই মোর সদা রহে ধ্যান॥ মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেহ দান। কৃষ্ণ মোর কান্তাকরি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমানী"—ইহাই মহাপ্রভু প্রচারিত প্রকৃত নারী ভাব এবং ইহাই বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ;—

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোকের কথা। বঙ্গীয় বৈশ্যবারুজীবিসভার স্থায়ি সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম এ বি এল্ বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ২৭শে অগ্রহায়ণ স্বজনগণকে শোকসাগরে নিঃক্ষেপ করিয়া অকালে অমরধামে যাত্রা করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ এবার বি, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ শিষ্ট শান্ত সরল সদাশয় ছিল। নিয়মিত বিধান অতিক্রম করিতে মানুষ চিরদিনই অসমর্থ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু—"এই সান্ত্বনা বাক্যই শোক ক্ষতের শীত প্রলেপ।

নির্ব্বাচনে যোগ্যতার সমাদর। প্রেসিডেন্সি বিভাগের নির্ব্বাচকমণ্ডলী রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া গুণজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যশোহরবাসী যদু-নাথের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। প্রেসিডেন্সি বিভাগের নির্ব্বাচকগণ কিন্তু যশোহরের যদুনাথকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। "গুণী গুণং বেত্তি।"

রাজসম্মান। সম্প্রতি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে সম্মানকর সি, আই, ই উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার প্রচুর পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যদুনাথ যশোহরের প্রথম সি, আই, ই। যদুনাথের এই সম্মানলাভে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানের দেশীয় সুধীমণ্ডলী ও রাজপুরুষগণ আনন্দপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সম্মান যদুনাথের ব্যক্তিগত নহে, যশোহরের। যখন যদুনাথ "রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন, সে সময় খ্যাতনামা সিবিলিয়ান্ জজ্ কেমিয়েড্ সাহেব যদুনাথকে লিখিয়াছিলেন, আপনি অচিরে নিশ্চয়ই সি, আই ই, উপাধিলাভ করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। দূরদর্শী সাহেবের বাক্য এতদিনে সত্য হইল। কতদিনে মনস্বী রায় কালীপ্রসন্ন

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৭ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড | ফাল্গুন। | ১৩২৭ সাল।
১১শ সংখ্যা। | | ১৮৪২ শকাব্দ।

খাদ্যপানীয় বিতর্ক।

কিছুদিন হইতে এদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি জাতির অন্ন, কাহারও বা জল চল করিবার আয়োজন বেশ প্রসারলাভ করিতেছে। শূদ্রান্ন-ভোজনের নজীর পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলে খান না। নবশাখ প্রভৃতি জাতির লোকেরা বহুদিন হইতে জলাচরণীয় নহেন। সুবর্ণবণিক প্রভৃতি দুই একটী জাতির জল, নানাকারণসত্ত্বেও অদ্যাপি চলে না। ইহার হেতু যাহাই হউক না কেন, ইঁহাদের জল চালাইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষার জন্য বিশেষভাবে ব্যগ্র, তাঁহাদিগের প্রতি এই প্রবন্ধে দুই চারিটী কথা বলা হইবে।

এক সম্প্রদায় বলেন, "শূদ্র যদি পরিষ্কৃতভাবে অন্ন প্রস্তুত করে, আর ঐ অন্নে যদি রোগবীজাণু বা অপর অনিষ্টকর দ্রব্য না থাকে, তবে ঐ অন্ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের হানি হইবে কেন? যদি বুঝি যে শূদ্র অন্ন পাক করিলে, ঐ অন্ন রোগের নিদান হয়, ঐ অন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা হইলে উহা ত্যাগ করা উচিত, 'অন্যথা কেবল শূদ্রকর্ত্তৃক পক্ব' এই কারণে উৎকৃষ্ট সুখাদ্য বলকর অন্ন না খাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।"

যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে চাহেন, এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত খাদ্যাখাদ্য-বিচারবিধি "গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপোক্তি" বা ঐরূপ একটা কিছু মনে করেন। তাঁহাদের প্রতি এ প্রসঙ্গে আমাদের বর্ণমাত্রও বক্তব্য নাই। কিন্তু, যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলিতে চাহেন, মুখে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা করিতে চাহেন, অথচ সুবিধামত শাস্ত্রের বচন দেখাইয়া, অস্পৃশ্যজাতি পর্য্যন্তের জলপান ও অন্নগ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিতে যাত্রা হন, তাঁহাদিগের প্রমাণগুলির মূল্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে কি? কপটাচার কখনই কোনও ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নহে।

আমরা দেখিব, তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি যথার্থই তাঁহাদের অভিসন্ধির অনুকূল কিনা! প্রথম আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার মহর্ষি যম বলিয়াছেন যে "ভুক্তং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি, যো যস্যান্নমিহাশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্।" পাপ, পাপীর অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে, সেজন্য যে যাহার অন্নভোজন করে, সে তাহার পাপই গ্রহণ করে। একথা শুনিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ লেখককে "মূর্খ" বলিবেন এবং মহর্ষি যমকেও বেশ কিছু কটুবাক্য উপহার দিবেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান হইতে দূরে যাইতে অসম্মত হইবেন না। নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করাই জ্ঞানার্জ্জনের প্রথম সোপান। অভাব-বোধ না হইলে অর্জ্জনের সুযোগ হয় না। এক আসনে উপবেশন, শয়ন, পরস্পর বাক্যালাপ, একসঙ্গে ভ্রমণ ইত্যাদি দ্বারা যেমন পরস্পরের মধ্যে অজ্ঞাতসারে ভাবের আদানপ্রদান হয়, ভাবসংক্রমণ ও রোগসংক্রমণ হয়, শাস্ত্রকারগণ বলেন, পক্কান্ন-গ্রহণ, স্পৃষ্টজলপান, বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা তদপেক্ষা তীব্রভাবে ঐরূপ সংক্রমণ উপস্থিত হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব পিপাসাসত্ত্বেও একদিন একজন কর্ত্তৃক আনীত জল দেখিয়াই পান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং পরে সকলে অবগত হন যে, ঐ জল দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদ্বারা আনীত। এই পার্থক্য, যাঁহাদের জীবন পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝেন, তাঁহাদেরই এ অনিষ্টের চিন্তা উঠে। জ্বরগ্রস্ত রোগীর দেহের উত্তাপ যখন ১০০ হয়, তখন সে ঐ পরিমাণ জ্বর অনুভব করিতে পারে না—বলে "আজ আর জ্বর হয় নাই," আমাদের দশা ঐরূপই, কাজেই আমরা বুঝিতে পারি না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নিন্দিত অন্নভক্ষণে লোকের মনের যে পরিবর্ত্তনের গল্প করিতেন

"সদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ" পাঠক অবগত আছেন। "যম হারীত বর্ব্বর ছিলেন," বলিতে অনেকে সাহসী, কিন্তু রামকৃষ্ণ বা বিজয়কৃষ্ণকে ঐরূপ উপাধি দিতে অনেকের সাহস হইবেনা বলিয়া এই কথাটা বলা গেল। মনুষ্যদেহের সহিত কোনও দ্রব্যের স্পর্শ হইলে ঐ উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ঘটে। সেই সম্বন্ধের ফলে, অন্য যে কেহ ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিবে—তাহার ভাবান্তর সংঘটিত হওয়া একেবারে অযৌক্তিক নহে। তবে যাঁহারা রোগবীজের অতিরিক্ত অপর কোনও বীজাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারা শ্বেতগুরুর নিকট হইতে অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে, "গৃহে প্রাঙ্গনে আকাশে বাতাসে ভাবনীজাণু বিচরণ করে ও সুবিধামত লোককে আক্রমণ ও আয়ত্ত করে, ফলে নূতন বাড়ী ভাড়া করিবার পর হইতে ভাল মানুষের মনে হঠাৎ মন্দ খেয়াল চাপিয়া উঠে, শেষে অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐ ভাবের লোক ঐ বাড়ীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিল"—এই সত্য কথাটা বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন না। মোটের উপর ভারতের ঋষি উহার মধ্যে বিশেষ সংসর্গপ্রভাব অনুভব করিয়াই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহা ধ্রুব। তবে দ্রব্যের প্রকৃতি বা অবস্থানুসারে গুণাগুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেজন্য সর্ব্বাবস্থায় সকল দ্রব্য সকলের পক্ষে সমান উপকারক বা অপকারক হয় না। একথা মনে রাখিলে, শাস্ত্রকারগণের খাদ্যাখাদ্যবিচারের মর্ম্ম বুঝিবার সুবিধা হয়।

মূলকথা এই যে, শাস্ত্রশাসন যাঁহারা মানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। বুদ্ধিমানেরা শাস্ত্রের অসদর্থ প্রচার করিয়া, সমাজের শ্রদ্ধাশীলজনগণের সর্ব্বনাশ সাধন করেন না। প্রথমতঃ ধরা যাউক, শূদ্রান্নভক্ষণ, শাস্ত্র বলেন—শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণচ সহাসনং, শূদ্রাৎ বিদ্যাগমশ্চৈব জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ। শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন ও পতনের কারণ হয়। মহর্ষিশঙ্খ শূদ্রান্নভোজনে ব্রাহ্মণের একমাস যাবকব্রত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। যাহাতে শাস্ত্রকার প্রায়শ্চিত্তের আদেশ দিলেন, তাহা যে শাস্ত্রমতে পাপ, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শূদ্রান্নভোজন ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য—ইহা প্রতিপন্ন হয়।

এখন সংস্কারবাদিগণের শাস্ত্রবচনগুলির আলোচনা করা যাউক। পরাশর বলেন—আপৎকালেতু বিপ্রেণভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি, মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতংজপেৎ। অর্থাৎ আপৎকালে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রগৃহে ভোজন

করেন, তবে মনস্তাপে বা শতবার গায়ত্রীজপে তাঁহার পাপমোচন হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, শূদ্রান্নভোজন কথঞ্চিৎ দোষাবহ বটে, কিন্তু মনস্তাপ বা গায়ত্রীজপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে যখন উহা এড়ান যায়, তখন বৈশাখের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণনন্দন যদি শূদ্রান্নভোজন করিয়া ফেলে, তাহাতে তাহার একমাস যাবকব্রতের ভয় নাই,—এমতে অনেকে আস্থাবান্।

এই বচনে "ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি" কথাটার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। শূদ্রের বাড়ীতে খাইলে—একথায় কি বুঝিতে হইবে যে "শূদ্রের রান্না ভাত খাইলে?" একথার সেরূপ অর্থ হইবেই, অন্যরূপ হইবে না, ইহা কে বলিল? শূদ্রগৃহে কেহ চাল ডাল লইয়া পাক করিয়া খাইবে না? এখানে ঐরূপ সংসর্গে স্বল্প পাপ ও স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত মনে করিতে বাধা নাই। প্রমাণ-স্বরূপ আলোচনা করুন মনুবচন,—নাদ্যাৎ শূদ্রস্য পক্বান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ। আদদীতামমেবাস্মাৎ অবৃত্তাবেকরাত্রিকম্॥ বিদ্বান ব্রাহ্মণ কখনও নিন্দিত-শ্রাদ্ধভোজী শূদ্রের পক্বান্ন গ্রহণ করিবেন না। জীবিকার অসংস্থা হইলে এক সাঁঝের যোগ্য আমান্ন বা চাউল গ্রহণ করিতে পারেন।' বহুবার গ্রহণ করিলে যে পাপ হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বোক্ত মনস্তাপ ও গায়ত্রীজপ। ইহা কি অসঙ্গত? কোনও কোনও গ্রন্থকারের মতে আপৎ-কালে শূদ্রের রান্নাভাত খাইলেও মনস্তাপ ও গায়ত্রীজপ প্রায়শ্চিত্ত। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, যখন আহার্য্যাভাবে জীবননাশের আশঙ্কা হয়, তখন প্রাণরক্ষার উপযোগী অন্ন-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কেহ যদি ঐরূপ সময়ে প্রাণরক্ষার্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্নভোজন করেন, তবে তাঁহার ঐ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত। শূদ্রান্ন না জানিয়া ভোজন করিলে মনস্তাপ প্রায়শ্চিত্ত। আর জানিয়া ভোজন করিলে গায়ত্রীজপ বা দ্রুপদাখ্যক জপ প্রায়শ্চিত্ত, এখানে দুপুরবেলা আপৎকাল নয়। যখন আহার্য্যা অভাবে প্রাণাত্যয়-সম্ভাবনা হয়, সেকালের নাম আপৎকাল। ব্রহ্মসূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ"—জীবনাত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে, সেস্থলে শূদ্রান্ন কেন, অন্ত্যজঅন্নেরও ভক্ষণে অনুমতি হইতে পারে। উপনিষদে উষস্তিচাক্রায়ণের উপাখ্যান আছে, তাহাতে কথিত আছে, ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় অন্নাভাবে মুমূর্ষু ঋষি হাতী ও মাহুতের উচ্ছিষ্ট কলায়সিদ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু মাহুত তাঁহাকে জলপান করিতে বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"তাহি জলপান

করিব না। এই খাদ্য না খাইলে আমার জীবন যাইত। এখন আমার আর জীবননাশের ভয় নাই, সুতরাং এই জলপান করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে।” জীবনরক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা করা যায়, অতিরিক্ত করিলে পাপ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সেই উপনিষদের যুগে যখন ঋষি, মাহুতের প্রসাদ পাইয়াও তাহার জলপান করিলে পাপ হয় মনে করিতেন, তখন যাঁহারা, “এসব প্রাচীনকালে ছিল না” বলেন তাঁহাদের শাস্ত্রচর্চ্চার বা সত্যপরতার প্রশংসা করিতে পারি না।

ইহার পর আর এক বড় কথা: দাস, গোপাল, নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী প্রভৃতি শূদ্রদের অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে পারেন। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে—(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে) শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ, ভোজ্যান্নাঃ নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। যমসংহিতায় আছে—দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ, এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাঃ যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। ব্যাস বলেন—নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ। শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈবদুষ্যতি। পরাশর বলেন, দাসনাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাঃ যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। এইত সংহিতাকারগণের কথা। পুরাণ উপপুরাণেও এইভাবের অনেক শ্লোক আছে। সুতরাং নাপিত, গোয়ালা, বর্গাদার, (নমঃশূদ্র বা মুসলমান যে কেহ হউক) তাহার ভাত খাওয়া শাস্ত্রসম্মত। এই একদলের কথা। ইঁহাদের মতের প্রতিবাদে আধুনিক পণ্ডিতেরা পরাশরসংহিতাভাষ্যকারমাধবাচার্য্য কর্তৃক উদ্ধৃত আদিপুরাণ-নামক গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আদিপুরাণে আছে—দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।

শূদ্রেষু দাসগোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং, ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দীর্ঘকাল সজল কমণ্ডলুধারণ, দেবর কর্তৃক পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দ্বিজগণের অসবর্ণকন্যা বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্যবিধ পুত্রস্বীকার, দাস, গোপাল, নাপিত ইত্যাদির অন্নভোজন, দূরতীর্থযাত্রা—এই সকল কার্য্য কলির আদিতে লোকহিতার্থে বুধগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন—কেবল মাত্র

এতটুকু নহে, বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই সমস্ত কার্য্য উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—কলিযুগেত্বিমান্ ধর্ম্মান্ বর্জ্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ—অর্থাৎ কলিযুগে এই সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাজ্য। যখন শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, কলিযুগে ঐ সমস্ত আচার অবৈধ এবং তাহার প্রচলনও নাই, তখন আর ঐ পুরাতন প্রথা খাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা কেন? পণ্ডিতেরা লোকহিতার্থে ঐগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন—একথা শাস্ত্রে পাই, সমাজেও দেখি। অতএব "কোনওকালে ছিল" বলিয়া এখন চলিতে পারে না।

পণ্ডিতবর্গের এই কথার উত্তরে সংস্কারবাদিগণ বলেন "ঐ বচন বিশ্বাসযোগ্য নহে।' কারণ কলির প্রথমে কলিধর্ম্মবক্তা পরাশরের মত উলটাইয়া পণ্ডিতেরা নূতন মত প্রচার করিতে পারেন না। অনেক দিন পরে হয়ত প্রথার দোষ দেখিয়া বদলাইতে পারেন, কিন্তু কলির প্রথমেই কলিশাস্ত্রকার পরাশরের উপর দণ্ডাঘাত; এ কিরূপ পাণ্ডিত্য! আর এক কথা, পণ্ডিতদের ঋষি পরাশরের মত উলটাইবার অধিকার নাই। ঋষিরাই শাস্ত্রকার, পণ্ডিতেরা নহে। আর তৃতীয়তঃ আদিপুরাণ উপপুরাণ; যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতির স্মৃতির বিধানের সহিত ইহার বিরোধ হইলে আদিপুরাণ অগ্রাহ্য। স্মৃতিতে বলে "নাপিতের ভাত খাওয়া উচিত" আর উপপুরাণ যদি বলে, "খাওয়া উচিত নহে," তবে সে উপপুরাণ অপ্রমাণ, কারণ শাস্ত্রের বলাবল-নির্ণয়ের মূলসূত্রে আছে—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে, তত্রশ্রৌতং প্রমাণংস্যাৎ দ্বয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা। বেদ স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ হইলে বেদই গ্রাহ্য। স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ হইলে স্মৃতিই গ্রাহ্য, পুরাণ অগ্রাহ্য। অতএব আদিপুরাণের বচন পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হওয়া ঠিক নহে।"

সংস্কারবাদিগণের এই উক্তির উত্তরে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যাহা বলেন বলুন, আমরা কিন্তু বুঝি, উহাতে পরাশরের মত উলটান হয় নাই। পরাশর নিজে নাপিতের ভাত খাইতে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেন নাই। পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার্থ এই সকল আচারের পরিবর্ত্তন করিবেন—এ আদেশ শাস্ত্রেই আছে, তাঁহারা সেজন্য অপরাধী কিসে? স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ কোথায়? স্মৃতি বলেন "গোপের অন্ন ভোজন করা যায়" পুরাণ বলেন "হাঁ ঠিক, তবে কলিকালে নহে।" এই বিষয়ব্যবস্থা কি বিরোধ? কলি

ভিন্ন অন্যযুগে নাপিতাদির অন্ন-ভোজনের বিধান, কলিতে ঐরূপ অন্ন-ভোজনের নিষেধ, ইহাইত সামঞ্জস্য। তুল্য-বিষয়ক বিধি-নিষেধে বিরোধ হয়। ভিন্নবিষয়ক বিধিনিষেধে বিরোধ হয় কিরূপে? এ কথার উত্তর সংস্কারকেরা দেন না। তাঁহারা পুস্তক ছাপাইয়া পাণ্ডিত্যপ্রচার করেন, কিন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের যথার্থ প্রথা অবগত নহেন।

এখন আমরা দেখাইব, পণ্ডিত মহাশয়গণ যাহা বলুন, আদিপুরাণের বচন প্রমাণ বা অপ্রমাণ যাহা হয় হউক, প্রক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত যাহা হয় হউক, আসল কথা এই যে, গোপ, নাপিত, প্রভৃতির রান্না ভাত কোনওকালে বিপ্রেরা ভোজন করিতেন না। মনু যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর বেদব্যাস কেহই সে কথা বলেন নাই। গ্রন্থের অভাবে কেবল উদ্ধৃত বচন অবলম্বন করিয়া যাঁহারা গ্রন্থরচনা বা বিচার করেন, সমগ্রগ্রন্থ হাতে পান না, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ত্রুটীর অবশ্যম্ভাবিতা আছে,-একথা স্বীকার করায় হানি নাই। অনেক যথার্থ পণ্ডিত একথা বেশ বুঝেন এবং স্বীকার করেন, কিন্তু অনেক অল্পদর্শী রঘুনন্দনের "তত্ত্ব" মাত্র দর্শন করিয়া প্রকৃত তত্ত্বের অবতারণায় আপত্তি করেন,—ইহা সহস্রাধিকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মানুষ ভ্রমের দাস, সাময়িক অসুবিধায় বদ্ধহস্ত,—একথা ভুলিলে চলিবে না। নাপিত, গোপ, দাস ইত্যাদি কথার অর্থ কি, তাহা কেহ চিন্তা করিয়াছেন কি? যদি বলেন—এই সব প্রসিদ্ধ কথার অর্থ কি, তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কেন, সকলেই জানেন। তাহা ঠিক নয়। আমরা জানি, শাস্ত্রীয় শব্দগুলি শাস্ত্র কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। শাস্ত্রকারগণ—"পরিভাষাবলাদ্ রূঢ়িবাধঃ সর্বত্র সম্মতঃ।" বলিয়াছেন। শাস্ত্রে যে শব্দের যে অর্থ বলা হইয়াছে, সেই অর্থই শাস্ত্রীয় ব্যাপারে প্রধানভাবে গ্রাহ্য। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ উহা হইতে দুর্বল। শাস্ত্রে সপিণ্ড, সমানোদক, পিতৃবন্ধু প্রভৃতি কথার যে অর্থ বলা হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া লোকপ্রচলিত রীতিতে অর্থ বুঝিলে শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝা যাইবে না। পরাশরসংহিতায় স্বয়ং কলিধর্ম্মবক্তা মহর্ষি পরাশর দাস, গোপাল প্রভৃতি শব্দের যে অর্থ বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

শূদ্র কন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কারাদ্ধি ভবেদ্গোপঃ অসংস্কৈরেস্তুনাপিতঃ।

ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ

স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ।

বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন চ সংস্কৃতঃ।

আর্দ্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ। ইত্যাদি

[illegible] শূদ্রকন্যায় ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান যদি যথাবিধি সংস্কার প্রাপ্ত হয়, তবে সে 'দাস' নাম পাইবে, অসংস্কৃত হইলে তাহার নাম হইবে 'নাপিত।' ক্ষত্রিয় কর্তৃক শূদ্রকন্যার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানের নাম 'গোপাল'। ব্রাহ্মণসংস্কৃত বৈশ্যকন্যায় উৎপন্ন সন্তানের নাম আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী। ইহাদের অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে পারেন। এই সন্তান গুলির মধ্যে 'আর্দ্ধিকের' মাতা বৈশ্যকন্যা। আর সকলেরই মাতা শূদ্রকন্যা। ইহারা শূদ্রতুল্য বলিয়া 'শূদ্র' নামে অভিহিত হয়। বৈশ্যকন্যার 'আর্দ্ধিক' পুত্রটী যে বিহিতবিবাহোৎপন্ন তাহা বোধ হয় না, সুতরাং তাহারও শূদ্রতুল্যত্ব স্থির। এই সকল শূদ্র-নামে পরিচিত দ্বিজাতিসন্তানেরা মাতৃবর্ণের হীনতা বশতঃ ও অন্য দোষে ব্রাহ্মণ-কুলের নিকট ভোজ্যান্ন বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন না—এই আশঙ্কায় মন্বাদি-সংহিতাকার মহর্ষিগণ ইহাদের অন্নভোজন সত্যাদিযুগে প্রচলিত থাকার কথা মনে করিয়া বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই মনে করেন নাই যে, ঐ কথা গুলির অর্থ বুঝিতে আমাদের প্রাণান্ত হইবে। কলিধর্ম্মবক্তা পরাশর বুঝিলেন,—কলির পণ্ডিতের বিদ্যার বহর কত, কাজেই তিনি কথা গুলির অর্থ বলিয়া দিলেন। কেহ প্রচলিত অর্থে কথাগুলি বুঝিয়া শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিতে পারে, এই ধারণা পরাশরের মনেই বেশ জাগিয়াছিল। পরাশর কলির সংস্কারকদের এই আপত্তি ভাবিতে পারিয়াছিলেন, সে জন্যই তিনি নিজ সংহিতায় এই শ্রেণীর লোকের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের সুবিধা হয়, পরাশরের লঘু সংহিতাখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, এই সকল বচন লিখিয়া তিনি মন্বাদি ঋষির এবং নিজের কথার মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। নিজে নিজের বিরোধিকথা বলিয়াছেন, এরূপ ভ্রম কোনও বিবেচক লোকের হইতে পারে না। সুতরাং, জোর করিয়া লিখিলেও সেকথা বাদ দিলাম। এখন কি কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ সকল শব্দের অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার কোনও কারণ আছে? পুস্তক না পাওয়ায় অনেক পণ্ডিত অনেক বিষয়ে হাতগড়া ব্যাখ্যা রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা আমরা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া নির্ব্বিচারে সে সব কথা মানিয়া লওয়া উচিত কিনা, বিবেচকগণই স্থির করুন।

আমরা শাস্ত্রে কোথাও দেখি না যে শূদ্রান্নভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত——

শ্রী——

মধুর-ভজন ও জাতীয় উন্নতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণ, আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়॥"—এবং, প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এইকার্য্য যার॥ মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥ রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। তাতে অতিসুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥ কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃতধারায় স্নানমধ্যম॥ লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান। নিজলজ্জা শ্যামপট্টশাটী পরিধান॥ কৃষ্ণ অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন। প্রণয় মানকঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥ সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন। স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গবিলেপন॥ কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর। সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ প্রচ্ছন্নমানবাম্যধম্মিল্ল বিন্যাস। ধীরাধীরাত্মকগুণ অঙ্গে পটবাস॥ রাগতাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল। প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগল কজ্জল॥ সুদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাবভূষণ সব অঙ্গে ভারি॥ কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গপূরিত॥ সৌভাগ্য তিলকচারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেম বৈচিত্ত্যরত্ন হৃদয়ে তরল॥ মধ্যবয়ঃস্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥ নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক। তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥ কৃষ্ণনাম গুণযশ অবতংস কাণে। কৃষ্ণনাম গুণযশ প্রবাহ বচনে॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যামরসমধু পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম

রত্নের আকর। অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥"—ইহাই মহাপ্রভুর অনু-মোদিত নারীভাব, ইহাই মহাপ্রভুর অনুমোদিত নারীকান্তি এবং বৈষ্ণব সাধকগণের চির আকাঙ্ক্ষিত। যদি জীব কোটিজন্মার্জ্জিতসুকৃতিফলে এইরূপ চিন্ময় নারীদেহ লাভ করিতে পারে তাহা হইলে আমিও বলিতে পারি এ ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জগতের চরমউন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে কান্তভাবে ভগবদ্ভজন করিতে হয়, উহা মধুর রসের ভজনা, এই রসের বিষয়ালম্বন ;—কোটিমদন বিমোহনঅশেষচিত্তাকর্ষক সহজমধুরতরললাবণ্যামৃতপারাবার, মহানুভাবগণের অনুভূয়মান শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান শ্রীশ্রীমদনগোপাল।" ইহার ;— "অধরং মধুরং বদনং মধুরং হসিতং মধুরং চলিতং মধুরং হৃদয়ং মধুরং বচনং মধুরং মথুরাধিপতে রখিলং মধুরং"—আদিরসেরই নামান্তর মধুর রস, এই আদিরসের সহিত, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ও ভয়ানক রসের বিরোধিতা আছে, যথা সাহিত্যদর্পণে ;—"আদ্যঃ করুণবীভৎসরৌদ্রবীর ভয়ানকৈঃ............বিরোধভাক্"—যুদ্ধবিগ্রহ অস্ত্রশস্ত্র এ সমুদয় রৌদ্ররসেরই উদ্দীপনা বিভাব সুতরাং ওগুলিও মধুর রসের বিরোধী, এবং অলৌ-কিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্নশঙ্খচক্রগদাপদ্মাদিধারী দেবনারায়ণমূর্ত্তিশান্তরসের উদ্দীপনা করিয়া দেয় ঐ শান্তরসের সহিতও আদিরসের বিরোধিতা আছে যথা সাহিত্যদর্পণে ;—"শান্তস্তবীরশৃঙ্গাররৌদ্রহাস্য ভয়াণকৈঃ"—তাই শান্তরসাম্পদ [illegible] নবদূর্ব্বাদল শ্যামমূর্ত্তি মানসপটে কল্পনা করিয়াই রাবণ হেন কামাতুর নিশাচরও বলিয়াছিল............তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ?" সীতা হরণকালে রাক্ষস মায়ায় রামচন্দ্রের মূর্ত্তিধারণ করিয়া সীতা হরণ করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে রাবণ বলিয়াছিলেন যে, সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যামলরামমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় তখন নিজে সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে কি আর পরদার হরণের প্রবৃত্তি হইতে পারে? তাই গোস্বামিপাদগণ তাঁহাদের বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদনকে অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত অসুর সংহারে নিরত অলৌকিক ঐশ্বর্য্যশালিরূপে দেখিতে ভাল বাসিতেন না তাই ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু ও ভক্তের বাসনানুরূপ শ্রীমূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতেন,—তদুক্তং শ্রীভগবতোহেবং স্বরূপং ভূরিবিদ্যতে, উপাসনানুসারেণ ভাতি তদুপাসকে, শ্রীভগবানে উপাসনাযোগ্য বহু বহু নিত্যমূর্ত্তি সমূহ বিদ্যমান আছে উপা-

সনানুসারে তাহা তত্তদুপাসককে প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ যিনি যে মূর্তির যে ভাবের উপাসক তাহার নিকট সেই মূর্ত্তির সেইভাবেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে তাই গীতায় ও শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন ;—"যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—অনেক সময় কীর্ত্তনাদির স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় কোনও দেহ আশ্রয় করিয়া নানা দেবদেবী ও মহাপুরুষগণ কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিয়া থাকেন, আশ্রিত দেবগণ সূক্ষ্মরূপে আশ্রয়-দেহে প্রবিষ্ট হন তাহাতে স্থূলদেহের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না কেবল ভাবভঙ্গী ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আশ্রিত দেবগণের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যেমন কীর্ত্তন করিতে করিতে একজন ভগবদাবেশে চরণে চরণ রাখিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইলেন, ভক্তগণ কৃষ্ণাবির্ভাব জানিয়া গলায় পুষ্পমাল্যাদি অর্পণ করিলেন। পরক্ষণেই জিহ্বা বাহির করিয়া করালরূপে হস্তোত্তোলন করিয়া উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে লাগিলেন ভক্তগণ কালীর আবির্ভাব জানিয়া জয় জগদম্বা বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। এইরূপ বহু দেবদেবীর আবির্ভাব, তিরোভাব হইতে পারে। এই আবেশ হয়ত দেবদত্তের দেহকে আশ্রয় করিয়া হইতেছে, যখন দেবদত্তের দেহে কৃষ্ণ। বেশ তখন সকলেই তাহাকে কৃষ্ণ বলিতেছে পর যেই কালীর আবেশ হইল অমনি সকলেই বলিতেছে যে ইনি কৃষ্ণ নহেন কালী, এইরূপ আমরা যখন দেখিতেছি মধুর বৃন্দাবনে মধুরাদপি মধুর মদনমোহন অসুরনিধন করিতেছেন তখনই বলিতেছি ইনি নন্দনন্দন নহেন, তখনই বলিতেছি,—বিষ্ণুবারে কৃষ্ণকরে অসুর নিধন তখনই বলিতেছি—কৃষ্ণোঽন্যো বসুদেবসম্ভবঃ যস্তু গোপালনন্দনঃ বৃন্দাবনং পরিত্যাজ পদমেকং নগচ্ছতি"—আবার যখন দেখিতেছি ;—তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী স সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'—তখনই বলিতেছি ; কিবা এই সাক্ষাৎকামদ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান, কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমান। কিবা নেত্রমনোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ, সত্য এই নন্দের নন্দন॥"—তত্ত্বতঃ বসুদেব নন্দন ও নন্দ নন্দন এক হইলেও ভাবভেদে বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হওয়ায় গোস্বামীগণ নন্দনন্দন ও বসুদেব নন্দনকে ভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ উভয়েই যে এক ইহা গোস্বামিগণ জানিতেন ও মানিতেন। ভগ শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্য উহার উত্তরনিত্যযোগে মতুপপ্রত্যয় হইয়া ভগবৎ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে যদি কোনও ঐশ্বর্য্যই না থাকিত তবে তিনি ভগবৎ শব্দ বাচ্যই হইতে পারিতেন না। চৈতন্যচরিতামৃতে

কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যবর্ণন বলিয়া একটি পরিচ্ছেদই আছে। শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা আছে যথা;—"অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ" অবতারাবলীবীজং" "গুণাস্তস্যামৃতকীর্ত্তিঃ"—বসুদেবনন্দন ও নন্দ নন্দনকে যে গোস্বামিগণ এক বলিয়াই জানিতেন তাহার আর একটী প্রমাণ বলিতেছি। একদিন রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু;—যঃ কৌমারহরঃ সএবহিবরঃ সৈবাচ চৈত্রক্ষপা তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে এই পদ্যটী পাঠ করিতে করিতে প্রেমে মত্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন, ঐ শ্লোকটীর অর্থ এই;—'কোনও একটী নারী কুমারী অবস্থায় * কোনও পুরুষের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতস তরুকুঞ্জে গুপ্তবিহার করিতেন কালক্রমে ঘটনাচক্রে সেই পুরুষের সহিতই তাঁহার বিবাহ হয় তখন সুসজ্জিত বাসর গৃহে নিঃসঙ্কোচে অধিসহবাসের পর নায়িকা বলিতেছেন যে,—যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিলেন তিনিই বর হইয়াছেন আর এই সেই মধুমাসের মধুরজনী এই সেই প্রস্ফুটিত বসন্ত মালতীর সুগন্ধ, এই সেই প্রৌঢ় কদম্বানিল, এবং আমিও সেই, কিন্তু তথাপি সেই রেবা তীরবর্ত্তী বেতস তরুতলের জন্য আমার চিত্তনিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। রথাগ্রে মহাপ্রভুর এই শ্লোক পড়িবার হেতু কি কেহই বুঝিল না। এমন সময় রূপগোস্বামী তথায় উপস্থিত হইয়াই মহাপ্রভুর ঐ শ্লোক পড়িবার ভাব বুঝিতে পারিয়া উক্ত শ্লোকের অর্থানুগ একটী শ্লোক লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়া গেলেন পরে মহাপ্রভু উহা পাঠ করিয়া দেখিলেন যে যে ভাবের উল্লাসে তিনি উক্ত শ্লোক পাঠ করিতেছিলেন শ্রীরূপের পদ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেইভাব বিরচিত। প্রভু পুলকিত হইলেন। রূপের পদ্যটী এই;—প্রিয়ঃ সোঽয়ং

* সাহিত্য দর্পণের টীকাকার বলেন যে, যিনি বিবাহের দ্বারা আমার কুমারীত্ব হরণ করেন "যঃকৌমারহরঃ" তিনিই অভিমত স্বামী। অন্যান্য ব্যাখ্যা তুল্যই "উপপতিই কালে পতি হন" এইরূপ ব্যাখ্যায় তিনি দোষারোপ করিয়াছেন কিন্তু পদ্য লেখকের অভিপ্রায় আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপই লিখিলাম, পাঠকগণ যেরূপ অর্থই গ্রহণ করুণ তাহাতে আমার দৃষ্টান্তের হানি নাই।

কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ। তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমযুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।”—শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ললিতাকে বলিতেছেন,—“সহচরি! এই সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আমিও সেই রাধা এখানে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছি এই সেই উভয়ের সঙ্গম সুখ, কিন্তু মধুর মুরলীরব মুখরিত যমুনা তটবর্ত্তী কুঞ্জকাননের নিমিত্তই চিত্ত আকুল হইতেছে।”—এই শ্লোকের মধ্যস্থ “সোঽয়ং কৃষ্ণ” (এই সেই কৃষ্ণ) পদের দ্বারা যিনি বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতনবীনমদন তিনিই যে কুরুক্ষেত্র সমর সারথি ইহাই বুঝাইতেছে সুতরাং গোস্বামিগণ প্রকৃতপক্ষে নন্দনন্দন ও বসুদেব নন্দনকে ভিন্ন বলিয়া জানিতেন ইহা বলা যায় কি করিয়া? তথাপি নন্দনন্দনকে ভিন্ন বলিবার হেতু এই শ্লোকেই নিহিত আছে। মধুর রস বিভাবিত চিত্ত মধুররসাঞ্জনবিলেপিত ব্রজসুন্দরীগণের দৃষ্টি মধুর মুরলীরব কালিন্দী তটবর্ত্তী মঞ্জুকুঞ্জেই নিমজ্জিত থাকে উহা কখনও ভেরীতুরী নিনাদিত দুন্দুভি ঘোষ ঘোষিত নরাশ্বগজশোণিতপ্লাবিত শকুনীগৃধিনী সেবিত কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতে পারে না বাচা হেন।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

অচিন্ সাথী।

কে তুমি অচিন্ সাথী দিবসশর্ব্বরী
এমনি চালাও
নিরাশায় আশা দিয়ে বারে বারে হেগো
পরাণ মাতাও,
ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি
প্রাণে এসে হেসো দুলি

লুকোচুরি নিতু খেলি' কে তুমি অচিন্
এমনি ভুলাও।
কে তুমি নিরত এসে প্রভাত প্রদোষে
রঞ্জিত আকাশে
অপরূপ রূপধরি হরে নাও কেগো
অজ্ঞাতে মানসে,
কে তুমি জোছনা রাতে
চিত মোর তোল মেতে
আঁধার উজাড় করি' বিশ্ববিনোদন,
সুস্নিগ্ধবিহাসে।
কে তুমি অন্তর্যামী নিরন্ত বিরাজ
অন্তর আসনে
চিনিতে নারিনু তবু দিন যায় চলি'
সুতীব্রবেদনে,
কাছে থেকে বহুদূর—
পরাণ বিরহাতুর—
মরম বেদনা বুঝে, কিবা লাভ তব
নির্ম্মম ছলনে।
কে তুমি অচিন্‌সাথী আমারে লইয়া
করিতেছ খেলা
আমি ভাবি এক তুমি কর নিতি আর
একি ছলাকলা
আমি যবে যাহা করি
তুমি তাও হাতে ধরি
কি চাতুরী কর তুমি হে অচিন্ সাথী
খেলায় বিভোলা!
কে তুমি অচিন্ সাথী, চলিলে বিপথে
কভু ভুল করি'
পুনঃ পাছে ডেকে নাও বহুদূর হতে
বাঁশরী ফুকারি,

কভু ছুঁয়ে হিয়াখানি
বলহে সান্ত্বনাবাণী
ভাঙ্গিগড়ি নাও মোরে অজ্ঞাত মায়ায়
নিত্য নব করি,
যে কোন প্রভাতে সুরু হইল চলার
তোমারি নির্দ্দেশে
কবে বা হইবে শেষ কে জানে এচলা
তোমারি উদ্দেশে
ধরা দেওয়া ছলে থাক
ধরা তবে দিলে নাক
হে অচিন্ কতদিন রহিবে অচিন্
কৌতুক উল্লাসে!

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি

দানবীর ৺রাসবিহারী। *

শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ আমি আজ শ্রোতৃরূপে মহাত্মা রাসবিহারীর অলৌকিক জীবনকাহিনী শুনিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও তৃণাদপি নীচকে এই বৃহতী সভায় সর্ব্বপ্রথম বক্তারূপে দণ্ডায়মান হইতে হইল। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে এত আগ্রহ করায় এবং সভাপতি মহাশয় এতগুলি দেশপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারকে রাখিয়া আমাকে সর্ব্বাগ্রে বক্তৃতা করিতে আদেশ করিয়া আমার গৌরব শতগুণে বাড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু বলিব কি? আজ যে অবিরল ধারে অশ্রু নিপতিত হইতেছে— কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতেছে—বুঝিবা রাসবিহারীর কথা মনে করিয়া আমার

* কলিকাতা মনোমোহন থিয়েটারে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের শোকসভায় লেখক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশটী সভাপতি পণ্ডিত শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ।

[illegible] এমন কুলে, শীলে, বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, মনীষায়; দানে আর দ্বিতীয় কলাহারী মিলিবে কি? কে আর অমনভাবে আপন স্বেদসিক্ত কলেবরে উপার্জিত অপরিমিত ধনরাশি দেশের ও দশের কার্য্যে ধূলি-মুষ্টির ন্যায় ফেলিয়া দিবেন? বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ—বাঙ্গালী নিমকহারাম, তাই আজ রাসবিহারীর শোকে বাঙ্গালীর সমগ্র হৃদয় কাঁদিয়া উঠে নাই। রাসবিহারী বঙ্গের—শুধু বঙ্গের কেন সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইতে সামান্য উকিল পর্য্যন্ত তন্ময় হইয়া যাইত। তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে পারিলে অনেক উকিল আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেন। একজন তাঁহাকে Tiger of the High coart বলিত। ভারতের আর কোন উকিল বা ব্যারিষ্টারের ভাগ্যে এরূপ উপাধি লাভ হয় নাই। সত্যই রাসবিহারী হাইকোর্টের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী শার্দ্দুল ছিলেন। একবার কোন একটী মোকদ্দমার পক্ষ সমর্থনকালে রাসবিহারী বহুসংখ্যক আইনের পুস্তক লইয়া বিচারপতির কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বিচারপতি ইউরোপ হইতে নবাগত। তিনি রাসবিহারীর পরিচয় জানিতেন না; তিনি অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন "এত পুস্তক লইয়া কি ফিরী করিতে আসিয়াছ?" বিচারপতির কথা শুনিয়া রাসবিহারীর চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনিও তদপেক্ষা অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন I have conie to teach for law শুনা যায় রাসবিহারীর এই কথায় বিচারপতি একটু ক্রুদ্ধ হইয়া রাসবিহারীকে দুই একটী রূঢ় কথাও শুনাইয়াছিলেন এবং পরে যখন শুনিলেন যে তিনি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে অবমাননা করিয়াছেন তখন স্বয়ং তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাসবিহারী পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষার প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। একদিন হাইকোর্টের বারলাইব্রেরীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় একটী কবিতা লিখিতেছেন, এমন সময় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে ইংরাজীতে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মাইকেল মধুসূদন তখন বাঙ্গালাভাষার সেবক, তিনি বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালাভাষার অনাদর দেখিয়া গ্রীক্‌ভাষায় রাসবিহারীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু রাসবিহারী গ্রীক্ ভাষা না জানায় তাহা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তদবধি

প্রতিজ্ঞা করিলেন বাঙ্গালাভাষায় ভিন্ন বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন না। তদবধি জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত রাসবিহারী বঙ্গবাণীর সেবকরূপে অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গভাষায় কোন পুস্তক লেখেন নাই বটে, কিন্তু স্বর্গীয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় রাসবিহারী সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাতন সাহিত্যপত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে রাসবিহারী বাঙ্গালা সাহিত্যের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্য তিনি অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন।

ডাক্তার রাসবিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় অত্যন্ত প্রশংসা ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আজীবন ইংরাজী সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইংরাজী সভ্যতা তাঁহাকে কোনদিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি চোগা চাপকান পরিয়া হাইকোর্টে যাইতেন সত্য কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া ধুতি চাদর পরিয়া খাঁটী বাঙ্গালীর ছেলেটীর মত হইতেন। এই গুণটুকু রাসবিহারীর জীবনের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যজগতে যাঁহারা অপুত্রক তাঁহারা আজীবনের অর্জ্জিত ধন মৃত্যুকালে কোন সৎকার্য্যে দান করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান, রাসবিহারী অপুত্রক ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্থানে ধনকুবের শত শত পোষ্যপুত্র রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসীর এই মহদ্গুণের অনুসরণ করিয়াছেন। পিণ্ডলাভ করিয়া স্বর্গে যাইবার কল্পনা একদিনও তাঁহাকে অভিভূত করে নাই। দেশের ও দশের শিক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি লোকের হৃদয়মন্দিরে নিত্য পূজার্চ্চনার ভাজন হইয়াছেন দেশবাসীর হৃদয় কোকনদ তাঁহার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

ডাক্তার রাসবিহারীর হৃদয়ের অন্তস্তল দিয়া ফল্গু প্রবাহের ন্যায় দেবদ্বিজে ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইত। জলদাবৃত ভাস্করের ন্যায় তাহা এতদিন প্রচ্ছন্ন ও লোক লোচনের অন্তরালে ছিল, কিন্তু মৃত্যুর প্রবল ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া যেই সে হৃদয়ের মেঘরাশিকে দূরীভূত করিয়া দিল, তখনই বুঝা গেল যাঁহাকে লোকে ঘোর নাস্তিক মনে করিত, তিনিত নাস্তিক নয়। তিনি যে পরম আস্তাবান্ শিবভক্ত মহাযোগী। ডাক্তার রাসবিহারী স্বগ্রামে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাকল্পে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ও জমিদারীর আয়

দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই শিবপূজার পদ্ধতি অপরূপ। এই পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দিয়া কেবল যে লোভতন্ত্র পুরোহিত ঠাকুরের উদরপূর্ত্তি হইবে এবং শিবলিঙ্গের উপর কতকগুলি পুষ্প বিল্বপত্র বর্ষিত হইবে তাহা নহে, এই অর্থের দ্বারা প্রতি বৎসর শীতকালে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে দরিদ্র নারায়ণদিগকে ডাকাইয়া বস্ত্র বিতরণ করা হইবে। এক্ষেত্রে ডাঃ রাসবিহারীর সেবাধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে। মানুষের সেবাই যে প্রকৃত ভগবৎসেবা এবং দরিদ্র নারায়ণকে অন্নবস্ত্র দিলে তাহাতে যে ভগবানেরই সেবা হয়, ডাক্তার রাসবিহারী তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাসবিহারী ব্যক্তিগত ব্যবহারে অত্যন্ত পরুষভাষী থাকিলেও অন্তর তাঁহার সর্ব্বদা দেশের দুঃখকষ্টে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। কবিবর ভবভূতি বলিয়াছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

তিনি লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁহার বজ্রকঠিনবক্ষপঞ্জরের মধ্যে যে একটা অতিকোমল, স্নিগ্ধ অন্তঃকরণ ছিল তাহা কেহই জানিত না।

ডাক্তার রাসবিহারী অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন। তিনি আহারে, বিহারে, শয়নে সর্ব্বদাই পুস্তকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতেন। এমন কি অনেক সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু বলিয়াছেন যে, একদা তিনি তৎপ্রণীত হরিশ্চন্দ্র নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে ডাক্তার রাসবিহারীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী রঙ্গমঞ্চের যেখানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেইস্থানে রাস্কিনের পুরাতন কীটদষ্ট একখানি পুস্তক ছিল, রাসবিহারী সেই পুস্তক পড়িতে পড়িতে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে অভিনয় সমাপ্ত হইলে যখন নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল সসম্ভ্রমে যাইয়া তাঁহাকে অভিনয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রাসবিহারী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিলেন "আজ কি পালা অভিনয় হইল ?"

ডাক্তার রাসবিহারী বাল্যাবধি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে কেহ কখনও বড়লোক হইতে পারে না। কিংবা মহত্বের পদবীতেও

আরোহণ করিতে পারে না। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ডাক্তার রাসবিহারী উভয়েই পূর্ব্বজীবনে বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। একদিন রাসবিহারী গুরুদাসকে বলিলেন "চলুন আমরা হাইকোর্টে যাই, বহরমপুর রাসবিহারী ঘোষের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পারে না।" রাসবিহারীর এই গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া স্যার গুরুদাস তাঁহার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত রাসবিহারীর সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ,সত্য, কিন্তু যখন রাসবিহারীর প্রবল আইন পাণ্ডিত্যে সমগ্র ভারত মুখরিত হইল, তখন গুরুদাস বুঝিলেন রাসবিহারীর কর্ম্মক্ষেত্র সামান্ত জজ আদালত নহে।

রাসবিহারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে আইন ছিল যে কোন পরিবারে যদি দুই তিন ভাই থাকে এবং কোনভাই যদি ঋণদায়ে জড়িত হইয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তবে উত্তমর্ণ সেই ভাইয়ের সম্পত্তি দখলও, বিক্রয় করিতে পারিবেন।" কিন্তু রাসবিহারীর চেষ্টায় এই আইনের সংস্কার হইয়া এইরূপ হয় যে যদি অপর ভ্রাতারা ঋণগ্রস্থ ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে তবে উত্তমর্ণকে সেই ভ্রাতাদের নিকট হইতে মূল্য লইয়া ডিক্রী ফেরৎ দিতে হইবে। এই আইনের সংস্কার হওয়ায় কতশত হিন্দুপরিবার যে বিজাতীয় উত্তমর্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পঞ্চদশবৎসরপূর্ব্বে বঙ্গে যখন জাতীয় আন্দোলনের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল, তখন রাসবিহারী জাতীয়শিক্ষার জন্য অর্থদান করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার পদগ্রহণ করিয়াছিলেন আবার পঞ্চদশ বৎসর পরে পুনরায় জাতীয় শিক্ষার জন্য দেশবাসীর প্রাণ আকুল দেখিয়া রাসবিহারী অন্যূন দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা এতদর্থে দান করিয়া গিয়াছেন। দেশের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ জাতীয় শিক্ষালাভ করিয়া জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হউক, হিন্দুর ছেলে বিলাসবাসনা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ছেলের মত হউক, আবার প্রাচীনকালের মত হিন্দু শিক্ষার্থী ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ হইয়া অর্থকরী বিদ্যা না শিখিয়া যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় তাহাই শিক্ষা করুক, ইহাই জাতীয়শিক্ষার উদ্দেশ্য। রাসবিহারী এই জাতীয়শিক্ষার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যখন মহাসিন্ধুর ওপার হইতে শেষ আহ্বান

শুনিলেন তখন দ্বাদশ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিয়া গেলেন, ইহাপেক্ষা স্বদেশ প্রীতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আর কি আছে? শুধু ইহাই নহে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—রাসবিহারীর মূলমন্ত্র। জননীর নামে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি প্রতিবৎসর একটী করিয়া স্বর্ণপদক মহিলা পরীক্ষোত্তীর্ণকে দিয়া থাকেন, তাহাছাড়া নিজের স্বগ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য রাসবিহারী একলক্ষ মুদ্রা ও আইনপুস্তক ব্যতীত যাবতীয় পুস্তক দান করিয়া গিয়াছেন। কি অসামান্য স্বগ্রামপ্রীতি।

রাসবিহারী দেশের শিল্পোন্নতির জন্য ভবানীপুরে একটী দেশলাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশে শিল্পকর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও কারখানা স্থাপন না করিয়া কেবল মুখে দেশের উন্নতির বিষয়ে বক্তৃতা করিলে কোন ফলোদয় হইবে না জানিয়া রাসবিহারী ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে দেয়াশলাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বিলাসবাসনা প্রযুক্ত বৈদেশিক চাকচিক্যময় দেয়াশলাইয়ের সহিত প্রতিযোগীতায় তাঁহার কারখানা হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার এই উদ্যমের মূলে তাঁহার দেশের শিল্পোন্নতির সাধু উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

Bengal chamical pharma ceuticul যখন স্থাপিত হয় তখন স্যার রাসবিহারী এই দেশীয় ভৈষজ্য আগারকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইহার বহুসহস্র টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাসবিহারী রাজনীতিক্ষেত্রে ধীরপন্থীদলভুক্ত থাকিলেও যখনই প্রয়োজন বুঝিতেন তখনই দলিতফনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেন। লর্ড কার্জ্জন যখন প্রাচ্য দেশবাসীকে "অসভ্য বর্ব্বর" আখ্যায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন যখন ভারতে একটী হৃদয়ও সে অপমানের শেলে বিদ্ধ হয় নাই, কেবল মাত্র রাসবিহারী ক্রোধে, রোষে ধূর্জ্জটীর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া লর্ড কার্জ্জনের গালাগালির যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন।

বিগত যুদ্ধের সময় Defence of Indian act অনুসারে যে সব ভারতীয় যুবক অবরুদ্ধ হইয়াছিল স্যার রাসবিহারী তাহাদের অভাব অভিযোগপ্রতীকারার্থে জনমতার সৃষ্টি করিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন লর্ড মিণ্টো যখন প্রেস আইনকে আরও দৃঢ় বাঁধনে বাঁধিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তখন রাস বিহারীই করজোড়ে বলিয়াছিলেন হে প্রভো! ভারতবর্ষকে রুশিয়ার শাসনপ্রণালীভুক্ত করিও না।"

আর রাসবিহারীর বৈশিষ্ট্য কিন্তু এসকলে নহে। অসাধারণ দানের জন্যই আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এরূপ সাত্ত্বিক দান একা রাসবিহারীতেই সম্ভবে। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের Sceince Collage থাকিবে ততদিন কীর্ত্তিগরিমা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কালের প্রবল তরঙ্গভিঘাতে সকলই বিলুপ্ত হইবে কিন্তু এই বিজ্ঞান কলেজ হইতে যে সমস্ত কৃতিছাত্র বহির্গত হইবে তাঁহারা এক একজন রাসবিহারীর জলন্ত ছবি হইয়া তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে। রাসবিহারীর অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি আইন বিশারদ বলিয়া দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। এমন কি দেশের বড় বড় ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিতেন "ঐ যে অমুক আল্‌মারীতে অমুক বইয়ের অমুক পাতায়, অমুক পংক্তিতে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর আছে।"

ডাক্তার রাসবিহারী আইনবিষয়ে কয়েকখানা অতি উচ্চশ্রেণীর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর প্রফেসররূপে তিনি হিন্দুআইন সম্বন্ধে যে সমস্ত সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাণ্ডিত্যে ও যুক্তিতর্কে অসাধারণ। তাঁহার হাইকোর্টের বক্তৃতায় ও সেকস্‌পীয়র, মিল্টন, রামায়ণের কথা প্রত্যেক পদে পদে উদ্ধৃত।

ডাক্তার রাসবিহারী যেমন পাণ্ডিত্যে তেমনই বদান্যতায় আদর্শ মহা-পুরুষ। ভগবান্ তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণবিধান করুন্। দেশবাসীও তাঁহার মহৎজীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংসারপথে অগ্রসর হউন, তাহা হইলেই সেই স্বর্গগত মহাত্মার প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে এবং তাঁহার স্মৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। তস্মাৎ ওঁ ইতি (শব্দঃ) উদাহৃত্য (কর্ম্মাদৌ তদবোচ উচ্চার্য্য) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবেদার্থ পারগানাং) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্র বিধানোক্তাঃ) যজ্ঞ দান তপঃ ক্রিয়াঃ সততং (সর্ব্বদা) প্রবর্ত্তন্তে (প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে) ২৪

বঙ্গানুবাদ। এই জন্য ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদ্‌গণ শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ দান তপস্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ২৪

আলোচনা। "ওঁ"কার শব্দটী ভগবানের একটী বিশেষ নাম। সৃষ্টির প্রথম শব্দ "ওঁ" এ জন্য বেদবিদ্‌গণ যজ্ঞ দান তপস্যাদি শাস্ত্রীয় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত-সময়ে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যে হেতু ভগবানের নাম উচ্চারিত হওয়ায় তৎকার্য্যে যে কোন দোষ থাকে তাহা দূর করিয়া কার্য্যের সফলতা করে। ২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ।
দান ক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। তৎ ইতি (ব্রহ্মাভিধানং উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈঃ) মোক্ষ কাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুভিঃ পুরুষৈঃ) ফলং (কর্ম্ম জন্য ফলং) ন অভিসন্ধায় (ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা) বিবিধাঃ যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়া দান ক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে। ২৫

বঙ্গানুবাদ। মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ তৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফল কামনা বর্জ্জিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞ তপঃ ও দান কার্য্য সমাপণ করিয়া থাকেন। ২৫

আলোচনা। তৎ শব্দ ঈশ্বরপদবাচ্য। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বিগুণ থাকিলেও তাহা খণ্ডন এবং ভবিষ্যতেও কোন বৈগুণ্য ঘটিতে পারে না। এ জন্য যাহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরে ফলার্পণ বুদ্ধিতে যজ্ঞ তপঃ দান ও বিবিধ ক্রিয়াকালে "তৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যে তৎপ্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মনি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থযুজ্যতে॥ ২৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পার্থ (অর্জ্জুন) সদ্ভাবে (সতো ব্রহ্মণোভাবঃ তস্মিন্ সর্ব্বস্য ব্রহ্মভাবে বিবক্ষিতে) সাধুভাবেচ (সাধুত্বেচ) সৎ ইতি এতৎ (পদং) প্রযুজ্যতে তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি (কর্ম্মণঃ প্রশস্তত্বে বিবক্ষিতে সদিদং কর্ম্মেতি) সচ্ছব্দোযুজ্যতে। ২৬

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! সদ্ভাবেসাধুভাবে এবং মঙ্গলজনক কার্য্যকালে শিষ্টগণ 'সৎ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ২৬

আলোচনা। "সৎ" শব্দ ব্রহ্মের একনাম। সৎশব্দ উচ্চারণে ব্রহ্মভাবের স্মরণ সা ।ধুইয়সদ্ভাবেভাবে অর্থাৎ পবিত্রবিশুদ্ধ প্রকাশ করিতে

হইলে সংশব্দ ব্যবহার করিতে হয়। অতএব যজ্ঞতপস্যা দান এইসকল মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্রহ্মভাব এবং পবিত্রভাবের উদ্দীপনার্থ সংশব্দ প্রযুক্ত হয়। সংশব্দ ব্রহ্মভাবাত্মক বলিয়া সর্ব্বকার্য্যের মঙ্গল সম্পাদন করে। ২৬

যজ্ঞে তপসিদানেচ স্থিতিঃ সদিতিচোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। যজ্ঞে (যজ্ঞকর্ম্মণি) তপসিদানেচ (বা) স্থিতিঃ (সনিষ্ঠাবস্থানং) (সৎ) সৎ ইতি উচ্যতে। কর্ম্মচ এব তদর্থীয়ং তৎ+অর্থীয়ং—তৎ—যজ্ঞতপঃ দানং (অর্থীয়ং) (এবং তৎ পরমাত্মা পরমাত্মার্থং ফলংযস্য তৎ পূজোপচারগৃহাঙ্গন পরিমার্জ্জনং উপলেপনাদিক্রিয়া (তদর্থীয়ং) সংইতি অভিধীয়তে। (কথতে) ২৭

বঙ্গানুবাদ। শিষ্টগণ যজ্ঞতপস্যা ও দানরূপ কার্য্যকালে এবং ভগবৎ প্রীতির জন্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠানকালে সংশব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ২৭

আলোচনা। যজ্ঞতপস্যা দানাদি কার্য্যে নিষ্ঠার সহিত অবস্থিতিকালে সংশব্দ উচ্চারিত হয় এবং তদর্থীয় কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞদানতপস্যাকালে এবং তৎ ভগবৎ প্রীতি জনক কর্ম্মানুষ্ঠান ভগবম্মন্দিরকরণ তৎ পূজায়োজন কার্য্যে বিঘ্নবিনাশন জন্য সংশব্দ উচ্চারিত হয়। ২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চযৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্ম শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থং অশ্রদ্ধয়া কৃতংসর্ব্বং নিন্দতি। অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং) হুতং (হোমং হবনং) দত্তং (অশ্রদ্ধয়া দানং) তপস্তপ্তং (অশ্রদ্ধয়া অনুষ্ঠিতং তপঃ) যৎ (অন্যদপি অশ্রদ্ধয়া কৃতং তৎ সর্ব্বং অসৎ ইতি উচ্যতে। হে পার্থ তৎ ন প্রেত্য লোকান্তরে নো ইহ (অস্মিন্লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ) ২৮

বঙ্গানুবাদ। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে সকল যজ্ঞ তপস্যা দানাদি বা অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহা না ইহলোকে না পরলোকে ফলপ্রদ হয়। ২৮

আলোচনা। যদি ওঁ তৎ সৎ উচ্চারণ করিয়া কার্য্য করিলেই যতদোষ হউক সকল দোষ কাটিয়া যায় তাহা হইলে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক কার্য্যের ফলের প্রভেদ থাকে না। সাত্ত্বিক কার্য্যের প্রশংসা থাকে না। সংযত হইয়া কেন লোকে সাত্ত্বিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এইজন্য

ভগবান্ বলিতেছেন, যে কেবল ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী শব্দ উচ্চারণ করিলেই হইবে না। কার্য্যে শ্রদ্ধা থাকা চাই। শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া মহাযজ্ঞে আহুতি দেও, ব্রাহ্মণ দরিদ্রকে ভূমি গো স্বর্ণাদি দান কর, মন্ত্রজপ তপস্যা কর কিছুতেই ফল হইবে না। শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ তপস্যা দান ইহলোকে বা পরলোকে কোনলোকে ফলদায়ক হয় না। ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম—

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

মহাত্মা চিরকারী।

গৌতম বংশীয় মহাতপা মেধাতিথি নামক মহর্ষির চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। মহর্ষি কোন কারণে পত্নীর উপর ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রকে মাতৃহত্যা করিতে আদেশ দেন। পুত্র হঠাৎ এই কার্য্য না করিয়া যোগাবলম্বনে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃহত্যায় বিরত হইলেন তাহাই বিবৃত করা হইল।

চিরকারি চিরকারী তুমি চিরকাল
ধন্য তুমি তোমাসম কেবা আছে আর
পিত্রাদেশে মাতৃহত্যা করিবার তরে
উদ্যত করালকরে ধরি তীক্ষ্ণ অসি
নির্ণীতে কর্ত্তব্য তব বসিলে যোগেতে
কি হেরিলে- মূর্ত্তিমতী করুণা জননী
প্রকৃতি পুরুষ এই মুরতি যুগল
একাধারে মাতা-পিতা ভিন্ননামধারী।
মাতৃমাঝে পিতৃদেব করি নিরীক্ষণ
হাত হতে অসি তব পড়িল খসিয়া।
ধন্য মাতা-পিতৃ-ভক্ত কুলের পাবন
তোমার জনমে পূত সমগ্র ভুবন।

শ্রীপশুপতি সরকার।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাশি রাশি গ্রন্থপাঠ কর, শত শত তীর্থ ভ্রমণ কর, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, সমাধি কর, যদি তাহার কোনটাতেই বাঞ্ছিত ধন না দিতে পারে, তবে সমস্তই বিফল। তরুর মূলে জলসেচন করিলে সমগ্র বৃক্ষটি জীবিত থাকে। ভগবানের প্রীতি জন্মাইতে পারিলে, কোন সদাচার, তীর্থ ধর্ম্ম না করিয়াও চরিতার্থ হইবে। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ এবং ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। যাঁহারা বলেন নিরন্তর ধর্ম্মান্দোলনে ভারতবর্ষ ছারেখারে গিয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত ধর্ম্ম ধরিয়া রাখে, উৎসন্ন দেয় না, ধর্ম্মই একমাত্র জীবের বন্ধু। গোঁড়মার আধিক্যে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয় নচেৎ ধর্ম্ম কাহাকেও নষ্ট করে না, প্রত্যুত রক্ষা করে। এখন যাহা উন্নতি বলিয়া কথিত হয়, তাহা অবনতির রূপান্তর মাত্র। সভ্যতায় কাহার কি অভাব ঘুচিয়াছে, কাহারও তপ্তশ্বাস শীতল হইয়াছে? ধনে কে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, কে অত্যাচার না করিয়া অন্যের রক্ত শোষণ না করিয়া ধনী হইয়াছে? সমস্ত পৃথিবীই রণক্ষেত্র হইবে, সমস্ত ভূভাগই কলকারখানায় পরিণত হইবে, ইহাই কি সুখ শান্তির উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা? ভারতভূমি কর্ম্মভূমি, ইহা ধর্ম্মের সূতিকাগৃহ। সমস্ত ধর্ম্মমত এখান হইতে প্রচার হইয়া জগতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ভগবানকে ভুলিয়া ঐহিক সম্পদ লইয়া থাক। ইহা যাহারা বলে, তাহারা আমাদের শত্রু। আমরা ধর্ম্মই চাই, অন্য কিছু চাই না। আমরা ভগবান্‌ই চাই, অর্থ চাই না। তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হয় সেও শ্রেয়ঃ। ভারত জগতের জ্ঞানোপদেষ্টা গুরু, ভারত তাই চায়, এখনও ভারত জগৎকে জ্ঞান বিতরণ করিতে প্রস্তুত। ধর্ম্মজীবন শান্তিময় হওয়াই আবশ্যক। ভগবান্ আমাদের সেইরূপ মতিগতি দিন, যেন বংশানুক্রমে আমরা তাঁহার ভক্ত সেবক হইয়া যাইতে পারি। আমরা সৌদামিনীর দাসীত্ব, জড়ের ভৃত্যত্ব চাই না, আমরা চাই ভগবানের অভয় চরণ পদ্ম।

যাঁহার সেবায় পশুত্ব ঘুচে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, দেবত্ব জন্মে, আমরা সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের চরণই চাই। নীচাদপি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেও দুঃখিত নহি, যদি তাঁহার চরণ যুগল বিস্মৃত না হই। তাঁহার বিস্তৃত বাহু অভয় প্রাণীর জন্য সততই উদ্যত আছে, মাত্র মূঢ়েরাই দেখিতে পায় না। প্রাণিজগৎ,

সৌরজগৎ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার অস্তিত্ব কে অস্বীকার করিবে? আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে পুত্রভাবে, সখিভাবে, প্রভুভাবে, পতিভাবে ভাবিতে পারি। মনের ভাবনার স্রোত নিশ্চিতই তাঁহার নিকট পৌছিবে। কারণ, তিনি সমুদ্র, মনুষ্য ক্ষুদ্র সরিৎ। সরিতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদ্রের সহিত যোগ না থাকিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে যোগ অবশ্যই থাকে। তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের আধার ভগবানে অংশভূত চিদের সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। সুতরাং আমাদের সমস্ত ভাবই তথায় পৌঁছিতে পারে। তাঁহাকে জানিবার বা পাইবার প্রধান মন্ত্রই মন। মন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে এবং বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে মনের উপর ভগবানের সত্তা প্রতিষ্ঠাত হয়। যদিও শাস্ত্রে কথিত আছে যে, তিনি মনের অগোচর, তথাপি মনই ভগবদ্ভাবই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ইহা ভিন্ন ভক্তানুগ্রহার্থ তিনি ভক্তের বাঞ্ছিতরূপেও দেখা দিয়া থাকেন। কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না, মাত্র ভক্তি-দ্বারাই তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে। জ্ঞানিগণ বহু জন্মের পর তাঁহাকে পাইতে পারে, ভক্ত একই জন্মে তাঁহাকে পাইতে পারে। ভক্ত তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিতে পায়। তাঁহার অখণ্ড দয়া সে উপলব্ধি করিতে পারে। ভক্তানুগ্রহার্থই তাঁহার অবতার, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র বলিয়া থাকেন। অতি ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী মানব, সহজে তাঁর অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁর শরণাগত হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি এমত বুদ্ধি দেন, যাহাতে সেই শরণাগত ভক্ত অনায়াসেই তাঁহাকে জানিতে পারে।

তাঁর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইলে এক জন্মে না হউক, যে কোন জন্মে নিশ্চিতই জীব তাঁহাকে পাইবে। তিনি কাহারও প্রতি বিমুখ নহেন; তিনি সতত সদয়। সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার জন্যই সাধনার আবশ্যক। বনিয়াদ সুদৃঢ় না হইলে, তদুপরি সৌধ নির্ম্মাণ অসম্ভব। সুতরাং চিত্ত সুন্দররূপ গঠিত পরিশুদ্ধ না হইলে, নাস্তিক্য বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে, কখনই ভগবৎ সত্তা অনুভব করা যায় না। চিত্ত গঠন করিতে, শ্রদ্ধা, দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিতেই কত জন্ম বিগত হইয়া যায়। যখন প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হয়, তখন বিভু, গুরুরূপে আসিয়া দেখা দেন এবং ভবপারে যাবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সুতরাং দুদিনের প্রযত্ন বিফল হইল বলিয়া কখনই ভগ্নোত্তম হওয়া বিধেয় নহে। প্রত্যক্ষ মনুষ্যের তুষ্টি দুই চারি দিনে করিতে পারি না, অপ্রত্যক্ষ দেবতার তুষ্টি দুই চারি দিনে হইবে কিরূপে? অনেকে এমত আপত্তি করেন

যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও দয়াময় হইলে জগতে এত দুঃখ কেন? যাঁর ইচ্ছা আছে ও দয়া আছে, তিনি কি জগতের দুঃখ দূর করিতে পারেন না? এমত আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ নীতিপরায়ণ বিচারক দোষী নিজ পুত্রেরও শিরশ্ছেদ করেন, না করিলে তঁাহার চরিত্রে দোষ স্পর্শে। যাহার যেমত কর্ম্ম তদনুরূপ ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। তবে যদি প্রকৃত জ্ঞান বা প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রভাবে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। তখন জীব সুখ দুঃখের অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার শক্তি বা দয়া নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না। দোষী, নির্দ্দোষ সবাই সমশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না। বাজারে মুড়ি মিছরির সমান দর হইলে অবিচার হয়। পার্থিব বিধির কখনই ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁর নিকট দয়া ভিক্ষা চাও, তিনি অনুগ্রহ করিলে তুমি বিগত পাপ হইলে অবশ্যই দুঃখ দূর হইবে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ কিনা, তাহা এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ পুস্তক পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। যাহারা ক্ষুদ্র দৃষ্টি তাহারাই নাস্তিক হইয়া থাকে। যাহারা বিশ্বের প্রত্যেক অণু, পরমাণু তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহারা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়, এইরূপ কত শত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মস্তকের উপরিভাগে যে সৌরজগৎ দৃষ্টহয়, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। এক একটী গ্রহ, নক্ষত্র, এই পৃথিবী হইতেও বৃহত্তর বা বৃহত্তম। তাহাতেও কত নদ নদী, সরিৎ সাগর, ভূধর বনস্পতি বিদ্যমান আছে, অগণ্য জীবপুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই পৃথিবী একসময় উত্তপ্ত বাষ্পাকারে পরিণত ছিল ক্রমে শীতল হইয়া এইরূপ কঠিন আকারে পরিণত হইয়াছে। কাহার ইচ্ছায় বিশ্বের নিত্য নব নব অবস্থান্তর ঘটিতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? জড় প্রকৃতির এ বিচিত্র লীলা অসম্ভব। অতএব মনে এমত দৃঢ়নিশ্চয় আনিতে হইবে যে, ঈশ্বর নিশ্চিতই আছেন এবং তিনি অনুগ্রহ পরায়ণ ও বিভু। তিনি দয়া করুন বা না করুন, আমাদিগের মধ্যে তাঁরই প্রদত্ত এমত শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে আমরা তাঁহার নিকট উপনীত হইতে পারি, এবং যতদিন আমরা তথায় না উপনীত হইব, ততদিন এ সংসার-সাগর-প্রবাহে উন্মজ্জন নিমজ্জন শেষ হইবে না। কূলে না পৌঁছিলে তরঙ্গাঘাত হইতে অব্যাহতি নাই। ভগবানের চরণই সাগরের বেলাভূমি। সেখানে উপনীত হইলে আর ভয় থাকে না, সমস্ত ভয় তাঁর ভয়ে পলায়ন করে।

সামান্য রাজার শাসন ভয়ে লোকে শঙ্কা পায়, আর তাঁর ভয়ে মহাভয় মৃত্যুও ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে। নামের এমনই অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে, অপ্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ ও নামের গুণে ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন যে, হরিনাম ভিন্ন কলিযুগে, গতি নাই। এই কলিযুগে নামযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। নামের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ শান্তি পায়, মন স্থির হয়, বিপদ দূরে যায়, শ্রদ্ধারতি দৃঢ়া হইয়া উঠে। নামের গুণে বিনাসম্বলে অকিঞ্চন কাঙ্গালও দুস্তর ভবপারাবার পার হইয়া যাইতে পারে। এ যুগে এ সুযোগ যে হারাইবে সে হতভাগ্য।

শ্রীহরির নামের এমনই মহিমা এমনই মনোভিরামতা যে, শ্রবণ বা কীর্ত্তন মাত্রেই হৃদয়ে অতুলশান্তি প্রবাহ বহিতে থাকে। যেন নামী নামের সহিত এক হইয়া মিশিয়া আছে। করতালি দিয়া নামকীর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই দেহবৃক্ষে যত পাপবিহঙ্গ বাস করে তাহারা করতালিধ্বনিতে দূরে পলায়ন করিবে। জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত জীবনধন শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করিতে পারি। যাঁহা হইতে বিশ্বপ্রসূত, বিশ্বের কোন বস্তুর সহিত তাঁর তুলনা করিব? তাঁর তুলনা তিনিই। দীনাতিদীন, নীচাতিনীচ, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, অধম হইতেও অধম অনন্যশরণ, নিরাশ্রয় হইয়াও যদি তাঁর করুণাকণা লাভ করা যায়, তাহা হইলে, মনে করিতেই হইবে যে, সমগ্র জগতের ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে। যে ধনে পাবার জন্য অসংখ্যযোনি ভ্রমণ করিতেছি, কত স্থানে কত জনের নিকট সন্ধান করিয়াছি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছি, কত দিবারজনী হতাশ প্রাণে ঐ নীলগগনের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়াছি, কেহ কি ঐ নীলআবরণে আমার প্রাণধনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে? অনুনয় করিয়া বলিয়াছি, যদি কেহ সুনীল আবরণে আমার প্রাণধনে আবৃত করিয়া থাক, তবে, পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, খুল আবরণ দেখাও আমার প্রাণধনে। গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুন্নত উদ্গ্রীব শৃঙ্গ দেখিয়া পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, হে গিরিবর! তুমি গ্রীবা উচ্চ করি কি দেখিতেছ? তুমি কি আমার প্রাণধনে দেখিতে পাইয়াছ, তাহাতেই কি প্রেমাশ্রুরূপে তোমার বারি ঝরিতেছে। উন্মত্ত ষট্পদের প্রাণ মাতান মধুরগুঞ্জন স্বর্গীয় বীণার গান মনে করিয়া, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। হে মধুপ! তুমি কি গুণ গুণ স্বরে আত্মহারা হয়ে সেই গুণাকরে রগুণগানকরিতেছে? হে ভৃঙ্গবর! আমি নির্গুণ,

শিখাও আমাদের, কি গুণে তাঁরে ভুলালে? কুসুমের হাসি, বল্লরীর নৃত্য সমীরের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সাধ্যমত সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তোমরা কি কেহ আমার প্রাণধনে দেখিয়াছ।

প্রকৃতি নীরব, কেহই আমার কথায় সাড়া দেয় না। দিবে কেন? যে অমৃতহ্রদে নিমগ্ন হয় সে কি উঠিতে চায়? যে আস্বাদ পরকে বুঝান যায় না, তাহার জন্য, স্বসম্বন্ধ পরকে উত্তর দিবে কেন? আমি বুঝি না তাই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করি। যে জন প্রাণে আসে, মনে আসে না, ধরি ধরি মনে করি ধরিতে পারি না, মানসচক্ষে হেরি এ চক্ষে দেখিতে পাই না, যাহা মিথ্যা নহে, ধ্রুব সত্য, সত্যের উৎস, প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাঁর মহিমার পরিচয় পাই, সে ধনে এ জীবনে কি পাব না? যদি না পাই তবে এ জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁর আশা ত্যাগ করিতে হইবে যদি মনে করা যায়, তবে তাঁহার আশা ত্যাগের সহিত জীবন ত্যাগ হউক ইহাই উচিত। প্রাণবল্লভ বিনা প্রাণ থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি পাখী হইতাম, তবে উড়ে গিয়ে গোপী-পদস্পৃষ্ট ব্রজরজ অঙ্গে মেখে এ অধম জীবন, জনম সফল করিতাম। মরি মরি ও: কি অদ্ভুত প্রেম ব্রজগোপীদিগের, কে এমন আছে, যে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি গাঢ়স্মরকেলিমিশ্রিত বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত বিচিত্র প্রেম "অনুভব করা দূরে থাক" বর্ণনা করিতেও সমর্থ হইতে পারে? যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইতে না পারিয়া নশ্বরদেহ বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বজীবের আত্মেশ্বর, প্রাণেশ্বর গোবিন্দের আত্মার সহিত আত্মার মিলন করিয়া স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অলৌকিক প্রেম" মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেবগণেরও দুর্লভ। মনুষ্যের কল্পনার অগোচর যে গোপীপ্রেম তাহা, যাহারা ভিন্নচক্ষুতে দেখে, তাহারা নারকী, মহাপাপী। সেই ভব বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত গোপীপদরজ কামনা করাও আমার ধৃষ্টতা মাত্র।

স্বর্গ হইতেও পবিত্র, সেই বৃন্দাবন যেখানে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ লীলা করিয়াছেন। যেস্থানে তরুলতা পবিত্র গোপীপদরজঃ সম্পৃক্ত। মনে করি যেয়ে সেই তরুলতাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করি। আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই প্রেমসিন্ধুর কৃপাবিন্দু ভিক্ষা করি। হা গোবিন্দ! বলে সেই পবিত্র ভূমিতে মূর্চ্ছিত হই। হায়! আমার কি আর সে ভাগ্যোদয় হবে? কেন আমার সদ্গতি হল না, কেন আমি বিষয়ের কীট হইয়া রহিলাম? কেন আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মরণ

লইলাম না। দয়াল দীনবন্ধু কর্ণধার থাকিতে কেন আমি ভবপারাবারে ভাসিলাম? ধিক্ শতধিক আমার এ বৃথা জীবনে। আমি মূঢ়মতি, কুরঙ্গে কুসঙ্গে অমূল্য জীবননিধি কালসিন্ধুজলে নিঃক্ষেপ করিলাম। নিজে খাল কাটিয়া কালরূপ গ্রাহ ডাকিয়া আনিলাম। দোষ দিব কার? আমিই স্বয়ং অপরাধী। বিধি বাম, তাই আমার জ্ঞানোদয় হইল না, অজ্ঞান-তিমিরে মজিয়া রহিলাম। কেন আমি প্রাণবল্লভকে প্রাণভরে ডাকিলাম না। কেন আমি কুহকিনীমায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া রহিলাম? কেন আমি বিষয় বিষপানে বিচেতন হয়ে পথের সম্বল হারাইলাম?" কেন মায়া যবনিকার অন্তরালে বসিয়া রহিলাম? কেন আমি প্রবৃত্তির মন্ত্রণাবাক্যে কর্ণ দিলাম? কেন আমি কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দুর্লভ জনম পেয়ে পশুজীবন বহন করিলাম? কেন পথভ্রান্ত হয়ে কুপথে পদার্পণ করিলাম? কেন আমি মরীচিকায় প্রাণ দিলাম? কেন আমি সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিলাম? কেন আমি শাস্ত্রবাক্যগুলি শুনিলাম না? এখন আমায় কে বাঁচাবে? আমি কার শরণাপন্ন হইব? খদ্যোৎপ্রভা দেখিয়া হায়! কেন আমি শারদজ্যোৎস্নায় পরিত্যাগ করিলাম? কেন আমি ভুবনজীবনে ভুলে দারা সুতের প্রণয়ে মজিলাম? আমি ঘোর পাতকী তাই বুঝি আমার সতিমতি জন্মিল না।

যদি আমার জ্ঞানোদয় হইত, যদি আমি জীবনের সমস্ত ভার শ্রীহরির রাজীবচরণে সমর্পণ করিতাম, যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই তাঁর চরণে সমর্পণ করিতাম, যদি আমার আমিত্ব হারাইতে পারিতাম, যদি আমি তাঁর দাসানুদাস, পদরেণু হয়ে থাকিতাম, যদি আমি "পার কর" বলে তাঁরে ডাকিতাম, যদি আমি, ভয় পেয়ে তাঁর কোলে লুকাইতাম, যদি আমি তৃষ্ণাতুরের জলকামনার মত, বিরহিনীর পতিকামনার মত, চাতকের মেঘকামনার মত, বৎসহারা ধেনুর বৎসকামনার মত তাঁর শ্রীচরণ কামনা করিতাম, তাহা হইলে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, অবশ্যই দেখা দিতেন, আশ্বাস দিতেন, কোলে তুলে লইতেন, দুঃখ দূর করিতেন, অনন্ত প্রেম পারাবারে সন্তরণ শিক্ষা দিতেন। আমি না গেলেম কূলে, না গেলেম গোকুলে, এখন অকূলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সবাইকে দেখাইতে পারি। অবিরত দাবানল দাউ দাউ জ্বলিতেছে। দাও জল, জল দাও, সমস্ত বারিধি শুষ্ক করিয়া জল দাও, পাতাল বিদীর্ণ

করিয়া ভোগবতীর প্রবলপ্রবাহ এ শিখায় ঢাল, তবুও এ অনল নিবিবে না। নিরয়, কোথা সেস্থান? তাহা এই হৃদয়মাঝারে। তুচ্ছ রসনার সুখের জন্য অকার্য্য, পাপ, এমন কিছুই বাকী নাই যাহা করি নাই। স্ত্রীসমাজে ক্রীড়া মৃগতুল্য বশীভূত হয়ে দাসবৎ কার্য্য করিয়াছি তাহাতে কি সুখ পাইয়াছি? অরুন্তুদ যাতনা মর্ম্মস্পর্শী ব্যাথা। যাহাতে দুঃখ, তাই সুখ মনে করিয়াছি, ঐহিক সর্ব্বস্ব লইয়া গর্দ্দভবৎ বাহিত হইয়াছি। আমায় দেখিয়া সে রাসভনন্দনও উপহাস করিয়াছে। করিবে না কেন? সে স্বেচ্ছায় ভার বহন করে না। আমি যাচিয়া ভার লইয়াছি, সুতরাং সে, উপহাস করিবেইত।

কণ্টকলোলুপ, ক্রমেলক আস্বাদলোভে, তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক চর্ব্বণ করে, কণ্টকের তীক্ষ্ণাগ্রে জিহ্বা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধির ধারা বহিতে থাকে। তবুও সে কণ্টক চর্ব্বণ হইতে বিরত হয় না। তদ্রূপ আমিও বিষম বিষয়কণ্টক ভোগ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় হইয়াছি, তবুও অদ্যাপি নিবৃত্তি নাই। অনেক শাস্ত্রঅধ্যয়ণ করিয়াছি, তবুও হৃদয় নির্ম্মল হয় নাই। চঞ্চু শকুনির মত প্রতারণাবুদ্ধির সহিত পরধনরূপ গোভাগড়ের প্রতি পড়িয়া আছে। লোকে বলে আমি অনেক উচ্চে উঠিয়াছি, কিন্তু সে শকুনিরই মত। মৃতধনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সঞ্চালন জন্য। অন্যায়ার্জ্জিত অর্থ শাস্ত্রকারেরা মৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। জগতে অধিকাংশ ধনীই অন্যায়ার্জ্জিত ধনে ধনবান্। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কজন লোক জীবিকার্জ্জন করে? যেমত আচরণে আমরা পশুদ্বারা নিন্দিত হই, অথচ তাহাতে নিজে ঘৃণা বোধ করি না, তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? স্বপ্নতুল্য ক্ষণভঙ্গুর জীবনের জন্য গোবিন্দের চরণারবিন্দ মকরন্দ পানানন্দে বিমুখ হইয়া বিষয়বিষ পানে জন্মে জন্মে শিতিকণ্ঠবৎ হইতেছি। পথ দেখাইয়া দেবার লোক থাকিতেও কুপথে গমন করিতেছি। পথ দুর্গম নহে, ভয়ের কোন শঙ্কা নাই, পতনের ভয় নাই, প্রত্যবায় নাই, বরং গুণ আছে। অল্পমাত্রও অগ্রসর হইলে মহৎ ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সে পথে কত অকৃত্রিম কারুণিক বন্ধু মিলে, কত সুহৃদ হাত ধরিয়া লইয়া যায়, যাইতে যাইতেই মন আনন্দে বিভোরহইতে থাকে। সম্মুখে তিমির নাশ করিয়া আলোকজ্যোতিঃ পতিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআত্তনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ

মনসা পূজা।

আমরা ভগবানের প্রতিমা পূজা করি তখন পুরুষ প্রকৃতিরূপেই তাঁহার পূজা করি। নির্গুণব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থায় নির্গুণব্রহ্মসাধক প্রতিমা-কল্পিত পূজা করেন না। সগুণেরই রূপ, গুণ নাম এবং ভগবানের রূপে গুণে নামের পূজা সাধনা করা হয়।

আমরা প্রতিমায় দেবতা পূজায় কখনও পুরুষ প্রাধান্যে, কখনও প্রকৃতি প্রাধান্যে, কখনও পুরুষ প্রকৃতি উভয়কে একত্র পূজা করি। যথা গণেশ,, সূর্য্য, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু আমরা স্বতন্ত্র ২ পূজায় পঞ্চদেবতার পূজা করি। কখনও শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী নারায়ণ এইরূপে পুরুষ প্রকৃতি উপাসনা করি, কখনও প্রকৃতি প্রাধান্যের লক্ষ্মী সরস্বতী, মনসা, ইত্যাদি প্রকৃতির পূজা মূল ভাবে করি। অর্থাৎ মূল ভাবে কখনও কখনও পুরুষ প্রাধান্য প্রকৃতির অপ্রাধান্য ভাবে পূজা করি। কখনও প্রকৃতি প্রাধান্য, পুরুষ অপ্রাধান্য ভাবে পূজা করি। প্রকৃতি পূজায়ও আমরা পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ বিষ্ণুকে উপলক্ষ রাখিয়া প্রকৃতির পূজা করি। পূজার বিধানে ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায়।

মানুষ সাধারণতঃ ভক্তিতে, ভয়ে, ইত্যাদি নানা অবস্থাবগতিকে পূজা করে। কোন কিছুই বাসনা কামনা বা ভীতি পীড়াদি আশঙ্কা বশতঃ ব্যতীত যে লোকে পূজা করেন না তাহা নহে।

এমন কি সাধারণ অনার্য্য বর্ব্বর অবস্থাপ্রাপ্ত মানবজাতির মধ্যেও দেখা যায়, যদিও ঈশ্বর সম্বন্ধে উচ্চ জ্ঞান ধারণা তাহাদের নাই। কিন্তু ভয়, ভীতি, আনন্দ, অভাব ইত্যাদি নানা বিভীষিকা ও প্রয়োজনের ভিতর দিয়া তাহারা ঈশ্বরকে পূজা করে। অনেকে ঈশ্বরকে অসীম, নিরাকার, অব্যক্ত জানিয়াও তথাপি সৃষ্ট পদার্থের মধ্যবর্ত্তীতায় তাহার পূজা করিয়া থাকে অসভ্যজাতির মানবগণের মধ্যে অনেকের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা ও ঈশ্বরপূজা প্রস্তর বৃক্ষ ইত্যাদির মধ্যবর্ত্তীতায় করিতে দেখা যায়। পাঞ্চভৌতিক সত্তার মধ্য দিয়া তাহারা ঈশ্বর উপাসনা করে। উহাদিগকে ভূতোপাসক "জড়োপাসক" ইত্যাদি নামে অনেকে অভিহিত করেন। অনেকে পশু পক্ষী ইত্যাদির অন্তর্গত জীব বিশেষকেও পূজা করিয়া থাকে। জড়োপাসকরূপে কোনও প্রাণীর কোনও বিশেষভাব-সত্তার পূজা ভক্তিভাবে আধ্যাত্মিক পূজা করে অথবা শুধু "ভীতি" নিবারণ বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে করে, তাহা এককথায় অনুমান

করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তিনিই জানেন তাহারা
কি ভাবে পূজা করে।

পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে তাহা পারলৌকিক বিপদভীতির আশঙ্কা-
নিবারণের জন্যও অসভ্যজাতিগণ "প্রেতোপাসনা" করেন, আবার অনেক
সময় পরলোকগত আত্মার "প্রেত-স্বভাবে" যাহাতে কোনও কিছু অনিষ্ট না
করেন এই উদ্দেশ্যে "পরলোকগত" আত্মার উদ্দেশ্যে তাহাকে শান্তিতৃপ্ত করিবার
জন্য উপাসনা করিয়া থাকেন।

এইরূপে প্রেতোপাসনা, পিত্রুপাসনা দেবোপাসনা অসভ্য মানবজাতিরাও
করিয়া থাকেন। সৃষ্টির অন্তর্গত প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তীতায় আবার সভ্যমানব জাতিও
অত্যন্ত উন্নত আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগে প্রেতোপাসনা, ভূতোপাসনা, জড়োপাসনা,
প্রেত, ভূত, ভাবগ্রাহিপ্রকৃতি; জড় ইত্যাদির মধ্যবর্ত্তীতায় ভগবানেরই পূজা
করিয়া থাকেন।

যাহারা আপনাদিগকে প্রতিমার উপাসক, প্রেতোপাসক, জড়োপাসক পশু-
পাসক, প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা আপনাদিগকে নিরাকার
ভগবানের উপাসক বলিয়া থাকেন। তাঁহারাও ভক্তি গত সংস্কার বা কুসংস্কার
যাহা বলুন জড় পদার্থে ঐশীভক্তি পবিত্রতা সংস্কার ভঙ্গিভাবে বিশ্বাস ও মান্য
করেন।

লোকের কাছে মিথ্যা প্রবঞ্চনা অথবা কোনরূপ পাপ অধর্ম্মজনক কার্য্য
করিতে হয়ত ইতস্ততঃ করেন না। সমাজের কাছে অন্যায় অধর্ম্ম পাপ
করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু মন্দির, মসজিদ, ঈশ্বরচর্চ্চার স্থান "চর্চ্চে"
গিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে অন্যায় অধর্ম্ম পাপানুষ্ঠান জ্ঞানতঃ করিতে
ইতস্ততঃ করেন এরূপ দেখা যায়। ধর্ম্মোপদেশ লিখিত "গ্রন্থ" বিশেষকে
স্পর্শ করিয়া অন্যায় অধর্ম্ম পাপানুষ্ঠান করিতে ভীত হন। "গ্রন্থ"কে ভয়
করেন মান্য করেন, কিন্তু গ্রন্থসত্তা "সত্তাকে" গ্রন্থোপদেশকে জড় মনে করেন
না। যেহেতু বিস্মৃত হন।

ধর্ম্মোপদেষ্টা ঈশ্বরগত মহাপুরুষদিগের প্রতি মান্য ভক্তি করেন, তাঁহা-
দের উপদেশ লিপিবদ্ধ গ্রন্থকে মান্য করেন, তাঁহাদিগের কোন ২ নিদর্শন
জীবন মরণের স্মারক জড়বস্তুকে মান্য করেন। তাহাদের কাঁথা ঝুলি কম্বল
কেশ নখদন্তকে ভস্মরাশিকে এমন কি স্মৃতিকেও মান্য করেন। অথচ
তাঁহাদের আদর্শ, উপদেশ, সর্ব্বদা মান্য করেন না। ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বত্রব্যাপী;

ইত্যাদি বলিয়া মান্য করিলেও, কার্য্যতঃ তিনি সর্ব্বত্র-ব্যাপী, অন্তর্যামী, নিরাকার হইলেও যে তিনি সর্ব্বসত্তায় বিদ্যমান আছেন, ইহা কার্য্যতঃ যে মানেন একথা বোধহয় তাঁহারাও সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু "জড়প্রস্তরসত্তাকে" জড়োপাসনা উপাসকমন্দিরকে, জড়মূর্ত্তি নিদর্শনকে মান্য করেন। ইহা ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত অজ্ঞান (অবিদ্যা) আশ্রিত জ্ঞানসম্বন্ধ ব্যতীত কি বলিব? সুতরাং অজ্ঞান অনার্য্য অসভ্য বর্ব্বরতা-প্রাপ্ত মানবজাতিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞান কিরূপে বলিব? বরং দেখা যায় তাহারা সরলচিত্ত, অকপট ভক্তিপ্রাণ, এবং তাহাদের জ্ঞানানুসারে অন্যের, অধর্ম্ম, অসত্য, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ হইতে আত্ম-সাবধান দৃঢ় নিষ্ঠ সভ্য মানবদিগেরও অধিকতর দেখা যায়। বরং দেখাযায় আমরা ঈশ্বরের নাম দিয়া অথবা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া মিথ্যা কপটতা অসদা-চরণ ভণ্ডামী করি, তাহারা ঈশ্বরভীতিগ্রস্থ হইয়াও অন্ততঃ মিথ্যা ভণ্ডামী নষ্টামী করে না। ঈশ্বর তাহাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর হউন আর অপ্রত্যক্ষ অগোচর হইয়া থাকুন, তাহাতে কিছু হানি হয় না। ঈশ্বরকে তাহারা ভয় করিলেও ভয়ত্রাতা, বরদাতা, মঙ্গলবিধাতা, সৃজন পালন নাশকর্ত্তা, ইহা তাঁহা-রও বেশ উত্তমরূপ জানে, এবং তদনুসারে সাবধানতায় চলে। সুতরাং আমরা যদি জোর করিয়া বলি, যে তাহারা ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে হীনজ্ঞান তাহা হইলে সেটা আমাদের নিতান্ত অহঙ্কার বলিতে হইবে। মুক্তিজ্ঞান সম্বন্ধেও তারা জানে যে ঈশ্বর তাহাদের কষ্ট দুঃখ, ভয়, শোক, অভাবাদি হইতে মুক্তি দিতে পারেন। নির্ব্বাণ মুক্তি সম্বন্ধে আমার মনে হয়, তারা এত উদ্বিগ্ন নহে। প্রকৃতির ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায়।

তাহারা মুক্তির জন্য নির্ব্বাণলাভের জন্য অতটা ভাবেও না হয়ত। আমরাও যে সাধারণতঃ ভাবি তাও ত বলিতে পারিনা।

যাহা হউক বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত মনসাপূজা সম্বন্ধে দেখা যায়, আমরা সাধারণতঃ "সর্পভীতি" নিবারণ, এবং বিঘ্নহরূপে মনসাদেবীর পূজাকরি।

আমরা মনসিজবৃক্ষ (মনসা গাছ) উপলক্ষ্য করিয়া মনসাদেবীর উপাসনা করি। অনার্য্য কাছাড়ী জাতির মধ্যে দেখা যায় তাহারা মনসা গাছকে 'সিজু' বলে। সিজু বা সিজ বৃক্ষকে পবিত্র বোধে পূজা করে। উহারা সর্পভীতি নিবারণ অথবা বিঘ্ন বিঘহরা বোধে যে পূজা করে

তাহা নহে। উহারা মনে করে ভগবান্ ও ভগবতী (ঈশ্বর পুরুষপ্রকৃতি ভাবে বিল্ববৃক্ষে মহাদেব পার্ব্বতী থাকেন, হিন্দুরা যেরূপ বিশ্বাস করেন) সিজু বৃক্ষাশ্রয়ে থাকেন। উহারা 'সিজুবৃক্ষ' উপলক্ষ্য করিয়া উহাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও অমঙ্গল দাতা ভগবান্ ভগবতীকে উহাদের প্রয়োজন মত কার্য্য সাধনের জন্য, অথবা সাধারণতঃ কল্যানপ্রদভাবে পূজা করে।

কাছাড়ীজাতি উহাদিগকে "হিড়ম্ব' ঘটোৎকচবংশীয় বা উক্ত হিড়ম্ব ঘটোৎকচের স্বজাতি বলিয়া বিশ্বাস করে।

খাশিয়াজাতি সর্প পূজা করে। পূজা করিবার জন্য খাশিয়া জাতির এক সম্প্রদায় সর্প পালন করে। সর্পের উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি দিয়া থাকে, এমন কি সর্প-পূজার জন্য মনুষ্য বলি দিয়া রক্ত প্রদান করিতে ও কুণ্ঠিত নহে এরূপ শুনা যায়। বর্ত্তমানে প্রকাশ্যতঃ মনুষ্য বলি বা মনুষ্যের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া সর্প পূজার জন্য রক্তপাত ব্যাপার ইংরাজ রাজত্বের কঠোরশাসনভয়ে একরূপ বন্দ হইলেও, সাধারণতঃ লোকে সর্পপূজার সময় ভয় প্রযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। সুযোগ পাইলে এখনও সর্প পূজার জন্য মনুষ্যের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা হয় না এমন বিশ্বাস নাই।

হিন্দুদের মধ্যেও সর্প বাস্তুদেবতা বোধে পূজিত হয় সর্পের উদ্দেশ্যে দুগ্ধ কলা ইত্যাদি নৈবেদ্যনিবেদন ও পূজাকরা হয়।

মনসাপূজা, সর্পপূজা (বাস্তুসর্প) হিন্দুগণ অনার্য্যদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন অনেকে বিশ্বাস করেন। হইতে পারে, তাহাতে অসম্ভব কি? এক দিনেই হিন্দুগণ আর্য্য হন নাই। এবং হিন্দুর অন্তর্গত হিন্দু সমাজের এই বিশালদেহ আর্য্যসমূহ লইয়া গঠিত হয় নাই। অনার্য্য জাতির মানবগণকে লইয়াই হিন্দু সমাজের এই বিশাল দেহ গঠিত হইয়াছে। তাহাদের পূজা উপাসনা সংস্কার পদ্ধতি তাহাদের সঙ্গে হিন্দু সমাজে আসিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেই বা হানি কি?

হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রচার (Proselytisua) হিন্দু ধর্ম্মের সম্প্রসারণশীল অবস্থায় Take of give policy তে অনুদারভাবে অনার্য্যদিগের মধ্যে বিস্তৃত হয় নাই। তোমরা হিন্দুধর্ম্মের আচার সংস্কার গ্রহণকর এবং আমরা যাহা দিতেছি এসকলই সুসংস্কার, আর তোমাদের চিরন্তন আচার ব্যবহার ধর্ম্ম সংস্কার সকলই কুসংস্কার, সুতরাং উহা পরিত্যাগকর এ পদ্ধতিতে

প্রাচীন হিন্দুরা (ব্রাহ্মণ) ধর্ম্ম প্রচার করতঃ অনার্য্যগণকে হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় দান করেন নাই। তাঁহারা Give of take policy তে তোমাদের ধর্ম্ম সংস্কার ব্যবহার আমাদিগকে দাও, এবং আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ কর এই পদ্ধতিতেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সম্প্রসারণশীলশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া তাহাদের সংস্কার ব্যবহার সুসংস্কৃত ভাবে একটু উন্নতপন্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মণ্যগত হইয়া তাহাদের সংস্কার সুসংস্কৃত হইয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া এক পরিবারান্তর্গত মানবের ন্যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদের পূজা উৎসবাদি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও শ্রদ্ধা করিয়া ছিলেন। তাহারাও ব্রহ্মণ্যাচার ও ব্রহ্মণ্য অনুমোদিত বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি উৎসবেও হিন্দু দিগের অনুগত ও যথাশক্তি সাহায্য দানে উৎসব আনন্দে যোগদান করিত।

এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মণ্যে, দেশাচার প্রথাকে সমধিক শ্রদ্ধাদান করিয়া মান্য করিয়া লইয়াছিলেন।

দেশাচার মান্য করার জন্য, হিন্দুগণের মধ্যে দেশভেদে আচার বিভিন্নতা, খাদ্য, পান, বেশভূষা, শিল্প, পূজাপদ্ধতি, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃত জনমধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রসারণশক্তিতে আত্মবিস্তার করিবার জন্য প্রাকৃত জনসাধারণকে ব্রাহ্মণানুমোদিত ঐশীতত্ত্বে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য প্রাকৃতভাষা অবলম্বনে হিন্দুশাস্ত্র পুরাণতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র ইত্যাদি প্রণীত হইয়াছিল। প্রাকৃত ও দেশজভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত জনসাধারণকে এক পরিবারবর্ত্তী মানবমধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা সংস্কৃত আর্য্যভাষা ভাষণ ত্যাগ করিয়া প্রাকৃতভাষাকে আর্য্যানুবর্ত্তী করিয়া দেশজভাষা মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু যে ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও না হইতে পারে। মাতৃত্ব গ্রহণ করাও অসম্ভব নহে। আচার ভেদ ত খুবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাষাভূষা আচার ধর্ম্মনীতি সমস্তই ব্রাহ্মণানুমোদিত আর্য্যানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে অবিজ্ঞতা জড়তা দেখা যায়, ইহা সাধারণতঃ অজ্ঞানতাপ্রসূত এবং পরাধীনতায় হিন্দুধর্ম্মের সজীবসম্প্রসারণশীলশক্তি সংযত ও রুদ্ধ হইয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আমার অনুমান হয়।

অসুর কিরাতাদি জাতির উৎসবপদ্ধতিসহ শৈবোপাসনা, চড়ক গাজন-

ইত্যাদি বঙ্গদেশে সাধারণ উৎসব মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বে "চড়ক" গাজনের প্রাদুর্ভাব কমিয়া গিয়াছে। তথাপি গাজন চড়ক বিষহরী পূজা বা মনসাপূজা, দুর্গোৎসব ইত্যাদি সকল পূজা এবং জাতীয় উৎসব আর্য্য অনার্য্যভেদে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বঙ্গদেশের উচ্চ ও নীচবর্ণ সকল মানবমধ্যেই বিশিষ্ট উৎসবাঙ্গে পরিগণিত। কোন কোনও উৎসবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণগণ প্রাধান্য গ্রহণ করেন তন্নিম্নবর্ণগণ তাঁহাদের অনুসরণ সঙ্গসাহচর্য্য করেন। আবার কোনও কোনও উৎসবে সাধারণতঃ নিম্নবর্ণান্তর্গত হিন্দুগণ বিশিষ্টরূপে প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া পালন করেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও তাহাদের সঙ্গে সহযোগীভাবে যোগদান করেন। শ্রীভগবানাবতার শঙ্করাচার্য্য হইতে ব্রাহ্মনানুমোদিত হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেও, অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলেও, সামাজিকভাবে পূজাপদ্ধতি আচার ব্যবহার দেশজব্যবহারে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই ধারণা হয়, এবং সেই জন্যই হিন্দু সমাজের কলেবর আর্য্য অনার্য্য লইয়া এত বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে দশনামী মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী মোহান্তগণ এবং দশনামী মঠান্তর্গত দেবায়তন তীর্থভূমিরূপে, যথা ৺তারকেশ্বর, ৺চন্দ্রনাথ ইত্যাদিতীর্থ শৈবোপাসক অনার্য্যগণেরও তীর্থভূমিরূপে উৎসবায়তন রূপে গণ্য হইয়াছে। বৌদ্ধাদিবিভিন্নধর্ম্মানুমোদিত আচারও উপদেশ এমন কি দেবমূর্ত্তি অথবা সংজ্ঞা নিদর্শন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের অনুগত হইয়া আকারন্তর গ্রহণ করতঃ প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম্মঠাকুরের উপাসনা, ধর্ম্ম-পোঁড়া ইত্যাদি পীঠ চৈত্যাদি এখনও স্থানে স্থানে হিন্দুদিগের দ্বারা পূজিত হয়, অনার্য্য ডোম ইত্যাদি নীচবর্ণের মানবগণ অনেকস্থানে ধর্ম্মের পৌর-হিত্য করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সভক্তি পূজা মানসিক নৈবেদ্য উপহার বলিপ্রদান করেন। আবার কোনও কোনও স্থলে ধর্ম্মঠাকুর ধর্ম্মপোড়া (চৈত্য) ব্রাহ্মণাধিকারে থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পূজিত হয়। প্রাচীন আর্য্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপে আর্য্য অনার্য্য সমন্বয় ও তৎকালীন সর্ব্বধর্ম্মের আচার ব্যবহার সংস্কার সমন্বয় করিয়া এক বিশালবিরাট বিপুলদেহ হিন্দুসমাজ স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে নবগঠিত হিন্দুসমাজও কিছুকাল ধরিয়া হিন্দু স্বাধীনতা যশোগৌরব ও দেশরক্ষা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সুতরাং শীতলা মনসা ইত্যাদি পূজা অনার্য্যগণ হইতেই হিন্দুরা গ্রহণ করুন্ অথবা ব্রাহ্মণতুল্য হিন্দু হইতেই অনার্য্যেরা গ্রহণ করুন্ তাহাতে অপযশ বা অনিষ্ট ছিল না। উচ্চবর্ণ হিন্দুগণের উহা ঔদার্য্য মহত্ত্ব এবং বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

যাহার নিকট হইতে যে কোন পদ্ধতির উপাসনা গ্রহণ করা হউক না কেন, বৈদিকই হউক, পৌরাণিকই হউক, তান্ত্রিকই হউক বা অনার্য্য সংস্কার হইতে আগতই হউক, বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্র ও ব্যবহার মতেই আসিয়া থাকুক, সকল উপসনা পদ্ধতিতেই জ্ঞান [illegible] চ্চ আধ্যাত্মিকগত উপাসনা আর্য্য উপাসনা আর অজ্ঞানতাদুষ্ট ভয় ক্রোধ হিংসা দ্বেষাদি বা হীন স্বার্থপ্রণোদিত উপাসনা অনার্য্যতা ইহাই আমরা স্বীকার করি।

অভিচার শত্রুপীড়ন জীবহিংসাপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক বা যে কোনও ভাবের উপাসনাই অনার্য্যতা বলিতে পারি। নচেৎ ভয় আশঙ্কা উৎপাত পীড়া মারিভয় নিবারণের জন্য ভগবানের প্রসন্নতা-সাধন করা, পূজা করা যে অনার্য্যতা ইহা কদাচ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কিন্তু, সবচেয়ে সাধনপদ্ধতি হচ্চে, [illegible] সাধন করা। যেমন ধরুন্, মনসাপূজা শীর্ষক প্রবন্ধাবলম্বনে [illegible] সর্পভীতি নিবারণ অথবা বিষঘ্ন বিষহরীরূপে মনসাপূজা [illegible] খল হিংস্রপ্রকৃতিক দুষ্টজন্তুভীতি অথবা "বিষপ্রকৃতির" অপকারিতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য।

কিন্তু, আমার আত্মপ্রকৃতির হিংসাখলতা ক্রূরতা, [illegible], রাগদ্বেষ ইত্যাদিইত আমার কার্য্যকারক সম্বন্ধানুসারে [illegible] আমার [illegible] সৃজন করে আমারই প্রকৃতি আমার আঘাত, দংশন, নষ্ট করে, ক্লেশ পীড়া উৎপাদন করে। আমিই আমার প্রকৃতিগত আমার শত্রু সৃজন করি, শত্রুতাসাধন করি, শত্রুভীতি উৎপাদন করি। আমারই প্রকৃতি আমার শত্রুসৃজন করিয়া, জন্মান্তরগতিতে কর্ম্মফল নির্ব্বন্ধানুসারে সর্প ব্যাঘ্রাদি জীবরূপে বা অন্যরূপেও আমার শত্রুতাসাধন করে।

কিন্তু আমার প্রকৃতি অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতিতে যদি আমি রাগদ্বেষ হিংসা ক্রূরতা খলতা, ঘৃণাবিদ্বেষ প্রভৃতি হীনপ্রকৃতিগত হীনভাবগুলি শুদ্ধ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করতঃ অহিংসা অখলত্ব অকাপট্য অরাগ অদ্বেষ ইত্যাদিভাবে নির্ম্মল অর্থাৎ "সৎ" প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত

হইতে পারে তাহা হইলে আমার শত্রুও থাকে না, সর্পভীতি বিষ অগ্নি চৌর্য্যপীড়াদিভীতি ও সন্তাপে আমায় প্রপীড়িত করিতে পারে না।

দশমহাবিদ্যা কালীতারাদি সাধনায় দেখা যায়, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়াশ্রয়ভাবে ভগবতী দশমহাবিদ্যারূপে অধিষ্ঠিতা। মহাবিদ্যাসাধক সাধনার প্রকার ও ফলভেদে সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের অন্তর্গত যেরূপ সাধনা করেন, সেইরূপ ফলদাত্রীরূপে ইষ্টদাত্রী ভগবতী অভীষ্ট ফল দান করেন।

বগলামুখী গায়ত্রীতে দেখা যায়—"বগলামুখী সর্ব্বদুষ্টানাং বাচংমুখংস্তম্ভয় জিহ্বাকিলয় বুদ্ধিংনাশয় ইত্যাদি উল্লিখিত আছে। শত্রু নির্য্যাতনের জন্য ও তামসিক প্রকৃতিতে বা রাজস ভাবে পূজা সাধনায় ও সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্যাতনস্পৃহা চরিতার্থরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এরূপ সাধনা অবিদ্যাত্মক অজ্ঞানসাধনা।

আবার আত্মপ্রকৃতিগত দুষ্টস্বভাব নিবারণার্থে আত্মসংযত হইয়া স্বীয় দুষ্ট প্রকৃতি স্ববৈরিতা স্বপ্রকৃতিগত স্বভাব হইতে নিবারণের জন্য ও বিদ্যা-শক্তির আরাধনায় সাধন সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রকৃতি জ্ঞান সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। এরূপ সাধনাই আর্য্যোচিত সাধনা।

মনসাদেবীপূজা ও প্রকৃতির উপাসনা। সুতরাং আত্মপ্রকৃতিগত খলতা ক্রুরতা বৈরিতা দ্বেষ হিংসা নিবারণের জন্য আত্মশুদ্ধিলাভের জন্য সাধনা, আর্য্যোচিত সাধনা। যদি মনসাপূজা অনার্য্যমানব হইতে আসিয়া থাকে অনার্য্য সংস্কাররূপ ভয়ভীতি নিবারণের জন্য পূজাপদ্ধতি বিহিত হইলেও আর্য্যদিগের দ্বারা গৃহীত সুসংস্কৃত হইয়া আর্য্যোচিত উন্নতভাবে আত্মশুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধ লাভ করতঃ আত্মপ্রকৃতির শুদ্ধতা সম্পাদন করাই উদ্দেশ্য ছিল।

প্রকৃতিখণ্ডে মনসোপাখ্যানমনসাস্তোত্রে, মনসার দ্বাদশনামান্তর্গত স্তোত্রে উল্লেখ আছে; জরৎকারুর্জগৎ গৌরী (গৌরীহচ্চেসত্ত্ব প্রকৃতি) মনসা সিদ্ধযোগিনী। বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ ১ ॥

জরৎকারুঃ প্রিয়াস্তিকমাতা বিষহরেতি চ। মহাজ্ঞানযুতা চৈব সাদেবী বিশ্বপূজিতা ॥ ২ ॥

মনসা অর্থাৎ আমার মানসপ্রকৃতি (মন প্রকৃতিগত) মহাজ্ঞানযুক্তা

হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানযোগে শুদ্ধ করিয়া আত্মমানসপ্রকৃতি বিদ্ব বিদ্বেষ খলতা, হিংসা ক্রুরতাদি দোষমুক্ত করিয়া বিশ্বপূজিত ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা হওয়া। অর্থাৎ যে দেবতার উপাসনা করা যায় আত্ম প্রকৃতিতে তত্তদ্দেবতার গুণ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া আত্মভাবে গ্রহণ করিয়া যেরূপ ভাবের পূজা করি সেইভাব সিদ্ধ হওয়া সাধনা। "যাদৃশী ভাবনায়স্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী বলিলে তমঃ রজঃ বা সত্ত্ব ভাবাশ্রয় যেমন ভাবনা করিবে তদ্রূপ সিদ্ধ হইবে। তদ্রূপ দেবতার ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিজকে প্রতিষ্ঠিত করা নিজের মধ্যে সেই দেবতার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রকৃত সাধনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলিদান-সমাধান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বমতের অনুকূলজ্ঞানে কখনও তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে সহসা সাহস করিও না। এইরূপ করা বাতুলতা মাত্র, সামঞ্জস্য বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সরলতার সহকারে বিরুদ্ধ প্রতীয়মানস্থলের মীমাংসা করিও অসমর্থ হইলে প্রকৃত পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করিও।

শিষ্য। গুরো! বুঝিতে পারিলাম মন্ত্র প্রদান ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে, প্রকারান্তরই তাঁহার আশ্রয়ণীয়। সত্যই গুরো, একদেশ দর্শন অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকাই মঙ্গল, বাস্তবিকই "কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমানসবমেবচ এই বিধি দেখিলে মনে হইবেই হইবে মদ্য দোষাবহ নহে। গুরো, পুরাণসমূহের প্রতিপত্রে বলিলেও বোধ হয় বলা যাইতে পারে পশুযাগের প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, পশুযাগ নিকৃষ্ট হইলে তাহার এইরূপ উল্লেখ ও প্রশংসা থাকিবে কিরূপে এবং আমাদিগের উপাস্যবর্গকে তাহার অনুষ্ঠাতা দেখিতে পাই ইহা কি প্রকার?

গুরু। বৎস! যাহা বলিতেছ যথার্থ বটে, কিন্তু বল দেখি ঐসকল যজ্ঞ কাহারা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ২।৫ জন অনুষ্ঠাতার নাম কর দেখি?

শিষ্য। প্রভো! মান্ধাতা, যযাতি, রামচন্দ্র, পরশুরাম ইত্যাদি সকলেই পশুযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

গুরু। বৎস, তুমি যাঁহাদের নাম করিলে দেখিয়াছ কি তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের সংখ্যা উহাদিগের তুলনায় এত অল্প যে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। মুখ্য পশুঘাতযজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দুই চারিটী পশুযাগকারীর উল্লেখ করিতেছি এবং তাঁহারা কি কি যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাও বলিতেছি, ইহাতে দেখিতে পাইবে তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় যথা—

যাগকর্ত্তৃগণ।	যাগের নাম।
মান্ধাতা	রাজসূয় ও অশ্বমেধ ১০০
যযাতি	অশ্বমেধ ১০০, পৌণ্ডরিক ১০০০; বহু অগ্নিষ্টোম, রাজসূয় ১০০, বাজপেয় ১০০;
শশবিন্দু ও তনয়গণ	অশ্বমেধ
অমূর্ত্তরায় ও তনয়গণ	ঐ
সঙ্কৃতিতনয় রন্তীদেব	গোমেধ, অগ্নিহোত্র

(ইঁহার যজ্ঞ স্থলে পশুগণ স্বর্গলাভেচ্ছায় স্বয়ং আগমন করিত)

দুষ্মন্ততনয় ভরত	১০০ অশ্বমেধ
ত্রেতাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র	অশ্বমেধ
পুরূরবা	ঐ
যুধিষ্ঠির	রাজসূয়, অশ্বমেধ

ইত্যাদি শত শত ক্ষত্রিয় বহুপশুযাগ করিয়াছিলেন। সমগ্র পুরাণ তাহার নিদর্শন। রাজসস্বভাব বলিয়া ক্ষত্রিয় মাত্রেই বৈধহিংসার মুখ্য অধিকারী এই হেতু উক্ত যাগকারিগণ অর্জ্জিত সত্ত্বগুণান্বিত থাকিয়াও পশুঘাত যাগ করিয়াছিলেন। যদি সাধারণ সত্ত্বগুণ বিশিষ্টতাই বৈধহিংসার অনধিকারের একমাত্র হেতু বলিয়া ধারণা করিয়া থাক, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ উক্ত যাগকারিগণ সকলেই যে বিশিষ্ট সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই, বিশেষতঃ ত্রেতাযুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় তাহা উল্লেখ করা বাতুলতা মাত্র, তিনি ক্ষত্রিয়বংশে

আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি"
"স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ শ্রেয়ান্ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ"
"বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ"

ইহা তাঁহার ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবতার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার, স্বধর্ম্মের প্রগাঢ় ঐকান্তিকতা'র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রাজস যাগ পূজাদি তাঁহাদের জন্যই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণেরই স্বাভাবিক ক্রৌর্য্যহেতু রাজ্যপ্রতিপালন শস্ত্রধারণাদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১১ বার্ত্তিকে একস্থলে বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বমপি ক্ষত্রিয়ঃ পাপ এব ক্রূরত্বাৎ"—ক্ষত্রিয় জাতি ক্রূরস্বভাব বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় পাপী ছিল। স্বভাব রাজস ক্ষত্রিয়ের উক্ত প্রকার কার্য্যই স্বাভাবিক যথা—

"ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডবান্।
নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥"

পরাশর বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় প্রজা রক্ষা করিবে, শস্ত্র গ্রহণ ও দণ্ডধর হইয়া পরসৈন্য পরাভূত করিয়া পৃথিবী ধর্ম্মানুসারে পালন করিবে। হারীত বলিয়াছেন,—

"রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্ যজ্ঞান্ যথাবিধি॥"

ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইয়া প্রজা ধর্ম্মানুসারে পালন করিয়া সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন (বেদাধ্যয়ন) করিবে এবং যথাবিধি যজ্ঞ সমূহ সম্পন্ন করিবে বিষ্ণু বলেন—"ক্ষত্রিয়াণাং নিত্যশস্ত্রতা"—ক্ষত্রিয়গণ নিত্যশস্ত্রগ্রহণ করিবে। এই জন্যই মোহনাতন্ত্র পশু বলি ক্ষত্রিয়গণেরই প্রশস্ত বলিয়াছেন যথা—

"রাজ্ঞাংহি পশবঃ শস্তাঃ" রাজগণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের পশুবলি প্রশস্ত। গায়ত্রীতন্ত্রপঞ্চমপটলে বলিয়াছেন—"বহুভির্বলিদানেন পূজয়েৎ ক্ষত্রজাতিভিঃ" ক্ষত্রিয়জাতি বহু বলিদান দ্বারা পূজা করিবে। দেখ বৎস, পুরাণে সর্ব্বত্র পশুযাগী ক্ষত্রিয়ই দেখিতে পাইবে। পশুযাগকারী সকলই ক্ষত্রিয়। কদাচিৎ গৌণ বা হীনব্রাহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলরাম বিদ্যারত্ন।

নদী।

কোথায় যেতেছ নদী তর তর বহ নিরাবাম
অনন্ত কালের তরে ছুটিতেছ নাহিক বিরাম ?
আমাসম তোর দেবী আছে কিছু অপূর্ণ বাসনা
পূরণ করিতে তাই তোর এই কঠোর সাধনা ?

(২)

জীবনে পুরেনি ওগো কোনদিন কোন মোর সাধ
রোগ-শোকজর্জ্জরিত অনুক্ষণ জীবন বিষাদ
উঠিতেছে হাহাকার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
তাই মাতঃ তব অঙ্কে আসি আমি জুড়াবার তরে ;

(৩)

জননীর মত তুমি সুধাসম দিয়ে ক্ষীর ধার
নিবারণ কর মোর আকুল পিপাসা হাহাকার
আর এক নিবেদন জানাইয়া রাখি তব পায়
শুন এই শেষ ভিক্ষা বিমুখ ক'রোনা অভাগায়।

(৪)

তব অঙ্কে শোব যবে বিছাইয়া মোর শয্যাখানি
নিবারিয়া ক্লান্তি চিরশান্তি দিও স্নেহস্পর্শদানি
খুঁজিতেছ যারে তুমি পাও যদি তাঁর আশীর্ব্বাদ
ধারেক দেখায়ো মোরে আমি যেন নাহি পড়ি বাদ।

শ্রীপশুপতি সরকার।

ষট্‌চক্র-নিরূপণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ওবে বহ্নি, সূর্য্যচন্দ্রমণ্ডলের প্রায়।
পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবান্ দেখিবে তথায়।
জগতের সাক্ষিরূপ, শাশ্বত, অব্যয়,
ঈশ্বরস্বরূপ ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ ৩৯
ইহা নিত্য সুখ, বিষ্ণু আমোদ আগার।
আজ্ঞাপদ্মে চিত্ত রাখি মৃত্যু হয় যার॥
সেই অবিনাশী, আদি, জনম বিহীন।
বেদবেদ্যবিষ্ণুপদে হইবে বিলীন॥ ৪০
তার ঊর্দ্ধে মহানাদ শিব বিদ্যমান।
তাহার অর্দ্ধেক হয় বায়ু-লয়স্থান॥
হস্তদ্বয়ে বরাভয় করেন ধারন।
বিশুদ্ধ শান্তস্বভাব শিব বিলক্ষণ॥
গুরুসেবা করি শিব হ'লে অবগত।
বাক্‌সিদ্ধ করে তার হয় সমাগত॥ ৪১

সহস্রার পদ্ম।

তদূর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ী শিরে শূন্য স্থান।
তদধঃ সহস্রদল পদ্ম অবস্থান॥
পূর্ণ শশধরসম ধবলবরণ।
অধোমুখে প্রস্ফুটিত শোভে বিলক্ষণ॥
কেশর সমূহ তার বাল সূর্য্য প্রায়।
অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ শোভে তায়॥ ৪২
নিত্যানন্দ রূপ তাহা জানিবে নিশ্চিত।
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী মধ্যে প্রকাশিত॥
তদীয় জ্যোৎস্নারাশি অপূর্ব্ব স্ফূরণ।
স্নিগ্ধ সুধারাশি শোভে হাস্যের মতন॥
তদন্তে ত্রিকোন যন্ত্র বিদ্যুতের প্রায়।
সুরগুরু আত্মা শূন্য গুপ্ত স্থানতায়॥ ৪৩

অতিশয়যত্নে ইহা রাখিবে গোপন।
সূক্ষ্মানন্দ মূল, দীপ্তশশাঙ্কমতন ॥
এখানে পরম শিব শূন্যরূপে স্থিত।
পরানন্দ, মোহ-ধ্বান্ত নাশে এ নিশ্চিত ॥ ৪৪
যাবতীয় সুখাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর সেই।
সর্ব্বদা বিমলমতি যোগিগণ যেই ॥
তাহাদের সুধাধারা করেন প্রদান।
উপদেশ দিয়া তথা সদা আত্মজ্ঞান ॥ ৪৫
শৈববলে শিবস্থান, বিষ্ণুভক্তগণ
পরমপুরুষ বিষ্ণু স্থান একে কন ॥
হরিহরপদ একে কেহ কেহ বলে।
শক্তিস্থানবলে দেবীপদসেবী দলে ॥
প্রকৃতিপুরুষস্থান পরমনির্ম্মল।
বলিয়া বর্ণন করে অন্য ঋষিদল ॥ ৪৬
সহস্রার পদ্মে যার চিত্ত রত রয়।
ত্রিভুবনে কখন সে বদ্ধ নাহি হয় ॥
পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ না করে সে জন।
কর্ত্তা হর্ত্তা হয়ে করে আকাশে গমন ॥
বাগ্‌দেবী মুখে তার বিরাজে সতত।
সুবিমল শক্তিলাভ কৃতি করগত ॥ ৪৭
চন্দ্রের ষোড়শ কলা অমা এতে স্থিত।
বালসূর্য্যসমদীপ্ত, নির্ম্মললোহিত ॥
পদ্মতন্তু শতাংশের একাংশ সমান
সূক্ষ্মা, শ্রেষ্ঠা, অধোমুখী নিত্য দৃশ্যমান ॥
বিদ্যুতের সম ইহা কমলাতিশয়।
সদা সুধাধারা এতে বিগলিত হয় ॥ ৪৮
অমাকলা মধ্যভাগে নির্ব্বাণ শোভিতা।
কেশসহস্রাংশ সম সূক্ষ্ম সে নিশ্চিত ॥
নিত্যজ্ঞানে ইষ্টদেবী মাহাত্ম্য মহতি।
সর্ব্ব সূর্য্য সম দীপ্ত অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ॥ ৪৯

ইহাতে নির্ব্বাণশক্তি রহে বিরাজিতা॥
কোটিসূর্য্যসমদীপ্ত ত্রিলোকের মাতা॥
কেশাগ্র হইতে সূক্ষ্ম গোপনীয় অতি।
জীবের জীবনসদাশিব সঙ্গে রতি॥
মুনিগণ হৃদয়েতে প্রভাবে ইহার।
সদানন্দ তত্ত্বজ্ঞান রহে অনিবার॥ ৫০
তার মধ্যে যোগগম্য শিবস্থান রয়।
নিত্যানন্দ সুধাস্বাদ নির্ম্মলাতিশয়॥
জ্ঞানের স্বরূপ একে কেহ ব্রহ্ম বলে।
বৈষ্ণবের বিষ্ণুপদ, হংস কোনস্থলে॥
আবার ইহাকে কোন কোন সুধীগণ।
মুক্তিমার্গ দ্বাররূপে করেন বর্ণন॥
যম নিয়মাদি শিক্ষা করিয়া সম্যক্।
শুদ্ধ জ্ঞানলাভ করি সুশীল সাধক॥
গুরুমুখে জ্ঞাত হবে মোক্ষদ্বার জ্ঞান।
হুঙ্কার বীজেতে পাবে তাহার সন্ধান॥
তেজবায়ু রোধকরি ব্রহ্মদ্বার দিয়া।
সহস্রারে শিবলিঙ্গ ভেদন করিয়া॥ ৫২
লিঙ্গত্রয় ষড়পদ্ম ক্রমে ভেদ করি।
সহস্রারে দীপ্যমানা আছেন ঈশ্বরী॥
বিশুদ্ধ স্বভাবা সেই তড়িদ্বিলাসিনী।
সূক্ষ্মতন্তুরূপা তিনি কুল কুণ্ডলিনী॥
সূক্ষ্মতত্ত্বলক্ষণ দ্বারা তাঁকে জ্ঞাত হলে।
মুক্তিলাভ করিবেক তাহাতে সকলে॥ ৫৪
কুলকুণ্ডলিনী সেই নব রসাধারে।
জীবাত্মার সহ নিবে শৈব সহস্রারে॥
গুরুপদ্ম ভক্তোজ্ঞানে চৈতন্য রূপিণী;
শ্রেষ্ঠা ভগবতী তিনি অভীষ্ট দায়িনী;
রক্তাভপরমামৃত তিনি করি পান,
পরমশিব হইতে হর্ষকরি দান;

ষট্‌চক্রপথে পুনঃ মূলাধারেপশি।
স্থিরমতি সুধাধারা জানে যোগবশে॥
দেহরূপ ক্ষুদ্র এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে।
পূর্ব্বোক্তদেবতাগণ তৃপ্ত তার কাছে॥ ৫৫
যতচিত্তযোগী যেই সমাধি সংস্কৃত,
গুরু-পাদপদ্ম যুগ-আনন্দ উদ্ভূত;
সেই ষট্‌চক্র ক্রম পরিজ্ঞাত হয়।
সংসারে জনম, ধ্বংস প্রলয়ে সে নয়॥
পূর্ণানন্দময় তিনি শান্তি সমন্বিত।
শুদ্ধ মনা সাধুগণের অগ্রণী নিশ্চিত॥ ৫৬
যেই নিশি দিন সদাকরে অধ্যয়ন।
মুক্তিজ্ঞানের হেতু ইহা জানে সেইজন॥
বিশুদ্ধ শাস্ত্র সম্মত ষট্‌চক্রক্রম।
গুরু-পাদপদ্ম রত জানিতে সক্ষম॥
তদীয় অভীষ্টদেব চরণ কমলে;
মানস সতত তার নাচে কৌতুহলে॥ ৫৭
ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীরাসবিহারী কবিকঙ্কণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

নক্ষত্রপাত। সম্প্রতি বঙ্গগগনের আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। কর্ণেল সুরেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই আর নাই। তাঁহার ন্যায় অস্ত্রচিকিৎসক দেশে দ্বিতীয় ছিল না বলিলেও চলে, এম্বুলেন্স কোর গঠনে তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। নিয়তি।

মন্ত্রিহত্যা। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আততায়ি কর্ত্তৃক নিহত হই়য়াছেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র একটা অশান্তির উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য চলিতেছে। ভগবান ভরসা।

স্থূলতায় গোল। আমেরিকার এরোপ্লেনের যাত্রিগণকে দেহের ওজন হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। ক্ষীণকায় লোক অপেক্ষা স্থূলকায় লোককে অধিক ভাড়া দিতে হয়। মোটা হওয়ার একি জ্বালা! অতঃপর হয়ত ক্ষীণকায় হওয়ার চেষ্টা চলিবে।

স্বাতন্ত্র্য প্রার্থনা। ব্রহ্মদেশবাসিগণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মদেশকে অতঃপর ভারতবর্ষের অন্তর্গত না রাখিয়া স্বতন্ত্র দেশরূপে গণ্য করা হউক। শাসন-সংস্কারে সে প্রার্থনার পূরণ করা হইয়াছে। অতঃপর আবার প্রস্তাব হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বড়লাট ভারত ও ব্রহ্মের বড়লাট বলিয়া কীর্ত্তিত হউন। বেশকথা! ইহাতে যদি ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যপিপাসার নিবৃত্তি হয়, হানি কি।

শ্যামলালের প্রবন্ধাবলী।